ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি

বই সম্পর্কে

ইসলাম এক নক্ষত্র, যার সংস্পর্শে সমস্ত আঁধার বিলীন হয়ে যায়, ঘোর অমানিশাও তাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়। ইসলাম তো এমন এক জ্যোতিষ্ক, যা উৎসারিত হয়েছে আরশে আজিমের মহিমান্বিত রওশন থেকে। জাহেলিয়াত পরাজয় কবুল করেছিল ইসলামের বুকে আশ্রয় পেয়ে। এই পবিত্র দ্বীন আত্মাকে করেছে প্রশান্ত, চরিত্রকে করেছে নিষ্কলুষ, জীবনকে করেছে সার্থক, মানবতাকে দিয়েছে মুক্তি। এর আলোকচ্ছটা যে জমিনে পড়েছে, সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছে শান্তির সবুজ তরু। এই রওশনের ঝলক যে হৃদয় ধারণ করেছে, সে হৃদয় হয়েছে দারাজ দিল। যে যুগ ধারণ করেছে, তা হয়েছে খইরুল কুরুন বা সর্বোত্তম যুগ।

কিন্তু হায়! অজ্ঞতা ও অবহেলার কালো মেঘে সেই সূর্য আজ মেঘলুপ্ত। আলোহীন এ ধরায় উঠে না প্রাণের জোয়ার। তোলে না কেউ আর মানবতার জয়োধ্বনি। অধিকার হারিয়ে মুমূর্ষুপ্রায় মানবতা। নব্য জাহেলিয়াতের এই গাঢ়-কালো মেঘপুঞ্জ চূর্ণ করতে দরকার একটি নির্ভেজাল ঈমানি দমকা হাওয়া; যে হাওয়ায় জ্ঞানের সৌরভ মিশে মোহিত করবে প্রতিটি হৃদয়। সেই মোহনীয় দক্ষিণা হাওয়ার গুঞ্জন তুলতেই আমাদের আয়োজন–'ম্যাসেজ'।

SH SHAON

01568-005733

গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

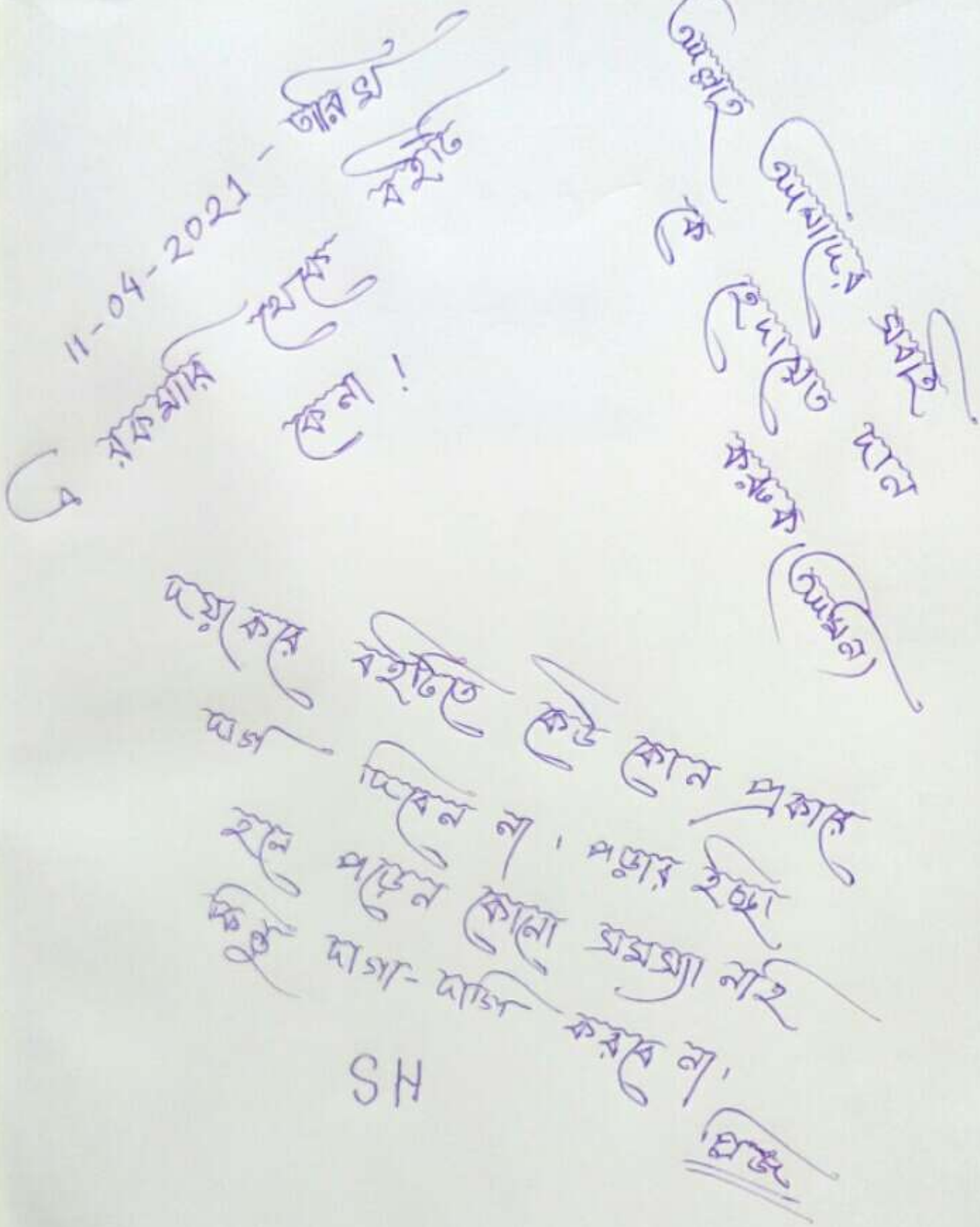

ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ : ৮ এপ্রিল, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : সাইমুম আহমেদ হাসিব
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৫১২৬-৯-১
ফিক্সড প্রাইস : ২৭৫ টাকা

ফিক্সড প্রাইসে বই কিনুন

প্রকাশকের কথা

ঠিক কীভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করব—বুঝতে পারছি না। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০৫ তারিখে কনফার্ম হয়েছিল—বইটা গার্ডিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, সেদিন থেকেই পুরো গার্ডিয়ান টিম উচ্ছ্বাস নিয়ে আগ্রহভরে অপেক্ষা করেছে। পাণ্ডুলিপি মেইলে পাওয়ার পরদিন থেকে সবাই হাসিমুখে বিশ্রাম ভুলে কাজ করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে পুরো টিম তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে যথাসম্ভব নিখুঁত গ্রন্থ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

জানি না, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটিকে কীভাবে গ্রহণ করবেন। তবে আশাবাদী মন স্বপ্নের এক বিশাল পাহাড় গড়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটি লাখো পাঠকের হাতে পৌঁছবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা পরিষ্কার করছি, এই গ্রন্থে এমন কোনো এক্সক্লুসিভ বিষয় নেই—যা অতীতে কখনো আলোচিত হয়নি। এখানে এমন কোনো নতুন জ্ঞান উৎপাদিত হয়নি, বুদ্ধিবৃত্তিক ফসলের মাঠে যার চাষাবাদ অতীতে কখনোই চোখে পড়েনি। মুসলিম মানসে খুব পরিচিত কিছু কথামালা এখানে নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

তাহলে গ্রন্থটির বিশেষত্ব কী? বিশেষত্ব হলো—সহজ কথা সহজ করে বলার নান্দনিকতা। প্রয়োজনীয় কথামালার প্রাঞ্জল ও অনুপম উপস্থাপনার বিশেষ গুণ সবার থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তরুণ আলিম, চিন্তক ও গবেষক মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! প্রজন্মের ভাষা বুঝে কথা বলার এক অনন্য স্টাইল তাঁকে সাধারণ মুসলিম হৃদয়ের গহিনে বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার প্রতিটি জনপদ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বরণ করে নিয়েছে।

যারা ভালো বলেন, তারা ততটা ভালো লিখতে পারেন না—এমন একটি মিথ সমাজে খুবই প্রচলিত। কিন্তু এই মিথ যেন আত্মসমর্পণ করেছে এই গ্রন্থের শব্দ-বুননে। পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি বেশ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কণ্ঠে যেমন সুধা ঢেলে দিয়েছেন, কলমেও তেমনি দিয়েছেন গতি ও সাবলীলতা। এটি রবের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতও বটে।

বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, সফল মানুষরা কেন সফল হয়ে ওঠে। আল্লাহর স্পেশাল দয়া ও রহমত তো বটেই, একই সঙ্গে অধ্যবসায়, ত্যাগ, বিনয় আর কঠিন পরিশ্রমই যে একজন মিজানুর রহমান আজহারিকে তৈরি করেছে—তা এই ক্ষুদ্র কাজটি করতে গিয়েই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। রাতের পর রাত জেগে, সকল কর্মব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, অনেক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে তিনি বইটির পেছনে যেভাবে সময় দিয়েছেন, তাতে অভিভূত না হয়ে পারিনি। আমরা যতবার স্বরণ করেছি, ততবারই তিনি হাসিমুখে সাড়া দিয়েছেন। জটিল কথাকে সহজে তুলে ধরা আর তাৎক্ষণিক ভাষাদক্ষতা দেখে অবাক হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লেখকের সম্মান ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন। আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি গার্ডিয়ানের ওপর আস্থা রেখেছেন।

গ্রন্থটির নাম—'ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া'। এখানে ১২টি ম্যাসেজ জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে—যা এই সময়ে, এই প্রজন্মের জন্য জরুরি। গ্রন্থটির ভাষা ও বিন্যাস এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ পড়তে স্বস্তি অনুভব করে। ভাষার কাঠিন্য সচেতনভাবেই পরিহার করা হয়েছে। আরবি টেক্সট কমিয়ে আয়াত ও হাদিসের বাংলা অর্থ বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের মুঠোফোনে টেক্সট আসে যেভাবে, সেভাবেই যেন আমরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে ১২টি টেক্সট পৌঁছে দিচ্ছি। প্রচ্ছদেই দেখেছেন—'You have 12 unread messages'। চলুন, পড়ে দেখি—কী লেখা আছে ম্যাসেজগুলোতে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩০ মার্চ, ২০২১

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি সত্যের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমাদের আহ্বান করেছেন। ২০২১ সালের বইমেলায় 'ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া' শিরোনামে প্রকাশিত বইটি বাংলা ভাষায় আমার প্রথম কাজ। নিজেকে বাংলা সাহিত্য-দুনিয়ায় যুক্ত করতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। জ্ঞান-দুনিয়ার দুর্বল ছাত্র। প্রতি মুহূর্তে নিত্য-নতুন কিছু জানার চেষ্টা করছি। সত্যের অনুপম ছোঁয়ায় নিজেকে ঋদ্ধ করার অবিরত এক সংগ্রামে আছি। তীর পেরিয়ে জ্ঞান-সমুদ্রের যত গভীরে প্রবেশ করছি, নিজেকে তত দুর্বল, অসহায়, অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষুদ্র হিসেবে আবিষ্কার করছি। রবের দুনিয়া কত বড়ো, তাঁর কত নিয়ামতে ডুবে আছি আমরা! পৃথিবীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের মণি-মুক্তা, রত্ন! কটা ভাঁজেই আর বিচরণ করা যায়!

নিজের সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও উম্মাহর তরুণদের নিয়ে কেন জানি পেরেশানিতে ভুগি। একুশ শতকের তারুণ্য কী এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে! এই প্রজন্মেরই একজন হয়ে খুব করে তাদের মানসপটকে বোঝার চেষ্টা করি। তাদের লাইফস্টাইল, চিন্তাধারা ও কর্মৎতপরতা বেশ বুঝতে পারি। তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথার টোন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে উপলব্ধি করতে পারি। মূলত, আমার ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতা এই তরুণদের ঘিরেই। তাদের জন্য ভাবি, বলি, লিখি, কন্টেন্ট তৈরি করি। কারণ, এই প্রজন্মকে যদি সঠিক পরিবহনে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছবেই। ভুল গাড়িতে উঠিয়ে হা-হুতাশ করে কী লাভ!

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কুরআনের ম্যাসেজ পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল রাব্বুল আলামিনের দয়ায়। একজন দাঈ হিসেবে সাধারণত কথা বলাটাই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। গত সাত বছরের দাওয়াতি অভিযাত্রায় অনেক শ্রোতা আমার লিখিত বইয়ের আবেদন করেছেন। আমি জেনেছি—শোনার পাশাপাশি শ্রোতাদের বড়ো একটা অংশ পড়তে ভালোবাসেন। ইন্টেলেকচুয়াল সার্কেলে বই ও সাহিত্যের একটা আলাদা আবেদন আছে। সাহিত্যাঙ্গনে একজন দাঈ চাইলেই কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। দাওয়াহর সাহিত্যিক প্রেজেন্টেশনও বেশ কার্যকর ও টেকসই। লেখনী মানেই স্থায়ী রেকর্ড—এই ভাবনা থেকেই লেখালিখির আগ্রহটা তৈরি হয়।

এই গ্রন্থে একেবারে ঐতিহাসিক ও এক্সক্লুসিভ কোনো তথ্য হয়তো পাবেন না; এ আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা। বলতে পারেন, কুরআনের কর্মী হিসেবে সাহিত্য-জগতে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই গ্রন্থ। সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে আলোচনা করেছি, গ্রন্থের প্রতিটি লেখায় সেসব আলোচনার নোটই প্রাথমিক সোর্স। বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, লেখার চেয়ে বলা অনেক সহজ।

বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের কথা, বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব একান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য-দুনিয়ায় বই মানেই যে শব্দের মারপ্যাঁচে ভারী ভারী কথা, এই গ্রন্থকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। রাশভারী কথামালা পরিহার করে সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখাগুলো সাজানোর একটা প্রয়াস এখানে আছে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নতুন ধারার প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স'-কে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো গার্ডিয়ান টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। এই বইটিতে কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করার দুঃসাহস করছি না। মানবিক দুর্বলতার কারণে বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেক অথবা তথ্যগত কোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন; পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যমপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করছি। 'ম্যাসেজ' বইটিতে কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া লাগাতে বইটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

মিজানুর রহমান আজহারি
৩০ মার্চ, ২০২১

সূচিপত্র

কুরআনের মা	১১
মুমিনের হাতিয়ার	২৯
কুরআনিক শিষ্টাচার	৪৮
উমর দারাজ দিল	৮০
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড	১০৩
উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি	১৩২
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন	১৫৬
শাশ্বত জীবনবিধান	১৭৩
স্মার্ট প্যারেন্টিং	২০১
মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস	২৩০
ঐশী বরকতের চাবি	২৬০
বিদায় বেলা	২৮০

কুরআনের মা

সূরা ফাতিহা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তব্য (Maiden Speech), একটি সার্থক মানপত্র, একটি প্রার্থনা, একটি শ্রেষ্ঠ সারাংশ এবং একটি প্রতিষেধক। অসংখ্য গুণে গুণান্বিত এই ছোট্ট সূরাটি কুরআনের প্রথম সূরা। এই সূরা দিয়েই কুরআনের সূচনা। আর 'ফাতিহা' শব্দের আক্ষরিক অর্থই হলো—শুরু বা সূচনা। এই সূরাকে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বা কিতাবের ভূমিকা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ সূরার মধ্য দিয়েই খুলে যায় কুরআনের বিস্ময়কর জগতের দ্বার! এই সূরার পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়েই কুরআনের মহিমান্বিত রূপ আমাদের গোচরে আসে।

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা; যা মানুষের জীবনের পথ ও পাথেয় বর্ণনা করে। এই সূরার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনা করার পদ্ধতি। এই সূরায় অঙ্কিত হয়েছে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এ সূরার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কুরআনের সামষ্টিক মহিমান্বিত রূপ, বর্ণিত হয়েছে তার সারমর্ম। বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই সূরায়। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল মিলে যেমন একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ হয়, তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের সমন্বয়ে সূরা ফাতিহা পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে কুরআনকে পূর্ণতা দিয়েছেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও পথ-নির্দেশের জন্যই এই সূরা নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তাঁর সুমহান পরিচয়, মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস, সত্যের ওপর অবিচল থাকার চেতনা, বিপথগামীদের থেকে বেঁচে থাকা হতে শুরু করে পার্থিব জীবনে আরোগ্য লাভের পন্থাও এখানে বিবৃত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কুরআনুল কারিমের পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে নাজিল হওয়া প্রথম সূরা এটি। এ সূরাটিকে রাসূল ﷺ কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা (The Greatest Surah of the Holy Quran) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 'আবু সাইদ ইবনে মুয়াল্লা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ আমাকে বললেন—তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দেবো। তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দেবেন বলছিলেন? তিনি বললেন—اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন; যা কেবল আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।' (সহিহ বুখারি : ৪৪৭৪)

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন। এই সূরা তিলাওয়াত ব্যতীত নামাজই হয় না। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজই হলো না।' (সহিহ বুখারি : ৭৫৬)

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে দামি সূরা। এর অনুরূপ কোনো সূরা অন্য কোনো আসমানি কিতাবে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ সূরা ফাতিহার মতো তাওরাত অথবা ইঞ্জিলে কোনো আয়াত নাজিল করেননি। এর আয়াতসংখ্যা সাত এবং এগুলো বারবার তিলাওয়াত করা হয়।' (সুনানে আন-নাসায়ি : ৯১৪)

সূরা ফাতিহার বিশেষণ

সূরা ফাতিহাকে বিশ্বনবি ﷺ বলেছেন—'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের মা'। মা যেমন সন্তানের জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করে তোলেন, তেমনি সূরা ফাতিহার শাশ্বত বাণীও কুরআনকে পূর্ণতা দিয়েছে। আরবিতে 'উম্ম' শব্দটি মা অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি কোনো কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, চুম্বকাংশ, সারনির্যাস অথবা সারমর্ম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাহলে উম্মুল কুরআনের অর্থ হচ্ছে—কুরআনুল কারিমের কেন্দ্রবিন্দু, চুম্বকাংশ, সারনির্যাস বা সারমর্ম, The epitome of the book, The Pure essence of the book। আল্লাহ তায়ালা পুরো কুরআনের ত্রিশ পারায় যা উল্লেখ করেছেন, তার সারনির্যাস রেখে দিয়েছেন সূরা ফাতিহায়।

সূরা ফাতিহার আরেকটি নাম হলো—'ওয়াফিয়া' বা 'পূর্ণাঙ্গ'। এই সূরাটি একসঙ্গে পুরোটা পড়তে হয়, খণ্ড খণ্ডরূপে পড়া যায় না। কেউ প্রথম রাকাতে সূরাটির তিন আয়াত এবং পরের রাকাতে চার আয়াত—এভাবে পড়তে পারবে না; পড়লেও সেটা বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য সূরা খণ্ডিতভাবে নামাজে তিলাওয়াত করা যায়। যেমন : কেউ প্রথম রাকাতে সূরা আর-রহমানের প্রথম দশটি আয়াত তিলাওয়াত করল, আর দ্বিতীয় রাকাতে বাকি আয়াত—এটা জায়েজ, কিন্তু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে এমনটা জায়েজ নেই। এজন্য এই সূরাকে ওয়াফিয়া বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়।

এই সূরার আরেকটি নাম হচ্ছে 'সূরাতুদ-দুআ' অর্থাৎ প্রার্থনার সূরা। কীভাবে মহামহিম আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়, ফরিয়াদ করতে হয়, মহান রবের কাছে চাইতে হয়—সেটা এই সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই সূরায় আমরা প্রতিনিয়ত বলে থাকি—'اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-(হে আল্লাহ) আমাদের সরল-সঠিক পথ দেখান।'

অর্থাৎ আমরা যেন বলি—হে আল্লাহ! আমরা যদি কখনো পথ ভুলে যাই কিংবা বিপথগামী হই, তাহলে আপনি আমাদের পথ দেখান এবং সুপথে পরিচালিত করুন। যদি কখনো পথভ্রষ্ট হই, আপনার দ্বীনবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে আমাদের স্থান দিন, যেন সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা আপনার দ্বারস্থ হতে পারি। পৃথিবীর কোনো শক্তিই যেন আপনার দেখানো পথ থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে না পারে।

এই কথাটিই গীতিকার জাকির আবু জাফর তাঁর গানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

'আমি যদি কোনোদিন পথ ভুলে যাই
হাতছানি দিয়ে কাছে নিও,
মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে
সব ভুল ক্ষমা করে দিও।'

এই সূরার আরেক নাম হলো 'সূরাতুশ-শিফা' তথা আরোগ্য লাভের সূরা। কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই সূরা পড়ে ফুঁ দিলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন। তবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তথা ঈমান রাখতে হবে। ঈমান যদি মজবুত হয়, তবেই এতে কাজ হবে; নতুবা হবে না।

সহিহ বুখারির এক বর্ণনা থেকে জানা যায়—কিছু সাহাবি একবার সফরে বের হলেন। সফরের মাঝে তাঁদের কাছে এক বালিকা এসে বলল—'আমাদের গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। গোত্রে কোনো পুরুষও নেই যে তার ওপর নির্ভর করব। অতএব, আপনাদের কেউ কি আছেন—যিনি ঝাড়ফুঁক করতে পারেন?'

একজন সাহাবি গিয়ে ঝাড়ফুঁক করলেন, লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল। গোত্রের সর্দার খুশি হয়ে সেই সাহাবিকে ৩০টি ছাগল উপহার দিলেন এবং দুধ পান করালেন।

ঝাড়ফুঁক দেওয়া সাহাবিকে অন্য সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি সত্যিই ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতি জানো?' তিনি বললেন—'না, আমি তো কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছি।' সাহাবিরা ভাবলেন, তাঁরা মদিনায় ফিরে নবিজিকে এই নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করবেন।

পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-কে যখন এ বিষয়ে জানানো হলো, তিনি সব শুনে খুশি হলেন এবং বললেন—'সে কেমন করে জানল, তা (সূরা ফাতিহা) আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও একটি রেখ।'

সহিহ বুখারির এই হাদিসটিই প্রমাণ করে, সূরা ফাতিহা হলো 'সূরাতুশ-শিফা' তথা আরোগ্য লাভের সূরা। তাই আমরা অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি সূরা ফাতিহা পড়ে রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করতে পারি। নিজের জন্য নিজেও রুকইয়াহ করা যায় অথবা অন্যদের মাধ্যমেও রুকইয়াহ করা যায়।

রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করাকে অনেকে কুসংস্কার মনে করে থাকেন—এটা একটা ভুল ধারণা। পবিত্র কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দুআসমূহের মাধ্যমে রুকইয়াহ তথা ঝাড়ফুঁক করা সুন্নাহসম্মত।

সূরা ফাতিহার আরেকটা নাম হলো 'সাবউল মাসানি' বা নিত্য পঠিত সাত বাক্য। সূরা ফাতিহার আয়াতসংখ্যা সাতটি। এই সূরাটি প্রতিদিন পড়া হয়। যারা শুধু ফরজ নামাজটা আদায় করেন, তারাও প্রতিদিন অন্তত ১৭ বার সূরা ফাতিহা পড়েন। তাহলে যে নামাজির বয়স পঞ্চাশ বছর, তিনি জীবনে মোট কতবার সূরা ফাতিহা পড়েছেন? কল্পনা করেছেন ব্যাপারটা? এজন্যই এ সূরাটিকে 'সাবউল মাসানি' বা নিত্য পঠিত সাত বাক্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই সূরা কখনো পুরোনো হয় না। এ যেন এক চির নতুন ঐশী বাণী। ধরুন, একজন নামাজি লোকের বয়স ৮০ বছর। এই ৮০ বছর ধরে প্রতি ওয়াক্তে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পরও তার মাঝে এতটুকু বিরক্তি আসে না। বিশ্বাস না হলে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন।

আপাত দৃষ্টিতে এই সূরাটিকে সাধারণ মনে হলেও এটি তেমনটি নয়। একে যতবার আবৃত্তি করবেন, ততবারই মনে হবে এর স্বাদ কখনো শেষ হওয়ার নয়। অনন্তকাল ধরে পড়লেও এ সূরার স্বাদ শেষ হবে না, মোটেও পুরোনো মনে হবে না।

সূরার গঠনবিন্যাস ও বিষয়বস্তু

এই সূরার বক্তব্য তিনটি ভাগে বিভক্ত—

১. আল্লাহর প্রশংসা

২. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক

৩. আল্লাহর কাছে দাবি-দাওয়া।

কোনো বরেণ্য অতিথি আমাদের প্রোগ্রামে এলে আমরা প্রথমে শুভেচ্ছা বা মানপত্র পাঠ করি। মানপত্রে সাধারণত তিনটি পর্ব থাকে। প্রথমে থাকে অতিথির প্রশংসা, তারপর থাকে অতিথির সাথে আয়োজকদের সম্পর্কের বর্ণনা আর শেষে থাকে দাবি-দাওয়া। সূরা ফাতিহাও ঠিক এ রকমই।

সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতে আমরা আল্লাহর শেখানো ভাষায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি—

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের রব।
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।
বিচার দিনের মালিক।'

চতুর্থ নম্বর আয়াতে আমরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক বর্ণনা করি—

'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।'

এরপর শেষ তিন আয়াতে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পেশ করি।

'আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করো।
তাদের পথ—যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।
তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত ও বিপথগামী।'

প্রথম আয়াতে আমরা বললাম—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-

'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

আরবিতে 'হামদুন' অর্থ প্রশংসা। আর এর সাথে যখন 'আল' যুক্ত করা হয়, তখন হয় আলহামদু, যার অর্থ—সব ধরনের প্রশংসা। যত ধরনের প্রশংসা হতে পারে, তার একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। অনাদিকাল থেকে শুরু করে অনন্তকাল পর্যন্ত সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনি। এই পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ। আবার তিনি নিজেও প্রশংসিত। কুরআনে বর্ণিত নবিজির দুটো নাম; একটি নাম হলো মুহাম্মাদ (যিনি প্রশংসিত), আরেকটা নাম আহমাদ (যিনি অধিক প্রশংসা করেন)।

কিয়ামতের দিন বিশ্বনবি সকল আদম সন্তানের নেতা হবেন। তাঁর হাতে একটি পতাকা থাকবে—যার নাম 'লিওয়াউল হামদ'। সেই পতাকাটি হবে হামদ বা প্রশংসার পতাকা। (জামে আত-তিরমিজি : ৩১৪৮)

এভাবেই বিশ্বনবি ﷺ দুনিয়া ও আখিরাত—দুই জাহানেই আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক প্রশংসার নমুনা স্থাপন করে দেখাবেন।

একদিন বিশ্বনবি মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ছেন। কিরাত শেষে রুকুতে গেলেন, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন—'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তখন একজন সাহাবি কর্তৃক উচ্চারিত হলো—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ-

'হে পরওয়ারদিগার! সকল পবিত্রতম অগণিত কল্যাণময় প্রশংসা আপনার জন্য নির্ধারিত।'

এই বাক্যটি বিশ্বনবি কাউকে শিখিয়ে দেননি। তাই নামাজ শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'এই নতুন বাক্যটি কে পড়েছে?' কেউ কোনো সাড়া দিলো না। বিশ্বনবি তখন সকলকে অভয় দিয়ে বললেন—'যে এগুলো পড়েছ, সে খারাপ কিছু পড়োনি।' তখন একজন সাহাবি বললেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো আমি পড়েছি।' এটা শুনে বিশ্বনবি বললেন—'আমি দেখলাম, ৩০ জনেরও অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছিল, ওই প্রশংসাসূচক কথাগুলো কে কার আগে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে—সেটা নিয়ে।' (সহিহ বুখারি : ৭৯৯)

এজন্য আমাদের উচিত মনঃপ্রাণ উজাড় করে বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করা। আর প্রশংসা করবই না-বা কেন? তিনি কত মহান! কী অপরূপ তাঁর সৃষ্টি! সমস্ত সাগরের পানিকে যদি কালি করা হয়, আর সমস্ত গাছকে যদি কলম বানানো হয়, অতঃপর সে সাগরের পানি নামক কালি দিয়ে আর গাছ নামক কলম দিয়ে যদি আল্লাহর প্রশংসাবাণী লেখা হয়, তাহলে সাগরের সব পানি ফুরিয়ে যাবে, গাছের কলম শেষ হয়ে যাবে, তবুও তাঁর মহিমা বর্ণনা শেষ হবে না। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা কত সাগর আর মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন! প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, চায়না সাগর, কৃষ্ণ সাগর, এ দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এভাবে আরও কত সাগর। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগই জল আর এক ভাগ স্থল। তাহলে সবগুলো সাগর-মহাসাগর জুড়ে কী পরিমাণ পানির অস্তিত্ব বিদ্যমান? আপনি কল্পনা করতে পারেন (Could you imagine that)?

আর গাছপালা? এক অ্যামাজান জঙ্গলে কত গাছপালা আছে—তা কি গুণে শেষ করা যাবে? এত দূর না গিয়ে আমাদের সুন্দরবন নিয়েই যদি একটু কল্পনা করি।

এক সুন্দরবনে কত গাছপালা আছে, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? তা গুণে শেষ করা যাবে?

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'যদি পৃথিবীর সব গাছ কলম হয়, আর সমুদ্র তার কালি হয় এবং সমুদ্রের সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যোগ হয় (তা দিয়ে আল্লাহর কথা লেখা হয়), তবুও আল্লাহর কথা ফুরাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা লুকমান : ২৭)

কী এক অসাধারণ উপমা! আমাদের পুরো জীবনটাই যদি তাঁর শুকরিয়া আদায়ে ব্যয় করে দিই, তবুও তাঁর নিয়ামতের ছিটেফোঁটারও যথাযথ শুকরিয়া আদায় হবে না। সুতরাং, সব সময় আমাদের আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। কারণ, তিনিই একমাত্র প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তিনি এমন এক মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় আর নিজেকে রেখেছেন বেজোড়। নশ্বর এ মহাবিশ্বে তিনি একাই কেবল অবিনশ্বর। তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

'তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন। আর তিনিই সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।' (সূরা হাদিদ : ০৩)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন—

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'যিনি জগৎসমূহের রব।'

আল্লাহর আরেক নাম 'রব'। কবরের প্রথম প্রশ্নই হলো—'তোমার রব কে?' আমরা জবাব দেবো—'আমার রব আল্লাহ।' আমরা যখন দুআ করি, শুরুতে 'রব' শব্দটি উচ্চারণ করি। আমরা বলি—'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ..., রব্বানা জলামনা আংফুসানা...'

এই রব শব্দের ছয়টি অর্থ রয়েছে—

- اَلْمَالِكُ আল মালিক : যিনি সমস্ত কিছুর মালিক।
- اَلسَّيِّدُ আস-সায়্যিদ : যিনি সবকিছুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।
- اَلْمُرَبِّيْ আল মুরাব্বি : যিনি সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা (Growth and Maturity) নিশ্চিত করেন।
- اَلْمُرْشِدُ আল মুরশিদ : যিনি সবকিছুর পথ দেখান।
- اَلْقَيِّمُ আল কাইয়্যিম : যিনি সবকিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন।
- اَلْمُنْعِمُ আল মুনয়িম : যিনি সমস্ত কিছু উপহার দান করেন।

রব শব্দের পুরো অর্থ বুঝতে এই ছয়টি অর্থই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই অর্থগুলো সামনে রাখলে বুঝতে পারব—আমরা যে রবের প্রশংসা করি, তিনি কে।

রব শব্দের একটা অর্থ—মালিক। এজন্য কোনো বস্তুর মালিককে আরবি পরিভাষায় 'রব্বুল মাল' এবং বাড়ির মালিককে 'রব্বুদ-দ্বার' বলা হয়। মানুষ যাকে নিজের রিজিকদাতা ও প্রতিপালক বলে মনে করে, যার নিকট হতে মান-সম্মান, উন্নতি ও শান্তি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, মানুষ যাকে প্রভু, মনিব ও মালিকরূপে অবহিত করে এবং বাস্তবজীবনে যার আনুগত্য ও আদেশ পালন করে চলে, প্রকৃতার্থে তিনিই রব, প্রতিপালক। আমাদের যার যখন যেটা যতটুকু দরকার, তাকে তখন সেটা না চাইতেই যিনি ব্যবস্থা করে দেন, তিনিই হলেন রব।

আমরা মায়ের গর্ভে থাকাকালীন আল্লাহর কাছে কিছুই চাইতে পারিনি; তবুও আল্লাহ তায়ালা সেখানে আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, 'ওয়া' 'ওয়া' শব্দে কান্না করা ছাড়া তখনও কিছু বলতে পারিনি। তবুও দয়াময় আল্লাহ মায়ের বুকের ভেতর আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করতাম। এই সময় আমাদের দাঁতের কোনো দরকার ছিল না। ফলে আল্লাহ আমাদের দাঁত দেননি। এবার মানবশিশু কিছুটা বড়ো হতে লাগল। এখন ভাত, মাছ, মাংস এগুলো চিবোতে হবে; অর্থাৎ দাঁতের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়টিতে আল্লাহ চাওয়ার আগেই ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে দাঁত সেট করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

শীতপ্রধান দেশে যেসব প্রাণী বসবাস করে, তাদের গায়ের চামড়া ও পশম আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেসব প্রাণী বসবাস করে, তাদের চামড়া ও পশম এক রকম নয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে যেসব শ্বেত ভাল্লুক বা উট দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোর গায়ে মোটা পশমের আবরণ থাকে। তারাও কিন্তু সেটা চায়নি। মহান আল্লাহ চাওয়ার আগেই তাদের এগুলো দিয়েছেন। কিন্তু উষ্ণ দেশগুলোর প্রাণীদের গায়ে সেটা থাকে না। কারণ, তাদের এটা দরকার নেই। অর্থাৎ যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে তিনি ঠিক ততটুকুই দিয়েছেন। তাই তো তিনি আমাদের রব।

এ মহাবিশ্বে যত জগৎ আছে, তিনি সকল জগতের রব। পানির নিচে যত প্রাণী আছে, যত উদ্ভিদ আছে, সবকিছুর রব তিনি। আকাশের ওপর যা যা আছে, সবকিছুর রব তিনি। আমাদের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে এবং যা দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করছে, সবকিছুর ওপরই একক আধিপত্য আল্লাহর। আমরা এই বলে তাঁর রুবুবিয়্যাতের ঘোষণা দিই—اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—'সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রবের জন্য।'

পরের আয়াতে তায়ালা আল্লাহ বলেন—

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে দুটি সিফাত (গুণবাচক নাম) উল্লেখ করেছেন; রহমান ও রহিম। বাংলাতে আমরা শব্দ দুটোর অর্থ করি—দয়াময় ও অসীম দয়ালু। তিনি যে কত বড়ো দয়ালু আর মেহেরবান, তা আমাদের কল্পনাকেও হার মানাবে। মা-বাবা আমার প্রতি যতটা না মেহেরবান, আল্লাহ আমার প্রতি তার চেয়েও অধিক মেহেরবান। এমনকী আমি নিজে আমার প্রতি যতটা না মেহেরবান, তিনি আমার প্রতি তার চেয়েও বেশি মেহেরবান। জীবনে কত বেশি গুনাহ আপনি করেছেন, সেটা ধর্তব্য না; যে মুহূর্তে খাস দিলে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, অশ্রুসিক্ত নয়নে অনুতপ্ত হবেন, সাথে সাথে তাঁর দয়া ও রহমত আপনাকে ঘিরে ধরবে। তাঁর ক্ষমা লাভে আপনি ধন্য হবেন।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা রহমত বা দয়াকে একশত ভাগ করছেন, অতঃপর নিরানব্বই ভাগ দয়া নিজের কাছে রেখেছেন, আর মাত্র একভাগ দয়া গোটা বিশ্বের সবার মাঝে ঢেলে দিয়েছেন।'

'আর-রহমান' শব্দের অর্থ—তিনি সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াবান; এমনকী অমুসলিমদের প্রতিও তিনি অব্যাহতভাবে দয়া প্রদর্শন করেন। তবে 'আর-রহিম' শব্দটি কেবল ঈমানদারদের জন্য খাস। আল্লাহ তায়ালা 'আর-রহিম' হয়ে ঈমানদারদের এই দুনিয়ায় ও আখিরাতে দয়া প্রদর্শন করবেন।

এই পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অবারিত রহমত বিস্তৃত। এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে আল্লাহর রহমত নেই। তিনি ইরশাদ করেন—

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

'আমার দয়া সর্বত্র বিস্তৃত।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)

আমরা যতই পাপ করি না কেন, আল্লাহর দয়া তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। আমাদের পাপ যদি হয় খালের কিংবা বিলের পানির সমান, তাহলে আল্লাহর দয়া সাগরের পানির চেয়েও বেশি। আমাদের পাপ যদি হয় পাহাড়সম, তাহলে আল্লাহর দয়া আকাশের চেয়েও উঁচু। আমাদের কৃত পাপ যত বিশালই হোক না কেন, মহান আল্লাহর অসীম দয়ার তুলনায় তা একেবারই নগণ্য। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অফুরন্ত। তাঁর দয়া বা অনুগ্রহে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করছেন—

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

> 'মানুষের প্রতি আল্লাহ কোনো করুণা করলে কেউ তা নিবারণ করার (ফেরানোর) নেই। আর তিনি যা নিবারণ করেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তার প্রেরণকারী নেই। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ফাতির : ০২)

আমরা সবাই পাপী। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি পাপ করেননি। প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে, ছোটো কিংবা বড়ো, সগিরা কিংবা কবিরা,

জেনে কিংবা না জেনে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কত অসংখ্য পাপ যে আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমাদের জন্য তওবার দরজা সর্বদা খোলা। আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়ে দোষ স্বীকার করে তওবা করলে তিনি কখনো তওবার হাত ফেরান না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপপ্রবণ। আর পাপীদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি—তওবাকারীগণ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৫১)

যত পাপই হোক না কেন, নিরাশ হওয়া চলবে না। আল্লাহ আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন, যদি আমরা তওবার মতো তওবা করতে পারি। আল্লাহর দয়া ও রহমত ছাড়া আমরা কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। আমরা সদা-সর্বদাই তাঁর রহমতের ভিখারি।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-

'বিচার দিনের মালিক।'

এ দিবসটিকে ইংরেজিতে বলা হয়—The day of judgement—বিচারের দিন বা—The day of accountability—জবাবদিহিতার দিন। কিয়ামতের সে দিনটি এতটাই ভয়াবহ ও ভীতিকর হবে, কেউ কাউকে চিনবে না বা পরিচয় দিতে চাইবে না। এমনকী মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন কেউই কাউকে চিনবে না। পীর সাহেব মুরিদকে চিনবে না, বাবা সন্তানকে চিনবে না, সন্তান বাবাকে চিনবে না। নেতা কর্মীকে চিনবে না, কর্মী নেতাকে চিনবে না। একে অপরকে দেখে সবাই দিগ্‌বিদিক দৌড়ে পালাতে থাকবে। দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে সে দিনটির সময়সীমা। পুরো জমিনটা এমন সমতল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে—যেটাতে উঁচু-নিচু কোনো ভাঁজ থাকবে না। সূর্য মাথার কাছে চলে আসবে। সূর্যের তাপে মানুষের মাথার মগজ, কান আর নাকের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। বস্ত্রহীন ও নগ্নপদ হয়ে সবাই সেদিন সমবেত হবে। সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত-ঘর্মাক্ত হয়ে মহা পেরেশান হয়ে উঠবে। সবার মুখে শুধু উচ্চারিত হবে—'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি!' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ- وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ- وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ-

'তা ঘটবে সেই দিন, যেদিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে, এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও। (কেননা) সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যার ফলে অন্যের প্রতি কোনো খেয়ালই থাকবে না।'
(সূরা আবাসা : ৩৪-৩৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ-

'সেদিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে; কেবল মুত্তাকিগণ ছাড়া।' (সূরা জুখরুফ : ৬৭)

আরও ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ-

'যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) ভুলে যাবে—যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সেদিন) আল্লাহর শাস্তি হবে অতি কঠোর।' (সূরা হজ : ০২)

আল্লাহ হলেন সেই দিনের মালিক। বিচার দিবসের সে মহাক্ষণে শুধুই আল্লাহর রাজত্বই কায়েম হবে, যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং মহাপরাক্রমশালী।

পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছেই সাহায্য চাই।'

সালাফদের মধ্যে অনেকে মনে করতেন, পুরো কুরআনের ভাবার্থ নিহিত আছে সূরা ফাতিহার মধ্যে। আর পুরো সূরা ফাতিহার ভাবার্থ নিহিত আছে এই আয়াতটির মধ্যে। কারণ, এই আয়াতটির প্রথম অংশে তাওহিদের সমর্থন এবং শিরকের প্রতি নিজের অনাস্থা ঘোষিত হয়—'আমি কেবল আপনারই ইবাদত করি।' দ্বিতীয় অংশে ঘোষিত হয় নিজের ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা এবং আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার স্বীকৃতি—'কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই।'

এই আয়াতে আল্লাহর সাথে বান্দার একটি নিবিড় সম্পর্কের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। দয়াময় আল্লাহকে সরাসরি বলা হচ্ছে—'আল্লাহ! আমি আর কাউকে রব হিসেবে মানি না, কারও নিকট মাথা নত করি না, কারও বশ্যতা স্বীকার করি না, কারও ইবাদত করি না। কেবল আপনাকেই রব হিসেবে মানি, তাই কেবল আপনারই ইবাদত করি, আপনার নিকটই চাই; অন্য কারও কাছে চাই না। আপনি যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি আর কাছে কাছে যাব? আমার যে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই!' রাসূল ﷺ সর্বদা সাহাবিদের বলতেন—

> 'যখনই কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাও, সাহায্যের হাত পাতলে আল্লাহর দরবারেই পাতো।'

রবের সাথে বান্দার এই সম্পর্ক এই কথারই সাক্ষ্য দেয়—আমি আমার সমস্ত ব্যক্তিসত্তাকে, আমার অস্তিত্বকে, আমার সমস্ত স্বাধীনতাকে, সমস্ত ইচ্ছা-পছন্দ ও খায়েশকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছি। তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি মনে করছি, কেবল তিনিই দিতে পারেন এবং ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেবল তিনিই। আল্লাহ এই স্বীকৃতিটাই আমাদের কাছে চান। এই স্বীকৃতির জন্যই এই সূরার এত মহত্ত্ব।

আল্লাহর সাথে বান্দার এই নিবিড় সম্পর্ক বর্ণনার পর আমরা পরের আয়াত থেকে নিজেদের প্রার্থনা ও দাবি-দাওয়া পেশ শুরু করি। বলি—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-

'আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করো।'

এখানে 'সিরাতল মুসতাকিম'-এর অনুবাদ আমরা করেছি 'সরল-সঠিক পথ', কিন্তু 'সিরাতল মুসতাকিম' বা মুসতাকিমের পথ বলতে কী বোঝানো হয়েছে—তা নিয়ে মুফাসসিরে কেরামগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জাবির ﷺ বলেন—

> 'সিরাতল মুসতাকিমের অর্থ হলো ইসলাম, যা আকাশ-পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে—সবকিছুর চেয়ে প্রশস্ত!'

অর্থাৎ ইসলামি শরিয়াহ যে পদ্ধতিতে মানুষের জীবন পরিচালনা করতে বলে, সেটাই সিরাতল মুসতাকিমের পথ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই সিরাতল মুসতাকিমের চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন—যা রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন।

> 'সিরাতল মুসতাকিম এমন একটি পথ, যার দুই দিকে দুটি প্রাচীর রয়েছে। সেই প্রাচীরের মাঝে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। প্রতিটি দরজার ওপরই পর্দা টাঙানো আছে। সিরাতল মুসতাকিমের প্রবেশদ্বারে সার্বক্ষণিকের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত করা আছে। সে সর্বদা আহ্বান করে বলছে—"হে মানবসকল! তোমরা এই সোজা পথ ধরে চলো; আঁকাবাঁকা পথে যেয়ো না।" আবার অন্য পথগুলোর ওপরেও পাহারাদার আছে। কেউ সেখানে প্রবেশ করতে চাইলে তারা সতর্ক করে বলে—"সাবধান! এটা খোলো না। যদি খোলো, তবে মূল পথ থেকে ছিটকে পড়বে।" সিরাতল মুসতাকিম হলো ইসলাম, আর প্রাচীরগুলো হলো আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়। প্রবেশদ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে কুরআন এবং রাস্তার ওপর আহ্বানকারী হলো তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়—যা প্রত্যেক বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।' (মুসনাদে আহমাদ)

ইবনে জারির (রহ.) আরেকটু সহজ করে বলেন—

> 'যে পথে চললে আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন এবং পুরস্কৃত করেন, সেটাই সিরাতল মুসতাকিমের পথ।'

আল্লাহ তায়ালা নিজেও সূরা ইয়াসিনে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলেছেন—

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ-

'এবং আমারই দাসত্ব করো—এটিই সরল-সঠিক পথ।' (সূরা ইয়াসিন : ৬১)

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একদিন নবিজি (মাটিতে) একটি রেখা টানলেন। এরপর বললেন—"এটা হলো আল্লাহর রাস্তা।" এরপর তিনি আবার ডানপাশে ও বামপাশে কয়েকটি রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন—"এ রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটি রাস্তায় একজন শয়তান বসে মানুষকে আহ্বান করছে।" এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—"নিশ্চয় এটাই আমার সরল পথ; তোমরা সে পথের অনুসরণ করো।"'
(সুনানে নাসায়ি : ১১১৭৪, মুসনাদে আহমদ : ৪১৪২)

মুজাহিদ (রহ.) এটাকে আরেকটু ব্যাপকার্থে বলেন—'সিরাতল মুসতাকিমের অর্থ হলো—হক বা সত্যের পথ।'

সুতরাং সর্বদা আমাদের হকের পথে থাকার জন্য দুআ করতে হবে এবং চেষ্টাও করতে হবে। কারণ, এই পথই হলো মুহাম্মাদ ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম ও সালিহিন বান্দাদের পথ। এটাই 'সিরাতল মুসতাকিম'।

কোন সিরাত বা পথকে সিরাতল মুস্তাকিম বলা হয়? এর ব্যাখ্যা পরের আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই দিয়েছেন—

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

'তাদের পথ—যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়—যারা গজবপ্রাপ্ত ও বিপথগামী।'

এই অনুগ্রহপ্রাপ্তরা চার শ্রেণিভুক্ত—

১. নবি : তাঁদের কাছে ওহি আসত, তাঁরা ধরার বুকে আল্লাহর বার্তাবাহক, তাঁরা সবাই মাসুম বা নিষ্পাপ।

২. সিদ্দিকিন : তাঁরা সত্যের ব্যাপারে আপসহীন, তাঁদের নেতা আবু বকর আস-সিদ্দিক ﷺ।

৩. শুহাদা : যারা আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীনকে বাস্তবায়ন করার জন্য শহিদ হয়েছেন। তাঁদের নেতা হলেন হামজা ﷺ।

৪. সালেহিন : নেক আমলকারী ব্যক্তিবর্গ।

আমরা ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। সকল মুফাসসিরে কেরামদের মত হলো—'ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়'

বলতে এখানে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে। যাদের কণ্ঠে ঈমানের সুমধুর বাণী উচ্চারিত হয়নি সে কণ্ঠের, যে হাতে বলিষ্ঠ ঈমানের কেতন উদিত হয়নি সে হাতের, যে দেহ আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হয়নি সে দেহের, যে ললাট পরম করুণাময়ের সম্মুখে নত হয়নি সে ললাটের, যে পদ মহান রবের ডাকে অগ্রগামী হয়নি সে পদের, যে মন ঈমানের চেতনায় উদ্বেলিত হয়নি—সে মনের সাথে মুসলিমদের কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নেই।

ইহুদিদের মাগদুব বা ক্রোধের পাত্র বলার কারণ বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

> 'লাঞ্ছনা, অধঃপতন, দুরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর গজব বা ক্রোধ তাদের ঘিরে ফেলেছে। এ ছিল তাদের ওপর আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরি করার এবং পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল। এটি ছিল তাদের নাফরমানি ও শরিয়াহর সীমালঙ্ঘনের ফল।' (সূরা বাকারা : ৬১)

আর খ্রিষ্টানদের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলার কারণ—তারা সত্য পথকে ভুলে গিয়ে ভ্রষ্টতাকে আঁকড়ে ধরেছে। আল্লাহর পাঠানো সম্মানিত রাসূল ঈসা ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালার পুত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। মারইয়াম ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী বলে আখ্যা দিয়েছে—যেটা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এখানে দুই ধরনের সম্প্রদায় থেকে সতর্ক করেছেন—আমরা যেন তাদের মতো না হই, তাদের পথে পা না বাড়াই এবং তাদের কৃত ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তবেই আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হতে পারব। আমাদের তিনি শ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন, আর সেটা নিশ্চিত হবে তাঁর সন্তুষ্টির পথে নিজেদের পরিচালিত করার মধ্য দিয়ে।

এই পর্যায়ে সকল প্রার্থনা বা আরজি পেশের পর আমাদের এই প্রার্থনা যেন রব্বে কারিম কবুল করে নেন, এজন্য আমাদের পড়তে বলা হলো—'আমিন'। তাই আমরা নামাজে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমিন' পড়ে থাকি। রাসূল ﷺ আমাদের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে আমিন পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'যখন তোমাদের কেউ নামাজে আমিন বলে, তখন আসমানের ফেরেশতারাও "আমিন" বলেন। উভয়ের আমিন একই সময়ে হলে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' (সহিহ বুখারি : ৭৮১)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে মসজিদে আওয়াজ করে আমিন বলা হয়, সেখানে আওয়াজ করে বলুন। আর যে মসজিদে ফিসফিস করে আমিন বলা হয়, সেই মসজিদে ফিসফিস করেই পড়ুন। তবে আমিন পড়া বাদ দেবেন না। এটি সুন্নাহ। একটি জিনিস মনে রাখবেন, এসব 'ফিকহি ইখতিলাফপূর্ণ' বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়ানো মোটেও কাম্য নয়। আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐক্য চাই।

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা এবং একই সঙ্গে এটি একটি অঙ্গীকারনামা। এই প্রার্থনা, অঙ্গীকারনামা বা ভূমিকাটির তিলাওয়াতের মধ্য দিয়েই কুরআন পাঠ শুরু করতে হয়। আমরা আমাদের প্রতিদিনের নামাজে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট কী প্রার্থনা বা অঙ্গীকার করে থাকি—তা কি আমরা জানি? এর অর্থ কি অনুধাবন করি? এর মাহাত্ম্য কি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি? তোতাপাখির মতো শুধু মুখস্থ না পড়ে আমাদের উচিত—যা পড়ছি, তার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা। তাহলেই এ সূরা যে রবের সাথে আমাদের দেওয়া অঙ্গীকারনামা, সেটা ভেতর থেকে অনুভব করতে পারব।

কুরআনুল কারিমের ভাষাতাত্ত্বিক মাধুর্য কুরআনের একটি বড়ো মুজিজা। সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি শব্দের যে কত ব্যাপক অর্থ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি শব্দ নির্বাচন যে কত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী, তা মানবমণ্ডলীর নিজস্ব ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তারপরও জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে 'কুরআনের মা' শিরোনামের এই নিবন্ধে সূরা ফাতিহার মর্মার্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আসুন, কুরআনের সজীব ও প্রাণবন্ত এ দিকনির্দেশনাগুলো জীবনের পরতে পরতে কাজে লাগাই। আলোকিত হই নিজে, আলোকিত করি গোটা সমাজ।

মুমিনের হাতিয়ার

'দুআ' মাত্র দুই অক্ষরের একটি শব্দ। কিন্তু শব্দটির ক্ষমতার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা সত্যিই বড্ড কঠিন। এ যেন মালিক ও দাসের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার সেতু নির্মাণকারী এক কারিগর। একজন ক্ষুদ্র দাস আরশে আজিমের মালিকের কাছে মিনতি করছে, ভিক্ষা মাঙছে আর মনিব উজার করে সব দিয়ে দিচ্ছেন—এ যেন ওয়ান টু ওয়ান বোঝাপড়া। কী দারুণ একটা ব্যাপার! সুবহানাল্লাহ।

দুআর মাধ্যমে আমরা মূলত আল্লাহর প্রতিটি নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দিই। আমরা স্বীকৃতি দিই, তিনি আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তাঁর অনুগত দাস। আমাদের লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই তাঁর হাতে। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তিনি শুনছেন, দেখছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। দুআ মানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, উপাস্য হিসেবে তাঁর একক অধিকারের স্বীকৃতি।

দুআ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ উপহার। দুআ করা এবং দুআ চাওয়া দুটোই সুন্নাহ। দুআ একটি মহৎ ইবাদতও বটে। বিশ্বনবি বলেন—

'আল্লাহর দৃষ্টিতে দুআর চেয়ে মহৎ কিছু নেই।' (সহিহ বুখারি : ৫৩৯২)

একনিষ্ঠ মনে দুআ করলে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। কারণ, তিনি বড়োই দয়ালু ও লজ্জাশীল। বান্দা যখন কাতর হৃদয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তখন তিনি বান্দাকে খালি হাতে ফেরাতে লজ্জাবোধ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' (সূরা মুমিন : ৬০)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ-

'(হে রাসূল) যখন বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন বলে দিয়ো—আমি তো কাছেই আছি। কেউ আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই।' (সূরা বাকারা : ১৮৬)

বিশ্বনবি বলেন—

'আল্লাহ খুবই লজ্জাশীল। বান্দা যখন হাত তুলে দুআ করে, তখন আল্লাহ তার হাত দুটোকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।' (সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮৮)

দুআ সকল ইবাদতের মূল নির্যাস। প্রিয়নবি ﷺ বলেন—

'দুআ ইবাদতের মগজ।' (আবু দাউদ : ১৪৭৯)

আপনি নামাজ পড়লেন, রোজা রাখলেন, হজ করলেন, কিন্তু দুআ করলেন না, তার মানে—আপনি ইবাদতের নির্যাসটাই হারালেন। কেউ যদি বাকি সব ইবাদত করে, কিন্তু দুআ না করে, তাহলে সে অহংকারী বলেই সাব্যস্ত হবে।

'যে আল্লাহকে ডাকে না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।' (সহিহ বুখারি : ২৪১৮)

একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুআকে গোটা দ্বীনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

هُوَ الْحَیُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ-

'তিনি চিরজীবী। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। দ্বীনকে তাঁর প্রতি নিবেদিত করে কেবল তাঁকেই ডাকো।' (সূরা মুমিন : ৬৫)

তাই বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহর কাছে যত বেশি চাওয়া হয়, তিনি তত বেশি খুশি হন। কিন্তু এই দুআ করতে হবে দুআর মতোই, হেঁয়ালিপনা কিংবা তাড়াহুড়া করে নয়।

দুআ একটা আর্ট বা শিল্প। একে রপ্ত করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়। সব কাজের মধ্যে যেমন ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে, তেমনি দুআর মধ্যেও ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে। কেউ ফার্স্ট-ক্লাস দুআ করলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করে নেন। আর থার্ড-ক্লাস দুআ করলে সেই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমন অনেক দুআকারী আছে—যাদের দুআয় কোনো আবেগ ও ভাবাবেগ থাকে না। এ যেন রোবটিক দুআ—ফাঁপা, নিষ্প্রাণ; দুআ করার জন্য দুআ। এ রকম দুআ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

দুআ করতে হবে আবেগ দিয়ে, যে আবেগ চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেবে। হৃদয়কে করবে নরম, উর্বর। বান্দার চোখের পানি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানি নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। দয়ার নবি বলেন—

> 'দুই ধরনের ফোঁটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এক. অনুতপ্ত বান্দার চোখের অশ্রুর ফোঁটা; দুই. জিহাদের ময়দানে শহিদের রক্তের ফোঁটা।' (জামে আত-তিরমিজি : ১৬৬৯)

দুআর শক্তি

দুআ মুমিনের অসাধারণ এক হাতিয়ার। দুনিয়ার সবকিছুর কারিশমা যেখানে শেষ, দুআর কারিশমা সেখান থেকেই শুরু। সব ক্ষমতা যেখানে অকার্যকর, দুআর ক্ষমতা সেখানেই কার্যকর। দুআর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া হয়। আর আল্লাহর দরবারে 'না' বলতে কিছু নেই; আছে শুধু 'হ্যাঁ'। দুআর অসাধারণ কিছু শক্তি জেনে নেওয়া যাক।

দুআ ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার : মানুষের তাকদিরে সাধারণত কোনো পরিবর্তন হয় না। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন, কিন্তু দুআর বদৌলতে তাকদিরও পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—'Everything is pre-written, but by supplication its re-written.'

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

'দুআর বদৌলতে তাকদিরের কিছু অংশ বদলে যায়।'
(জামে আত-তিরমিজি : ২১৩৯)

আমরা প্রায় সময় শুনি, অমুক রোগীর ক্যানসার; বেশিদিন বাঁচবে না। বাংলাদেশের সেরা ডাক্তার ঘোষণা দিয়েছেন, বাঁচলে সর্বোচ্চ ছয় মাস। কিন্তু দেখা যায়, সেই লোকটি আরও দশ বছর বেঁচে থাকে। এটা কীভাবে সম্ভব? কেবল দুআর বরকতেই সম্ভব হয়।

দুআ মনের চাওয়া পূরণ করে : 'Sincere Dua is like a missile'—আন্তরিক দুআ মিসাইলের মতো। মিসাইল যেমন হিট করলে সেটা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত হানে, তেমনি দুআর মতো দুআ করতে পারলে সেটাও লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত হানে। দুআর মতো দুআ করলে সেটা কবুল হবেই। মন থেকে চাইলে আল্লাহ তায়ালা সেটা শুনবেনই। দুআর শক্তি কতটুকু, তা বুঝতে চলুন—এক রুটি বিক্রেতার গল্প শোনা যাক।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) একবার সফর করছিলেন। নিজস্ব কাজ ছিল, তাই সাথে কোনো খাদেম নেননি। সফরের প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ একটি থলেতে পুরে রওয়ানা হলেন।

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে এলো। তিনি একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলেন—শীতের রাত, মঞ্জিল অনেক দূর; মাগরিব ও এশার নামাজ এখানেই আদায় করা যাক। এই ভেবে তিনি একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন।

মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করার পর ভাবলেন, এই মসজিদেই রাতটা কাটিয়ে দিই; কাল সকালে নাহয় গন্তব্যের দিকে রওয়ানা করা যাবে। এই ভেবে মসজিদের এক কোণে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব কোথা থেকে হাজির হয়ে বলতে শুরু করলেন—'এই বুড়ো, ওঠো! মসজিদ বন্ধ করব।' ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ভাবতে লাগলেন, হায়! রাতটা এই মসজিদে কাটানোর ইচ্ছে করলাম, আর মুয়াজ্জিন আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ভাবনা শেষ হতে না হতেই মুয়াজ্জিন সাহেবের দ্বিতীয় ধমক—'কী হলো! তোমাকে বললাম না বের হতে; নাহলে গাট্টি-গুট্টি সব বাইরে ফেলে দেবো!'

অগত্যাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন। মসজিদের বাইরে একজন যুবক তন্দুরির মধ্যে রুটি বানাচ্ছিল।

ইমাম সাহেব ভাবলেন—শীতের রাত, এখন কোথায় গিয়ে থাকব? এই যুবকের চুল্লির পাশে থাকলে একটু আরাম লাগবে। দেখি অনুমতি দেয় কি না! এই ভেবে যুবককে বললেন—

'হে যুবক! আমি কি তোমার চুল্লির পাশে বসে রাতটা কাটাতে পারি?'

যুবক বলল—'কেন নয়! আপনি এখানে বসলে তো আমার কোনো ক্ষতি নেই। অবশ্যই বসুন।'

ইমাম সাহেব তার শুকরিয়া আদায় করলেন। চুল্লির পাশে বসে যুবকটির কাজ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ইমাম সাহেব খেয়াল করলেন—যুবক রুটি বানানোর সময় 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলছে। আবার রুটি তন্দুরিতে লাগানোর সময় 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলছে। তন্দুরি থেকে রুটি বের করতে 'আসতাগফিরুল্লাহ'। আবার খামিরা বানাতে 'আসতাগফিরুল্লাহ'।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) খুব অবাক হলেন। কৌতূহল দূর করতে যুবককে প্রশ্ন করলেন—'হে যুবক! আমি লক্ষ করছি, তুমি কাজের প্রত্যেক ধাপে ধাপে "আসতাগফিরুল্লাহ" পড়ছ। জানতে পারি— তোমার এই আমলের রহস্য কী?'

যুবকটি মুচকি হেসে বলল—'জনাব! আমি ইস্তেগফার করতে খুব পছন্দ করি। আর এই আমলের বরকতে আমার আল্লাহ আমাকে "মুস্তাজাবুদ দাওয়া" (যে ব্যক্তি কোনো দুআ করলেই তা কবুল হয়ে যায়) বানিয়ে দিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ!)। আমি জীবনে যত দুআ করেছি, আল্লাহ সব দুআই কবুল করেছেন; তবে একটি দুআ এখনও বাকি রয়ে গেছে।'

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কী সেই দুআ, জানতে পারি?'

যুবক বলল—'আমি দুআ করেছি, হে আল্লাহ! শুনেছি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) নামে আপনার প্রিয় এক বান্দা রয়েছেন। বড়ো আল্লাহওয়ালা তিনি। হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দার সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।'

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর চোখ লোনাজলে ঝাপসা হয়ে গেল। তিনি যুবকটিকে বললেন—'হে যুবক! আল্লাহ তায়ালা তোমার এই দুআটিও কবুল করেছেন। আমিই আহমাদ ইবনে হাম্বল।'

(ইবনুল জাওজি তাঁর *মানাকিবু আল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল* গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।)

দুআ কখনো মিস হয় না

অনেকেই বলে থাকেন—'আমি আল্লাহর কাছে অনেক চাইলাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে দিলেন না।' মূলত কেউ একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তা অবশ্যই দেন। তবে এই দেওয়ার পদ্ধতি হতে পারে তিন ধরনের—

১. আপনি যা চাইলেন, তা আল্লাহ আপনাকে সরাসরি দুনিয়াতেই দেবেন।

২. যা চাইলেন, তা আল্লাহ আপনাকে হুবহু দেবেন না। কারণ, তিনি জানেন—সেই বিষয়টিতে আপনার জন্য কল্যাণ নেই। তাই এর বদলে তিনি আপনার ওপর থেকে এমন একটি বালা-মুসিবত তুলে নেবেন, যা আপনার তাকদিরে লেখা ছিল।

৩. আপনি চাইলেন, কিন্তু আল্লাহ তা দুনিয়াতে না দিয়ে আখিরাতের জন্য জমা রাখলেন। (মুসনাদে আহমাদ : ১০৭৪৯) কিয়ামতের দিন যখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন, সেদিন আপনাকে আল্লাহ ওই দুআর বদৌলতে এমন কিছু দান করবেন—যাতে আপনি আনন্দিত হবেন।

সুতরাং সব সময় আমাদের চাইতে হবে। আর চাইতে হবে কেবল আল্লাহর কাছে। চাইলেই পাব; হয় দুনিয়াতে, নয়তো পরকালে। যত চাইব, ততই লাভবান হব!

দুআ করা নবিদের চরিত্র

দুআ করা নবিদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সকল নবি-রাসূল আল্লাহ তায়ালার দরবারে একাগ্রচিত্তে দুআ করতেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে নবিগণ আল্লাহর কাছে সর্বদা দুআ করতেন। তাঁদের কিছু উল্লেখযোগ্য দুআ আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন—

সাইয়্যিদুনা আদম ﷺ দুআ করেছিলেন—

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। (এখন) যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (সূরা আ'রাফ : ২৩)

আদম ﷺ ভুলবশত একটা গাছের কাছে গিয়েছিলেন। তারপর ভুল বুঝতে পেরে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন।

সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন—

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ * رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ-

'হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদের নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন। হে আমার রব! আপনি আমার দুআ কবুল করুন।' (সূরা ইবরাহিম : ৪০)

এখানে দেখুন, ইবরাহিম ﷺ নিজের পাশাপাশি সন্তানদের জন্যও দুআ করছেন। সুতরাং সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুআ করা নবির সুন্নাহ। সুসন্তান ও নেককার স্ত্রী পাওয়ার জন্য আমাদের আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করা উচিত। এতে আমাদের পরিবার সুখী ও সমৃদ্ধ হবে।

সাইয়্যিদুনা ইউনুস ﷺ দুআ করেছিলেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

'(হে আল্লাহ)! আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র, মহান। নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারী।' (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

এই দুআটি ইউনুস ﷺ বিপদের সময় পড়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই আমরাও যখন বিপদে পড়ব, এই দুআটি বেশি বেশি করে পড়ব। এতে আল্লাহ আমাদের ওপর রহমত নাজিল করবেন। শুধু বিপদে পড়লেই নয়; স্বাভাবিক পরিবেশেও এই দুআ পড়া উচিত।

সায়্যিদুনা মুসা ﷺ দুআ করেছিলেন—

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ-

يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

'হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন—যাতে তারা (লোকজন) আমার কথা বুঝতে পারে।' (সূরা ত্ব-হা : ২৫-২৮)

মুসা ﷺ কথা বললে কথা আটকে যেত, কিছুটা তোতলাতেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত দুআ করেছিলেন। আমাদের মধ্যেও যাদের কথায় অস্পষ্টতা আছে, উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়, তাদের বেশি বেশি করে এই দুআ পড়া উচিত। যাদের উচ্চারণ সাবলীল আছে, তাদেরও এই দুআ পড়া উচিত। এতে করে তার কথা আরও সাবলীল হবে।

জাকারিয়া ﷺ দুআ করেছিলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ-

'হে আমার রব! আমাকে আপনি নিঃসন্তান বানিয়ে রাখবেন না, আপনিই তো উত্তম উত্তরাধিকার বা সন্তান দানকারী।'
(সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

জাকারিয়া ﷺ জীবনের বড়ো একটা সময়জুড়ে নিঃসন্তান ছিলেন। তাই সন্তান চেয়ে তিনি আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন। আল্লাহ এই দুআ কবুল করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সন্তান দান করেছিলেন।

আমাদের মধ্যে যারা নিঃসন্তান বা আরও সন্তান চাই, তাদেরও আল্লাহর কাছে এই দুআ করা উচিত। কারণ, সন্তান দিতে পারেন কেবল আল্লাহ; চাইলে তাঁর কাছেই চাইতে হবে। কোনো দরগা বা পীরবাবার কাছে সন্তান চাওয়া স্পষ্ট শিরক।

বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুআ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি বেশি দুআ করতেন। প্রতিটি বিষয়ের জন্যই তিনি আল্লাহর কাছে ধরনা দিতেন; কখনো নামাজের মাধ্যমে, কখনো দুই হাত তুলে, কখনো-বা সাধারণভাবে। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-এর জন্য দুআ করেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ-

'হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে কুরআনের জ্ঞান দান করুন।'
(সহিহ বুখারি : ৭৫)

এই দুআর বরকতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হয়েছিলেন 'রইসুল মুফাসসিরিন' বা তাফসিরবিদদের শিরোমণি!

আল্লাহর নবি ﷺ তাঁর ছোট্ট 'খাদেম' আনাস ﷺ-এর জন্য দুআ করেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ-

'হে আল্লাহ! আপনি আনাসের মালে বরকত দিন, সন্তানে বরকত দিন।' (সহিহ বুখারি : ১৯৮২)

এই দুআর বরকত আনাস ﷺ-এর পরবর্তী জীবনে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। আনাস ﷺ-এর খেজুরের বাগান ছিল। সবার খেজুরের বাগানে বছরে একবার খেজুর ধরত, আর তাঁর বাগানে খেজুর ধরত বছরে দুবার। তাঁর সন্তানের সংখ্যা ছিল ৮২ জন। এটাই হলো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দুআর বরকত।

অনেকে মনে করেন, অধিক সন্তানাদি ঝামেলা, ভালো রিজিকের প্রতিবন্ধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিক সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত ও উত্তম রিজিকের হাতিয়ার। রাসূল ﷺ অধিক সন্তান গ্রহণের জন্য উৎসাহ দান করেছেন। তিনি বলেন—

'এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং বেশি সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। কারণ, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।' (সুনানে আবু দাউদ : ২০৫০)

অধিক সন্তান অধিক সম্মানের নিদর্শন। তাই রহমতের নবি আনাস ﷺ-এর অধিক সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন। মক্কার জীবনের শুরুর দিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর দাওয়াতি কাজকে আরও বেগবান করতে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন—

'হে আল্লাহ! উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আবু জাহেলের মধ্যে যে তোমার বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো, মর্যাদা দান করো।' (জামে আত-তিরমিজি : ৩৬৮১)

আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর এই দুআ কবুল করেছিলেন এবং এই দুআর বদৌলতেই উমর ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল ﷺ বলেন—

'আল্লাহ তায়ালা সব নবিকেই একটি করে বিশেষ দুআর সুযোগ দিয়েছিলেন। যা কবুল হবেই হবে—এমন নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। আর সকল নবিই এই দুআটি দুনিয়াতেই করে ফেলেছে। কিন্তু আমি সেই বিশেষ দুআটি সযত্নে রেখে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য আমি সেই দুআটি কাজে লাগাব।' (সহিহ বুখারি : ৬৩০৫)

সুতরাং আমরাও আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করব।

দুআয় কী চাইব

দুআয় দুনিয়াবি নাকি পরকালীন বিষয় চাইব—এই নিয়ে আমরা অনেকেই দ্বিধায় পড়ে যাই। কেউ শুধু দুনিয়াবি বিষয়ে দুআ করি, কেউ শুধু পরকালীন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের জন্যই দুআ করতে শিখিয়েছেন। কুরআনের একটা অনিন্দ্যসুন্দর দুআ আছে। এই দুআর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের একই সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাত চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দিন, আখিরাতে কল্যাণ দিন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' (সূরা বাকারা : ২০১)

এটা কুরআনের সবচেয়ে বিস্তৃত অর্থের (Comprehensive) দুআ। এই দুআটির মর্মার্থ যদি খেয়াল করি, তবে দেখব—চাওয়ার মতো যা কিছু আছে, সবই এই দুআর মাধ্যমে চাওয়া হয়। দুনিয়াও চাওয়া হয়, আখিরাতও চাওয়া হয়। অনেকটা যেন এমন—গাছেরটাও খেলাম, তলারটাও কুড়ালাম। সুবহানাল্লাহ!

এবার আমরা জানব—দুআ কীভাবে করতে হয়? অনেকে বলে থাকে—'দুআ তো করি, কিন্তু কবুল তো হয় না।' মূলত দুআ কবুলের জন্য কিছু আদব ও শর্তাবলি মানতে হয়। একই সঙ্গে দুআ কবুলের জন্য কিছু বিশেষ সময়ও আছে—যার সদ্ব্যবহার করতে হয়। চলুন, এবার এসব বিষয়ে জানা যাক।

দুআর আদবসমূহ

যদিও দুআ যখন-তখন করা যায়, তবুও এর কিছু আদব রয়েছে। এসব আদব মেনে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আদবগুলো নিম্নরূপ—

- 'দুআর আগে সুযোগ থাকলে অজু করে নিন।' (সহিহ বুখারি : ৪৩২৩)
- 'কিবলামুখী হয়ে দুআ করুন।' (সহিহ বুখারি : ১০০৫)
  কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু দুআ করা ফরজ না। তবে কিবলামুখী হয়ে দুআ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- 'হাত তুলে দুআ করুন।' (সহিহ বুখারি : ২৮৮৪)
- দুআ হাত তুলেও করা যায়, হাত না তুলেও করা যায়। কিন্তু বিশেষ দুআ হাত তুলেই করা উত্তম, এতে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রিয়নবি ﷺ বলেন—

  > 'আল্লাহ খুব লজ্জাশীল। বান্দা যখন হাত তুলে দুআ করে, তখন আল্লাহ তার হাত দুটোকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।' (সুনানে আবু দাউদ : ১৪৮৮)

  তাই বলে সব দুআয়, সব জায়গায় হাত তোলা উচিত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব জায়গায় হাত তুলেছেন, সেসব জায়গায় হাত তুলুন। আর সাধারণ মাসনুনগুলো পড়ার সময় হাত তোলা অপ্রয়োজনীয়। যেমন : ঘুমের দুআ, মসজিদে প্রবেশের দুআ ইত্যাদি।
- 'দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও তারিফ করুন। নবির প্রতি দরুদ পড়ুন।' (জামে আত-তিরমিজি, নাসায়ি, সহিহুল-জামি : ৩৯৮৮)
- দুআ করার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শানে চোখের পানি ফেলুন। আল্লাহর রাহে চোখের পানি কখনো বৃথা যায় না।
- 'সুযোগ থাকলে একান্ত নীরবে দুআ করুন। আল্লাহর সাথে ওয়ান টু ওয়ান দুআ বেশি ফলপ্রসূ হয়।' (সূরা আ'রাফ : ৫৫)
- 'দুআর ভেতর নিজের পাপ স্বীকার করুন; নতজানু হয়ে কাতর কণ্ঠে মাফ চান। আল্লাহ তায়ালা অপরাধীর আত্মস্বীকৃতিকে পছন্দ করেন

এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গুনাহ ক্ষমা করেন।'
(আহমাদ, আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিজি, সহিহুল জামি : ১৬৫৩)

- 'দুআতে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে কাকুতি-মিনতি করুন। কাকুতি-মিনতি ছাড়া দুআ আসলে পরিপূর্ণ হয় না। একজন ভিক্ষুক কাকুতি-মিনতি ছাড়া ভিক্ষা কি পায়?' (সহিহ মুসলিম : ২১৮৯)

- 'দুআ করুন তিনবার। দুআর বেলায় কোনো জিনিস তিনবার চাওয়া বেশ উৎসাহমূলক একটি আদব। এতে দুআকারীর প্রয়োজনের মাত্রা বোঝা যায়।' (জামে আত-তিরমিজি, নাসায়ি, সহিহুল-জামি : ৬২৭৫)

- আল্লাহর সিফাতি নাম ধরে দুআ করুন। দুআ করার সময় আল্লাহর সুন্দর নাম ধরে দুআ করুন। তাতে আল্লাহ লজ্জায় পড়ে যান এবং দুআ কবুল করেন। যেমন : গুনাহ মাফ চাওয়ার সময় বলুন—ইয়া গাফফার, ইয়া গফুর, রিজিক চাওয়ার সময় বলুন—ইয়া রাজ্জাক, রহমত চাওয়ার সময় বলুন—ইয়া রহমান, ইয়া রহিম ইত্যাদি। (নাসায়ি : ১৩০০)

- নিজেকে আল্লাহর কাছে ছোটো করে উপস্থাপন করুন।

- দুআর শেষে 'আমিন' বলুন। এটা সুন্নাত। এ ছাড়াও নামাজে ইমাম সাহেব যখন সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শেষ করেন, তখন 'আমিন' বলুন। আমাদের 'আমিন' আর ফেরেশতাদের 'আমিন' যদি মিলে যায়, তাহলে আল্লাহ আমাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। (সহিহ বুখারি : ৭৮১)

- 'দুআর পর দুই হাত মুখে নিয়ে মাসেহ করুন।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৬৬)

এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে দুআ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আমাদের দুআ দ্রুত কবুল করবেন।

দুআ কবুলের সময়সমূহ

আল্লাহর দরবারে দুআর দরজা সব সময়ই খোলা। তবুও এমন বিশেষ কিছু সময় আছে—যখন দুআ করলে আল্লাহ তা দ্রুত দুআ কবুল করেন। সেই সময়গুলো হলো—

শেষ রাতে : রাতের শেষ অংশে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন, আর ডাকতে থাকেন—'কেউ কি আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কেউ কি আছ—যে আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তার চাওয়া পূরণ করে দেবো!' সুবহানাল্লাহ! (সহিহ বুখারি : ১১৪৫)

ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে : ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে দুআ করলে আল্লাহ দুআ কবুল করেন। এই সময়টায় আমাদের গল্পগুজব বা খাবার নিয়ে কথাবার্তা না বলে আল্লাহর দরবারে দুআ করা উচিত। (জামে আত-তিরমিজি : ৩৬৬৮)

আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে : আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ দুআ করেন। তাই এই সময়টাকে আমাদের কাজে লাগানো উচিত। (সুনানে আবু দাউদ : ৫২১)

ধরুন, জোহরের আজান হলো, ইমাম সাহেব এখনও আসেননি। মুসল্লিরা জোহরের সুন্নাহ নামাজ পড়ে বসে আছেন এবং ইমামের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই ফাঁকা সময়টা কিন্তু এমনি বসে না থেকে আমরা কাজে লাগাতে পারি; আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করতে পারি।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে : 'প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর দুআ কবুল হয়।' (জামে আত-তিরমিজি : ৩৪৯৯) এই সময়টায় আমাদের দুআ করা উচিত। তবে আমাদের দেশে যেভাবে হয়, সেভাবে না। এভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণ দুআ করতেন না। নামাজ শেষে তাড়াহুড়ো না করে ধীরস্থির হয়ে বসে তাসবিহ পড়ুন, তারপর বসে বসে আল্লাহর কাছে দুআ করুন।

সিজদায় : সিজদার দুআ কবুল হয়। বান্দা যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখন সে মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নিকটতম অবস্থায় চলে যায়। তাই রাসূল ﷺ এই বিশেষ মুহূর্তটাকে দুআ করে কাজে লাগাতে বলেছেন। (সহিহ মুসলিম : ৯৭০)

জুমার দিনে : জুমার দিনের একটা মুহূর্ত আছে, যে মুহূর্তে দুআ করলে আল্লাহ কবুল করেন। সেই মুহূর্তটি কখন? এটা নিয়ে অবশ্য স্কলারদের মধ্যে একাধিক মতামত আছে। বেশিরভাগের মত হলো—আসর থেকে মাগরিবের মাঝের সময়। (সুনানে আবু দাউদ : ১০৪৮)

লাইলাতুল কদরের রাতে : লাইলাতুল কদরের রাতে দুআ করলে আল্লাহ দুআ কবুল করেন। আমরা বাংলাদেশে মনে করি, লাইলাতুল কদর মানে শুধু ২৭ রমজান। না, রমজানের শেষ দশ রাতের যেকোনো বিজোড় রাত হলো লাইলাতুল কদর।

বৃষ্টির সময় : বৃষ্টির সময় দুআ কবুল হয়। এই সময় দুআ করলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। (সুনানে আবু দাউদ : ২৫৪০)

জমজমের পানি পানের সময় : জমজমের পানি পানের সময় দুআ করলে দুআ কবুল হয় (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩০৬২)। আমাদের দেশের পেক্ষাপটে জমজমের পানি পাওয়া খুবই দুরূহ। যদি কখনো এই পানি পানের সুযোগ পাই, তবে অবশ্যই দুআ কবুলের এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করব না। কারণ, যে নেক উদ্দেশ্যে আমরা জমজমের পানি পান করব, সেই উদ্দেশ্য আল্লাহ কবুল করবেন।

আরাফার দিনে : 'আরাফার দিনে দুআ কবুলের দিন। এই দিন বান্দা যে দুআ করে, আল্লাহ তা কবুল করেন।' (জামে আত-তিরমিজি : ৩৫৮৫)

জিহাদের ময়দানে : ইসলামের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুজাহিদরা যখন দাঁড়িয়ে থাকেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তখনকার সেই কঠিন মুহূর্তটা দুআ কবুলের জন্য মোক্ষম সময়। এই সয়মটা মুমিনের জন্য সুবর্ণ সুযোগ!
(আবু দাউদ : ২৫৪০; ইবনে মাজাহ, হাকিম, সহিহুল-জামি : ৩০৭৯)

রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে : রাতে ঘুম ভাঙলে সাধারণত আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তবে কেউ যদি এ সময়টায় আল্লাহর স্মরণ করেন, দুআ করেন, তবে আল্লাহ সেই দুআ কবুল করবেন। (সহিহ বুখারি : ১১৫৪)

অজুর পর : 'অজু করার পর দুআ করলে তা কবুল হয়।' (সহিহ মুসলিম : ২৩৪)

কাবার ভেতরে অবস্থানের সময় : কাবার ভেতরে দুআ করলে তা কবুল হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জায়গা হলো কাবাঘর। এখানে দুআ করলে তা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা যে অনেক—সেটা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। (মুসলিম : ২/৯৬৮)

জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন : 'জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন দুআ কবুলের সময়।' (সহিহ বুখারি : ৯৬৯)

রোগী দেখার সময় : রোগী দেখার সময় দুআ কবুল হয়। নবিজি বলেছেন—

> 'রোগীকে বা (দাফনের আগে) লাশ দেখার সময় ভালো কথা বলবে। কারণ, তখন তোমরা যা-ই বলো, ফেরেশতারা আমিন বলেন।' (সহিহ মুসলিম : ২১২৬)

মৃত্যুর সময় : মৃত্যুর সময় দুআ কবুলের অন্যতম সুযোগ তৈরি হয়। মানুষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করে অসীমের পথে—এমন ঘনঘোর সময়ে আশেপাশে যারা থাকবেন, তাদের গুরুদায়িত্ব হলো—এই মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির জন্য সবচেয়ে ভালো ভালো দুআ করা। মৃত্যুর ফেরেশতারা মানুষটির আত্মা বের করে নিতে তখন খুব কাছেই থাকেন। এই মুহূর্তে আমরা যা-ই বলি, তাতেই তাঁরা আমিন বলেন।
(মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ, সহিহুল-জামি : ৭২৬৬)

এবার আপনি কী কী চান, তার একটা তালিকা করুন। তারপর দুআ কবুলের সময়গুলোতে তালিকা ধরে একটা একটা করে দুআ করুন। বিশ্বাসীরা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করে। 'Don't work hard, work smart.'

দুআ কবুলের শর্তাবলি

দুআ কবুলের জন্য মৌলিক কিছু শর্ত রয়েছে। এগুলোর হেরফের হলে দুআ ডিসকোয়ালিফাইড বা বাতিল হয়ে যায়। শর্তগুলো হলো—

হালাল রিজিক গ্রহণ : আমাদের উপার্জন যদি হারাম হয়, তাহলে আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করবেন না। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কিছুই কবুল করেন না।' (সহিহ মুসলিম : ১০১৫)

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

> 'ওই শরীর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না—যা হারাম খেয়ে বড়ো হয়েছে।' (বায়হাকি)

দুআ করতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করলে সেই দুআ কবুল হবে না। বিশ্বনবি বলেন—

> 'তোমার কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে শুধু আল্লাহর কাছে চাইবে।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৫১৬)

তাই, চাইতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে। মাজারে বা পীরবাবার দরবারে কিছু চাওয়া যাবে না। মাজারে গেলে শুধু জিয়ারত করে চলে আসবেন। কারণ, কবর জিয়ারত করা সুন্নাহ এবং এতে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া যাবে না।

পূর্ণ আস্থা নিয়ে দুআ করা : দুআর সময় এমনভাবে চাইবেন, যেন মনে হয়—আপনি সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ আপনার দুআটি কবুল করবেন। (জামে আত-তিরমিজি : ৩৪৭৯)

দুআয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়া : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ না পড়লে দুআ আকাশ আর জমিনের মাঝখানে ঝুলে থাকে। এই দুআ আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছায় না। (আস-সাওয়াত, তাবরানি : ১/২২০)

দুআর সাথে সাথে দাওয়াও থাকা : অর্থাৎ দুআর সাথে সাথে যেটার জন্য দুআ করা হচ্ছে, সেটা হাসিলের চেষ্টাও করে যেতে হবে, কাজও করতে হবে। শুধু দুআ করে বসে থাকলে কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না; আর এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহও নয়। আপনি দুআ করে বসে থাকবেন, আর আল্লাহ আপনাকে আকাশ থেকে দিয়ে দেবেন—ব্যাপারটা এমন না।

এক লোক পীর সাহেবের কাছে গিয়ে বলল—'হুজুর! আমার জন্য দুআ করুন, আমার যেন সন্তান হয়।' হুজুর দুআ করলেন। এক বছর গেল, তার সন্তান হলো না। দুই বছর, তিন বছর গেল, তার সন্তান হলো না। সে এবার হুজুরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল—'কী দুআ করলেন হুজুর, কবুল তো হলো না।' পীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি বিয়ে করেছ?' সে বলল—'না।' 'তার মানে তুমি বিয়েই করোনি, তাহলে সন্তান হবে কীভাবে? আগে তো বিয়ের পর্বটা সেরে ফেলো, তারপরই না সন্তান পাওয়া না পাওয়ার প্রসঙ্গ।' তাই কর্ম না করে ফলাফল আশা করাটা বোকামি।

যাদের দুআ দ্রুত কবুল হয়

কিছু বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের দুআ আল্লাহ কবুল করেন। আমাদের উচিত, এই সমস্ত ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাঁদের কাছে দুআ চাওয়া। এই বিশেষ ব্যক্তিগণ হলেন—

পিতা-মাতা : 'আব্বা-আম্মার দুআ আল্লাহ কুবল করেন। তাঁদের দুআ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না।' (আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩২) তাই আব্বা-আম্মা ও মুরব্বিদের কাছে আমাদের দুআ চাওয়া উচিত। আমরা আব্বা-আম্মাকে রেখে অমুক দরবারে, তমুক দরবারে যাই। আসল 'দরবার' যে আমার ঘরে—এটাই ভুলে যাই!

আমার জন্য আমার আব্বার চেয়ে বড়ো পীর সাহেব আর কেউ হতে পারে না। আমার জন্য আমার আম্মার চেয়ে বড়ো পীর সাহেবা আর কেউই হতে পারে না। সারা দুনিয়ার আল্লাহর ওলিরা কুরআন পড়ে যদি গায়ে ফুঁ দেন, আর আমার আম্মা যদি আমার জন্য দুআ করেন, তাহলে আল্লাহ সবার আগে আমার আম্মার দুআ কবুল করে নেবেন।

মুসাফির : মুসাফিরের দুআ আল্লাহ কবুল করেন। এজন্য সফরে বের হলে আমাদের দুআ করা উচিত। একই সঙ্গে যারা সফরে বের হন, তাদের কাছেও দুআ চাওয়া উচিত।

মজলুম : মজলুমের দুআ আল্লাহ কবুল করেন। তাই মজলুম অবস্থায় আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা মজলুমের দুআ ফিরিয়ে দেন না। বিশ্বনবি বলেন—

> 'মজলুমের দুআকে ভয় করো। কারণ, মজলুমের দুআ আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না।' (সহিহ বুখারি : ১৩৯৫)

অপর ভাইয়ের জন্য দুআকারী ব্যক্তি : 'কেউ যখন অগোচরে অপর ভাইয়ের জন্য দুআ করে, তখন আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করেন।' তাই নিজের পাশাপাশি অন্যের জন্যও দুআ করা উচিত। অনেকেই বলে—'হুজুর! আমি নিজের জন্য দুআ করব, কিন্তু অন্যের জন্য কেন করব?' মূলত অন্যের জন্য দুআ করলে নিজেরও লাভ আছে। কেউ যখন অন্যের জন্য দুআ করে, তখন ফেরেশতারা বলতে থাকে—'হে আল্লাহ! আগে তার দুআটি কবুল করে নাও।' (সহিহ মুসলিম : ২৫৬)

মনে করুন, আপনি দুআ করলেন—'হে আল্লাহ! আমার এই ভাইটার টাকা-পয়সা নেই, তুমি তাকে ধনী বানিয়ে দাও।' তখন ফেরেশতারা বলবে—'হে আল্লাহ! যে দুআ করছে, আগে তাকে ধনী বানিয়ে দাও।' আপনি কোনো ভাইয়ের জন্য দুআ করলেন—'হে আল্লাহ! আমার ওই ভাইকে তুমি সুস্থ করে দাও।' ফেরেশতারা তখন বলে—'হে আল্লাহ! আগে যে দুআ করছে, তাকে সুস্থ করে দাও।'

তাই দুআ নিজে করার পাশাপাশি যাদের দুআ কবুল হয়, তাদের কাছেও দুআ চাওয়া উচিত।

দুআ এমন এক আলোকরশ্মি—যা গভীর অন্ধকারে পথ দেখায়। এ যেন মানুষের আশার পালে হাওয়া জোগায়, পৌঁছে দেয় তার গন্তব্যে। পথের সব শত্রুকে উপড়ে ফেলার অব্যর্থ হাতিয়ার এটি। মুমিন জীবনে দুআই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার (Dua the most powerful weapon of believers)।

দুআ ইবাদতের প্রাণ। আল্লাহর সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা কেমন, তা বোঝা যায় দুআর ধরন থেকে। আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় একনিষ্ঠ মুসলিমের মধ্যে ফুটে উঠে অসহায়ত্ব। সে বোঝে, আল্লাহকে তার চাই-ই চাই, সব সময়। তাঁর সাহায্য ছাড়া সে অচল। রাসূল ﷺ দুআ করার সময় নিজেকে আল্লাহর কাছে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য করে উপস্থাপন করতেন।

তিনি বলতেন—

> 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দাস, দাসের ঘরের দাস, দাসীর ঘরের দাস (অর্থাৎ আমি এবং আমার মাতা-পিতা আমরা সবাই আপনার গোলাম বা দাস)। আমার মাথার চুলের গোছা আপনার কুদরতি হাতের মুঠোয়; আপনি যেদিকে টানবেন, আমি সে দিকে যেতে বাধ্য। আপনি যা চান, আমার ওপর তা-ই ঘটাতে পারেন।' (মুসনাদে আহমাদ : ৩৭১২)

চলুন, নিজেকে তাই প্রশ্ন করি—আমাদের জীবনে দুআর অবস্থান কোথায়? আল্লাহর দিকে কতবার ফিরি আমরা? কী কী প্রয়োজনে তাঁর দারস্থ হই? কিছু চাওয়ার বেলায় কতটা একাগ্র আমরা? সব শর্ত আর আদব মেনে কি চাই? নাকি শুধু চেয়েই যাই—এসবের পরোয়া করি না?

আমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে বেখেয়াল? শুধু দরকার হলে তাঁর দ্বারে ভিড়ি? প্রয়োজন পূরণ হলে আবার ভুলে যাই? দুআ কবুল না হওয়ায় আমরা কি আল্লাহর মমতা আর প্রজ্ঞার ব্যাপারে হতাশ? কত-শত অনুগ্রহ যে তিনি দিয়ে রেখেছেন, তা কি সব ভুলে বসে আছি?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবুন। প্রয়োজনে বদলে ফেলুন নিজেকে। নয়তো যেখানে আছেন, সেখানেই পড়ে থাকবেন। আপনার একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে আপনার জীবন। আলোকিত করতে পারে আপনার সবকিছু। So, now the decision is yours.

হয়তো ভাবছেন, এই জীবনে যে পরিমাণ পাপ করেছি, আল্লাহ কি আর কখনো আমার ডাকে সাড়া দেবেন? আচ্ছা, আপনি কি অভিশপ্ত শয়তানের চেয়েও খারাপ? আল্লাহ যদি শয়তানের দুআ পর্যন্ত কবুল করেন, তাহলে আপনার দুআ কেন কবুল করবেন না? আপনি কি আল্লাহর বিশাল ভান্ডার সম্পর্কে জানেন না? আল্লাহর একটি নাম যে 'আল কারিম বা চির দয়াবান', জানেন না সেটা? তিনি কি আপনাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করে ইসলামের দিশা দেননি? অগণিত অনুগ্রহ দিয়ে ভরিয়ে রাখেননি? আপনি তো এগুলোর কিছুই চাননি। না চাইতেই যদি এত কিছু দিয়ে রাখেন, তাহলে তাঁকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে, তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় দুই হাত উঁচু করে তুলে ধরলে তিনি কি আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন?

কুরআনিক শিষ্টাচার

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়ার জন্য শুধু প্রাণ থাকাই যথেষ্ট নয়; মনুষ্যত্ব থাকাও জরুরি। তবেই প্রাণের মাঝে মানবিকতার পরশ পড়ে। মনুষ্যত্বের ছায়ায় জেগে উঠে প্রাণসত্তা। পূর্ণতা পায় মানবজনম।

মানবসত্তার দুইটি দিক রয়েছে; একটি পাশবিকতা (Animality), অপরটি বিচার-বুদ্ধি (Rationality)। এই বিচার-বুদ্ধিকে বলা হয় বিবেক, আরবিতে বলে আকল। বিবেকের সাহায্যে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর এ বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। আমরা হলাম আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। কুরআন মানুষের এই চিন্তাশক্তিকে খাটানোর তাগিদ দিয়েছে বারবার। বারবার তাদের চিন্তা করতে প্রণোদনা দিয়েছে। ঘুরেফিরে কয়েকটা আয়াত কুরআনে বারবার এসেছে—

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'এভাবেই আল্লাহ স্বীয় বিধানাবলি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে ভেবেচিন্তে কাজ করো।'
(সূরা বাকারা : ২৪২)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ-

'তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি—যাতে তারা উপলব্ধি করার মতো হৃদয় এবং শ্রবণ করার মতো কানের অধিকারী হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই হৃদয়—যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।' (সূরা হজ : ৪৬)

মানুষ একা একা পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না। তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। এজন্যই মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব, প্রচলিত প্রথা ও রীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি সমাজেই অলিখিত কিছু নিয়ম-নীতি থাকে, যার প্রতিফলন মানুষের পারস্পরিক আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এগুলোই সেই সমাজের শিষ্টাচার। আর যে শিষ্টাচার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তা ইসলামি শিষ্টাচার।

মানুষকে এসব নীতি-নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়াই ছিল যুগে যুগে নবি ও রাসূল প্রেরণের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য; যেমনটি ইবরাহিম ﷺ দুআ করেছেন—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন—যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন।' (সূরা বাকারা : ১২৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ-

'আমি আবির্ভূত হয়েছি কেবল নৈতিকতা ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই।' (মুসনাদে বাজ্জার : ৮৯৪৯)

একটি সমাজ সুস্থ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য উত্তম শিষ্টাচার চর্চার কোনো বিকল্প নেই। প্রচলিত আছে—'একটি মানুষ দুই বছরে কথা বলতে শেখে, আর পরিস্থিতি বুঝে কথা বলা শিখতে লাগে সারা জীবন।'

হাসান বসরি (রহ.) বলেন—

'যার মধ্যে শিষ্টাচার নেই, তার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই।'

বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি শিষ্টাচার শেখার জন্য সূরা হুজুরাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সূরায় সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখতে কিছু নৈতিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে আমরা সূরা হুজুরাত থেকে সামাজিক শিষ্টাচার জানার চেষ্টা করব।

এটি কুরআনের ৪৯তম সূরা। মাদানি যুগের একেবারে শেষের দিকে নবম হিজরিতে এই সূরাটি নাজিল হয়। তখন উম্মুল মুমিনিনদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর নির্ধারিত ছিল। আরবিতে ছোটো ঘরকে 'হুজুরাহ' বলে। এই সূরার ৪ নম্বর আয়াতে 'হুজুরাত' শব্দটি উল্লেখ আছে। আর এই শব্দ দিয়েই সূরাটির নামকরণ হয়েছে সূরা হুজুরাত।

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু (Central Theme) হচ্ছে—একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। মোটাদাগে এই সূরায় আমরা যা পাচ্ছি, তা হলো—

- কুরআন দ্বারা নির্ধারিত আর্থসামাজিক নীতিমালা (Socio-ethical norms prescribed by The Holy Quran)।
- শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিপূর্ণ গাইডলাইন (Moral & ethical guideline for a peaceful society)।
- সামাজিক আচরণের ইসলামি শিষ্টাচার (Islamic etiquettes of social behavior)।

একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজ কেমন হবে, তার একটি আদর্শ চিত্র এই সূরায় পাওয়া যায়। ইসলামি সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি থাকবে, যেখানে আল্লাহর বিধান ও রাসূল ﷺ-এর আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে। এখানে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকে তার নিজের প্রাপ্য অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে তৎপর ও আন্তরিক হবে। কারণ, এমন একটি সোনালি সমাজ রাতারাতি নির্মিত হয় না।

এই সূরার নাজিলের সময়কাল সম্পর্কে একটু ভাবুন তো! এটি রাসূল ﷺ-এর জীবনের একেবারেই শেষ সময়ে নাজিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। অর্থাৎ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য রাসূল ﷺ-কে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। সালাত, সিয়াম, জাকাত, হিজাব, জিহাদসহ ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিধিবিধান নাজিল শেষে মদিনার গোটা মুসলিম সমাজ যখন মানসিক ও আদর্শিকভাবে (Mentally and Ideologically) প্রস্তুত,

ঠিক তখনই সামাজিক শিষ্টাচারের বিশদ বর্ণনাসংবলিত এই সূরাটি আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য যে নীতিমালা, সামাজিক নিয়মকানুন ও শিষ্টাচার প্রয়োজন, তা এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই এই সূরাকে বলা হয় 'সূরাতুল আখলাক' বা চরিত্র গঠনের সূরা। এ সূরার অন্যতম বিশেষ একটি দিক হলো—এখানে আল্লাহ তায়ালা পাঁচবার يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে বিশ্বাসীদের অ্যাড্রেস করেছেন এবং একবার يَا اَيُّهَا النَّاسُ ব্যবহার করেছেন। বিশ্বাসীদের অ্যাড্রেস করতে বারবার এই শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ এই সূরার গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু মূলত তিন অংশে বিভক্ত—

প্রথম অংশ : প্রথম আট আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে আমাদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারসংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ফাসিক, পাপাচারী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শোনা কোনো তথ্য নির্বিচারে গ্রহণ না করে যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ : এই অংশে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার রীতি ও ধরন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা স্থান পেয়েছে নবম থেকে ত্রয়োদশ আয়াত পর্যন্ত।

তৃতীয় অংশ : এই অংশে প্রকৃত ঈমান অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, শুধু মৌখিক ঈমানই যথেষ্ট নয়; বরং অন্তরে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। ১৪-১৮ নং আয়াত পর্যন্ত এই আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রথম অংশ (আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার)

সূরাটির প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'হে মুমিনগণ! (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' (সূরা হুজুরাত : ০১)

এই আয়াতের সরাসরি অর্থ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না, তাঁদের চেয়ে অ্যাডভান্সড হয়ো না কিংবা বেশি বুঝতে যেয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাই ফাইনাল। ইসলাম শব্দের অর্থই হলো—আত্মসমর্পণ করা, আর মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। একজন ব্যক্তির ঈমান আনার অর্থ হলো—সে আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছে। রাসূলের সুন্নাহকে তার জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করেছে। নিজের ইচ্ছাধীন চলার বা আপন খায়েস প্রকাশের কোনো সুযোগ এখানে নেই। কুরআনের দেওয়া জীবন-দর্শনই তার নিজের জীবন-দর্শন। এটাই ঈমানের শাশ্বত দাবি।

যেকোনো কাজ করার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে, সেই বিষয়ে আল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের দিকনির্দেশনা কী। সেটি হালাল নাকি হারাম। কারণ, যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যই শেষ কথা। মানুষের কোনো কথা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আত্মসমর্পণ ও নিবেদন শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্র সকল পর্যায়ে কার্যকর। মুসনাদে আহমাদ, জামে আত-তিরমিজি ও ইবনে মাজায় সহিহ সনদে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে—রাসূল ﷺ মুয়াজ ইবনে জাবাল ﷺ-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠান। যাত্রার প্রাক্কালে নবিজি ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করেন—'মুয়াজ! তুমি এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত হচ্ছ, যারা মদিনার জনগণের ন্যায় মুসলিম নয়; বরং তারা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান। তাদের মধ্যকার কোনো সমস্যার ফয়সালা কীভাবে করবে?'

মুয়াজ : 'আল্লাহর কিতাব অনুসারে।'

রাসূল ﷺ : 'যদি কোনো বিষয়ে কুরআনে যথাযথ বিধান বা সমাধান পাওয়া না যায়?'

মুয়াজ : 'রাসূলের সুন্নাহর সাহায্য নেব।'

রাসূল ﷺ : 'যদি তাতেও উপযুক্ত সমাধান না পাও?'

মুয়াজ : 'নিজে ইজতিহাদ করব।'

তাঁর উত্তর শুনে বিশ্বনবি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বললেন—'আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। কারণ, তিনি রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথ বেঁছে নেওয়ার সামর্থ্য দিয়েছেন, যা তাঁর রাসূলের কাছে পছন্দনীয়।'

সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করা, ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করা, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে হত্যা করা (Capital Punishment), চুরি করলে হাত কাটা— এইগুলো সবই আল্লাহর বিধান। এ নিয়ে আমাদের কোনো কথা ধর্তব্য নয়। তবে এই বিধান বা শাস্তি কার্যকর করবে রাষ্ট্র; কোনো ব্যক্তি নয়। আবার এই বিধান কলা চোর, ডাব চোর, মুরগি চোরদের মতো পেটের দায়ে চুরি করা ছিঁচকে চোরদের জন্য নয়। এটি তাদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা অভাবের তাড়নায় চুরি করে না; করে স্বভাবের বসে। জনগণের টাকা মেরে পকেট ভর্তি করে। অন্যায়ভাবে সামান্য কলমের খোঁচায় লাখো-কোটি টাকা হাতিয়ে ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়ায়। দেশের টাকা দুর্নীতি করে বিদেশে পাচার করে, তাদেরকেই সর্বপ্রথম বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দেওয়া সকল আইন মানবজাতির কল্যাণের জন্য, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজ থেকে অন্যায় ও জুলুম দূরীভূত করার জন্য এবং মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

'হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা ভয় করতে পারো।'
(সূরা বাকারা : ১৭৯)

মূলত ঈমান আনার অর্থ হলো এই কথা স্বীকৃতি দেওয়া—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথার ওপর আমাদের কোনো কথা নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পতিত হলো।'
(সূরা আহজাব : ৩৬)

আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে ইসলাম শিখব। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটাই ইসলাম। বিশ্বনবি মাগরিবের ফরজ নামাজ পড়েছেন তিন রাকাত, আমরা যদি পাঁচ রাকাত পড়ি, তাহলে কি সেটা কবুল হবে? না, কখনোই না। নবিজি যা নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম। তার ব্যতিক্রম করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।' (সূরা হাশর : ০৭)

আপনি যদি বিশ্বনবির চেয়ে বেশি ইসলাম পালনকারী হতে চান, পারবেন না। প্রিয়নবির চেয়ে বড়ো মুত্তাকি হওয়া অসম্ভব। তিনি যতটুকু বলেছেন, ততটুকুই ইসলাম। তিনি যা করতে বলেছেন, তা-ই ইসলাম।

একবার তিনজন সাহাবি নবিজির আমল জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। তাঁরা নবিজির আমল সম্পর্কে সাহাবিদের অবহিত করলেন। নবিজির আমল শুনে তাঁদের মনে হলো—আরও বেশি আমল করা উচিত। নবিজির সমপরিমাণ আমলকে তাঁরা নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন না। ভাবলেন, নবিজির সাথে তো তাঁদের উদাহরণ চলে না। কারণ, তাঁর সামনের-পেছনের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এই আমল করেন, তাহলে তো তাঁদের আরও বেশি আমল করতে হবে। এসব ভেবে তিনজন তিনটি সিদ্ধান্ত নিলেন।

একজন বললেন—'আমি সারা জীবন রাতভর নামাজ আদায় করতে থাকব (রাতে কখনো ঘুমাব না)।'

দ্বিতীয়জন বললেন—'আমি সর্বদা (সারা বছর) রোজা রাখব, কখনো ভাঙব না।'

তৃতীয়জন বললেন—'আমি নারী সঙ্গ ত্যাগ করব, কখনো বিয়েই করব না (যাতে ফুলটাইম ইবাদত করতে পারি)।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদের এমন পরিকল্পনার কথা শুনলেন, তখন বললেন—

> 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর আনুগত্য করি। আমি রোজা রাখি এবং রোজা রাখা থেকে বিরতও থাকি। আমি রাতে যেমন নামাজ পড়ি, তেমনি ঘুমাইও। আমি বিয়েও করি।'

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের শুনিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা যেগুলো থেকে বিরত থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে চাচ্ছ, সেগুলো করেও আমি আল্লাহর আনুগত্য করছি এবং তাঁর সবচাইতে প্রিয়ভাজন হতে পেরেছি। এরপর শুনিয়ে দিলেন কঠিন হুঁশিয়ারি...

> 'যারা আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।' (সহিহ বুখারি : ৫০৬৩)

বিশ্বনবি যেটা শিখিয়েছেন, সেটাই চূড়ান্ত বুজুর্গি; এর বাইরে কোনো প্রকার বুজুর্গি হতে পারে না। তাই সকল কাজে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো মত ও পথকেই অবধারিত হিসেবে মেনে নেব। এতেই নিহিত রয়েছে চূড়ান্ত সফলতা।

পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ-

> 'হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবির আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে বলে থাকো। এতে না পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে।' (সূরা হুজুরাত : ০২)

প্রথম আয়াতের চেয়ে এই আয়াতের নির্দেশনা আরও কঠোর। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর কোনো নির্দেশনা অমান্য করা তো দূরের কথা; নবিজির সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ নবিকে মানুষের মধ্যে রেখেছেন। তাই বলে মানুষ একে অন্যের সাথে যেভাবে আচরণ করে, প্রিয়নবির সাথেও সেভাবে আচরণ করবে—এমনটা হতে পারে না। একে অন্যকে যেভাবে 'ও সলিমুল্লাহ' বলে ডাক দেয়, 'ও আবদুর রহমান' বলে ডাক দেয়, তেমনি নবিকে 'ও মুহাম্মাদ' বলে ডাকা যাবে না।

এই আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে—একবার বনু তামিম গোত্রের জন্য একজন নেতা নির্বাচন করা হচ্ছিল। আবু বকর ﵁ একজনের নাম প্রস্তাব করেন, উমর ﵁ করেন আরেকজনের নাম। এতে আবু বকর ﵁ রেগে যান। তিনি উমর ﵁-কে বলেন—'তোমার কাজই হলো আমার বিরোধিতা করা।' উমর ﵁ বলেন—'না, আপনার বিরোধিতা করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।'

এই নিয়ে দুজনের মাঝে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একসময় তর্কাতর্কি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এতে তাঁদের গলার স্বর বড়ো হয়ে যায়। দুজনই রাসূল ﷺ-এর সামনে উঁচু গলায় কথা বলতে থাকেন। এমন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ এই আয়াতটি নাজিল করেন। এরপর থেকে উমর ﵁ এত আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করেন যে, শুনতে না পেয়ে অনেক কথা তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে হতো। (সহিহ বুখারি : ৪৮৪৫)

উমর ও আবু বকর ﵁-এর মধ্যকার এই বিতর্ক থেকে আমারা কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করতে পারি। ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধান পালনে বা ইসলামি সমাজের যেকোনো কাজে মানুষের মাঝে মতানৈক্য হতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মতানৈক্য বা মতবিরোধ করাটা মানুষের একটা মানবীয় বৈশিষ্ট্য। তবে সাহাবাদের মতবিরোধ ছিল ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে, একটি গঠনমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নিমিত্তে এবং উম্মাহর কল্যাণের স্বার্থে। নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে কোনো মতবিরোধ তাঁদের ছিল না। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—উমর ﵁ ও আবু বকর ﵁ কি এই মতবিরোধ দ্বারা মুসলিম জনমতকে বিভক্ত (Grouping) করেছিলেন? এতে মুসলিম সমাজে (Community) কি কোনো ধরনের বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল? না, হয়নি। তাহলে আজ কেন আমরা সামান্য বিষয় বা ছোটোখাটো মতপার্থক্য নিয়ে মুসলিম জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছি? কেন আমরা অন্যের মতামতকে সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি? কেন আমরা পরচর্চায় সারাদিন মুখর থাকি? আমাদের সমাজে এমনও দেখা যায়, মাজহাবের মতপার্থক্যের কারণে মসজিদ আলাদা করা হয়। সামান্য আমলগত পার্থক্য থাকার কারণে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। এগুলো মোটেও কাম্য নয়।

যদিও রাসূল ﷺ-এর সামনে উপস্থিত সাহাবাদের সম্বোধন করে এই আয়াতটি নাজিল হয়, তথাপি এর মাধ্যমে মূলত রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলা ও বৈঠকের আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই আয়াতের মাধ্যমে এক সুদূরপ্রসারী শিষ্টাচার আমাদের বাতলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানেও এই আদব মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। এই আয়াত আমাদের নির্দিষ্ট দুটি আদব শিক্ষা দেয়, তা হলো—

প্রথমত : আমাদের মাঝে এখন নবি নেই, কিন্তু তাঁর সিরাত, সুন্নাহ ও হাদিস রয়েছে। তাই যখন-যেখানেই নবিজির হাদিস ও সুন্নাহ নিয়ে কথা হবে, তা আদবের সাথে গুরুত্ব দিয়ে শোনা ও মেনে চলা আমাদের দায়িত্ব। যারা হজ-উমরাহ করেছেন, তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—বিশ্বনবির কবরের ওপর এই আয়াতটি লেখা আছে। বেঁচে থাকাবস্থায় যেমন নবিজির সামনে বড়ো গলায় কথা বলা যেত না, তেমনি ইন্তেকালের পরও আপনি তাঁর পবিত্র কবরের সামনে গিয়ে বড়ো গলায় উচ্চবাচ্য করে কথা বলতে পারেন না; বরং অত্যন্ত বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যতার সাথে নবিজিকে সালাম দেবেন—এটাই আদব বা শিষ্টাচার।

দ্বিতীয়ত : আমাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত যে কেউ; মা-বাবা, আলিম উলামা, সম্মানিত ইমাম সাহেব, আধ্যাত্মিক নেতা, হাক্কানি পীর-মাশায়েখ, শিক্ষক, দাঈ ইলাল্লাহ কিংবা কোনো বৈঠকের প্রধান ব্যক্তিবর্গের সামনে বড়ো গলায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যাবে না। পিতা-মাতার ব্যাপারে তো বিশেষভাবে কুরআনে বলাই আছে—যেন তাঁরা সন্তানের কথায়, আচরণে বিরক্তিসূচক 'উহ' শব্দটিও বলতে বাধ্য না হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

'পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাঁদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাঁদের "উফ" পর্যন্ত বলো না এবং তাঁদের ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না; বরং তাঁদের সাথে সম্মান সহকারে কথা বলো।

আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাঁদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দুআ করতে থাকো এই বলে—"হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেমন তাঁরা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪)

এই আদব বা শিষ্টাচার মানলে আমাদের জন্য কী পুরস্কার আছে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ-

'জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই এমন লোক—যাদের অন্তর আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার।' (সূরা হুজুরাত : ০৩)

এর পরের আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ-

'হে রাসূল! তোমাকে যারা ঘরের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই আকল নেই।' (সূরা হুজুরাত : ০৪)

এই শিষ্টাচারগুলো আরবে ছিল না। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের এসবের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু নওমুসলিম বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুইন গোত্রের লোকেরা এসব শিষ্টাচার জানত না। তারা ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ঘরে সময়-অসময় বিবেচনা না করেই চলে আসত, ডাকাডাকি করত। এমনকী আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথেও একই আচরণ করত।

একবার বনু তামিম গোত্রের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের এক লোক এসে নবিজিকে ডাকা শুরু করল—'ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ' বলে। নবিজিকে এভাবে আদবহীনভাবে ডাকাডাকি আল্লাহ পছন্দ করেননি। তাই আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই আয়াতটি নাজিল করলেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৪৮)

বন্ধুর বাড়িতে গেলে মানুষ বন্ধুকে যেভাবে নাম ধরে ডাকে, নবি ﷺ-এর বাড়িতে এসেও তারা একইভাবে তাঁকে ডাকতে শুরু করেছিল। এর বিপরীতে তাদের কী করা উচিত ছিল, তা আল্লাহ পরের আয়াতে বলে দিয়েছেন—

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হতো। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত : ০৫)

আমরাও মাঝে মাঝে কারও বাড়িতে গেলে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ডাকাডাকি করি, তাড়াহুড়ো করি, অস্থিরতা প্রকাশ করি—'আরে! কতক্ষণ ধরে বসে আছি! আসে না ক্যান?' হতে পারে—আমি যখন তার বাসায় এসেছি, তখন তার ঘুমের সময়। মনে রাখতে হবে, যার বাড়িতে গেলাম, সে-ও তো একজন মানুষ। তারও তো অনেক সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে, তারও তো পেরেশানি আছে, তাই না? সুতরাং আমরা যে কারও বাসায় যাই না কেন, একটু ধৈর্য ধরব। তাকে সুন্দরভাবে উপস্থিত হওয়ার সময় দেবো। সবচেয়ে ভালো হয়—কোথাও যাওয়ার আগে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া। তার ব্যস্ততা আছে কি না জেনে নেওয়া। মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রেও এই শিষ্টাচারগুলো স্মরণ রাখা উচিত। কারও বিশ্রাম, ঘুম, নামাজ, এমনকী 'অফিস টাইমে' ফোন দেওয়া উচিত না। কাউকে ফোন দেওয়ার পূর্বে এসব চিন্তা করা দরকার। আমরা অনেকেই একবার ফোন রিসিভ না করলে একের পর এক ফোন দিতেই থাকি। এমনও তো হতে পারে, ব্যক্তিটি নামাজে আছে কিংবা ওয়াশরুমে আছে। তাই একবার ফোন রিসিভ না করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

এক্ষেত্রে স্ত্রীকে যদি স্বামীর ফোন রিসিভ করতেই হয়, তাহলে কথা বলার ক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। ফোন ধরে শুধু স্বামীর ব্যস্ততার কারণটা বলে কেটে দেবেন। অতিরিক্ত কথা একদম বলবেন না। কারণ, ফোনের এপাশ থেকে আপনি, ওপাশ থেকে পরপুরুষ আর মাঝখানে থাকে শয়তান!

একইভাবে কারও ঘরে প্রবেশ করারও কিছু সুন্নাহ রয়েছে—যেগুলো আমাদের পালন করা কর্তব্য। প্রথমত, সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না; যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করো এবং তার বাসিন্দাদের সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায় এ ব্যাপারে তোমরা খেয়াল রাখবে।' (সূরা আন-নুর : ২৭)

প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার জন্য কারও দরজার মুখোমুখি দাঁড়াবেন না। হয় দরজার ডান পাশে দাঁড়াবেন অথবা বাম পাশে। একবার এক ব্যক্তি বিশ্বনবির ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সাইয়্যিদুল মুরসালিন তাঁকে বললেন—

'দরজার ডান অথবা বাম দিকে দাঁড়াও। কেননা, চোখের দৃষ্টি সংযত রাখতেই অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।'
(সুনানে আবু দাউদ : ৫১৭৪)

কারও ঘরে প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাইতে হয়। এখন যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পাওয়া যায়, তাহলে কী করবেন? জোর করে ঘরে প্রবেশ করবেন? না, বিশ্বনবি বলেন—

'যদি তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চায়, তারপরও তাকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।'
(সহিহ বুখারি : ৬২৪৫)

প্রত্যেকেরই একটা প্রাইভেসি আছে, ইসলাম সেই প্রাইভেসিকে সমর্থন করে। আপনি হুট করেই কারও ঘরে ঢুকতে পারেন না; এমনকী আপনার গর্ভধারিণী মায়ের ঘরেও না!

এক ব্যক্তি এসে নবিজিকে বলল—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করার জন্য কি তাঁর অনুমতি চাইব?' রহমতের নবি বললেন, 'হ্যাঁ।' লোকটি তখন বলল—'কিন্তু আমি তো তাঁর সাথে একই ঘরে থাকি।' বিশ্বনবি বললেন—'তবুও অনুমতি চাইবে।' লোকটি আবার বলল—'আমি তো তাঁর সাথে একই ঘরে থাকি।' এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—'তুমি কি তোমার মা-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও?' সে বলল—'না।' অতঃপর প্রিয়নবি বললেন—'তাহলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ১৭৩৮)

ছেলে হয়ে মায়ের ঘরে ঢোকার সময় যদি অনুমতি লাগে, তাহলে ভাই তার বোনের ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নেওয়ার দরকার আছে কি না? শিক্ষকের ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নেওয়ার দরকার আছে কি না? তাই এ বিষয়ে আমাদের আরও সজাগ থাকতে হবে। এগুলোকে আমাদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। একদিনেই কোনো অভ্যাস গড়ে উঠে না। দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে মানুষ কোনো বিষয়ে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

কারও ব্যক্তিগত কিছু দেখার জন্য কিছুতেই কারও ঘরে উঁকি দেওয়া যাবে না। এটা বড়ো অন্যায়। বিশ্বনবি বলেন—

> 'যদি কোনো লোক অনুমতি ছাড়া তোমার দিকে উঁকি দেয় আর তুমি কঙ্কর ছুড়ে তার চোখ উপড়ে ফেলো, এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই।' (সহিহ বুখারি : ৬৯০২)

ইসলাম মানুষের প্রাইভেসিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। মায়ের ঘরে ঢোকার আগে যদি জিজ্ঞেস করেন—'মা, আসব?' মা তখন অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকলে নিজেকে সামলে নিতে পারবেন; আপন মাকে বিব্রতকর অবস্থায় আর দেখতে হলো না। তাই এই প্র্যাকটিসটি আমাদের সমাজে বাড়াতে হবে।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ-

> 'হে মুমিনগণ! কোনো ফাসিক যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে—যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হও।' (সূরা হুজুরাত : ০৬)

কোনো সংবাদ শোনা মাত্রই তা বিশ্বাস করবেন না এবং নির্বিচারে তা প্রচার করতে যাবেন না। আগে সরেজমিনে তার সত্যতা যাচাই করে দেখবেন। আমাদের সমাজে অনেক রকম গুজব ওঠে। এগুলোর সত্যতা যাচাই না করে নির্বিচারে বলে বেড়ানো বা প্রচার করা ঠিক না। কারণ, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াটও হতে পারে।

ধরুন, আপনার বন্ধু এসে আপনাকে বলল—'আজ ভাবিকে দেখলাম, বাজারে একটি ছেলের হাত ধরে ঘুরছে।' আপনি খবরটার সত্যতা যাচাই না করেই বাসায় গিয়ে স্ত্রীর ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে দিলেন। এটা ঠিক না। আগে এ ব্যাপারে আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। বাসার অন্যান্যদের থেকেও ক্রস চেক করুন। তারপর ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত নিন। তা না হলে রাগের মাথায় হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পরে পস্তানো লাগতে পারে। এমনকী এই সামান্য ঘটনা আপনাদের বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। হতে পারে আপনার বন্ধু আপনাকে মিথ্যা বলেছে অথবা সে যাকে দেখেছে, তার সাথে আপনার স্ত্রীর চেহারার মিল আছে কিংবা একই রঙের পোশাক পরেছে। তাই এক্ষেত্রে আপনার উচিত শোনা খবর যাচাই করে নেওয়া।

এই আয়াত নাজিলের একটি প্রেক্ষাপট আছে। আয়াতটি ওয়ালিদ ইবনে উকবাহ ইবনে আবি মুআইত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বিশ্বনবি তাঁকে বনু মুস্তালিক গোত্রের জাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেই এলাকায় না পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পেয়ে মদিনায় ফিরে এলেন এবং বললেন—'তারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বনবি তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনাবাহিনী পাঠানোর মনস্থির করলেন। ঠিক সেই সময়ে বনু মুস্তালিক নেতা হারেস ইবনে দেরার এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবিজির খেদমতে হাজির হলেন। হারেস ইবনে দেরার সব শুনে বললেন—'আল্লাহর কসম! জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার কিংবা ওয়ালিদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরে থাক, আমরা তাঁর সাক্ষাৎই পাইনি। আমরা ঈমানের ওপর অবিচল আছি এবং জাকাত প্রদানে ইচ্ছুক।' এতক্ষণে রাসূল ﷺ মূল ঘটনা বুঝতে পারলেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা হুজুরাতের ছয় নম্বর আয়াতটি নাজিল করেন—যাতে কোনো সংবাদ যাচাই ব্যতীত গ্রহণ না করা হয়। (তাফসিরে জালালাইন, আসহাব আল নুজুল : ওয়াহিদি)

এই আয়াত আমাদের যেকোনো তথ্য বা ঘটনা নিশ্চিত না হয়ে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছে। ইনফরমেশন পাওয়ার সাথে সাথে তা বিশ্বাস করে অ্যাকশনে যাওয়া নয়; বরং যাচাই করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত আমাদের যেসব বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছে—

- গুজব কিংবা স্ক্যান্ডালের সত্যতা যাচাই (Justification of rumors or scandals)।
- যেকোনো খবরের সত্যতা যাচাই (To check the authenticity of any news)।
- কোনো খবর ছড়ানোর পূর্বে একাধিকবার চেক করা (To cross check/verify reports before spreading it)।

পরবর্তী দুটি আয়াতেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সম্মান বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ-

'ভালোভাবে জেনে রাখো, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল আছেন। আর বহু বিষয় এমন আছে—যে সম্পর্কে তিনি যদি তোমাদের কথা মেনে নেন, তবে তোমরা নিজেরাই সংকটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাঁকে তোমাদের অন্তরে করে দিয়েছেন আকর্ষণীয়। আর তোমাদের কাছে কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন। এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে।' (সূরা হুজুরাত : ০৭)

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'যা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নিয়ামতেরই ফল। আল্লাহ মহা জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।' (সূরা হুজুরাত : ০৮)

এই আয়াত দুটির প্রেক্ষাপটও পূর্বের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। বনু মুস্তালিকের ঘটনায় যখন সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলম্ব করছিলেন। কিন্তু উপস্থিত অনেকেই ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। সেই ঘটনাকে উপজীব্য করেই আয়াতগুলো নাজিল হয়।

এখান থেকে আমরা বড়ো একটি শিক্ষা নিতে পারি। আমরা অনেকেই নিজেদের মতামতকে আল্লাহ ও রাসূলের মতের বা পদ্ধতির চেয়ে উত্তম মনে করি। এটা ভুল; বরং আমাদের যথেচ্ছ মতামত কখনো কখনো ব্যাপারগুলোকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। এই ঘটনায় সকলের পীড়াপীড়িতে রাসূল ﷺ যদি সত্যিই বনু মুস্তালিকে সেনা অভিযান পরিচালনা করতেন, আর এই অভিযানে যদি বনু মুস্তালিকের কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হতো, তখন এই হত্যাকাণ্ডের দায়

রাসূল ﷺ এড়াতে পারতেন না। আর এমনটা হলে দয়ার নবি গভীরভাবে মর্মাহত এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হতেন।

দ্বিতীয় অংশ (পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ)

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

'মুসলিমদের দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ো। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করে দিয়ো এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা হুজুরাত : ০৯)

এই আয়াতে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সংঘাতের সময় কর্মনীতি কী হবে—এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার কথা বলেছেন। কাদের মাঝে এই বিবাদ? মুসলিমদেরই দুটি দলের মাঝে। এই বিবাদে লিপ্ত দুটি দলকেই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছেন। এরপর আল্লাহ তাদের মাঝে সমঝোতা করতে বলেছেন। সমঝোতা কারা করবেন? সমঝোতা করবেন ঈমানদারদেরই তৃতীয় আরেকটি দল। যদি বিবাদমান পক্ষদ্বয় কোনো সমঝোতায় না পৌঁছায়, তবে যে পক্ষ সীমালঙ্ঘন করেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এটা আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ ওয়াজিব।

সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষ সঠিক পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট; সঠিক পথে ফিরে না এলে কেবল বিবাদ বন্ধ করার জন্য শান্তিচুক্তি করা যাবে না। বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে জুলুম। তাই, জুলুম বন্ধ না হলে একপক্ষ বৈষম্যের শিকার হতেই থাকবে।

তবে ব্যবস্থা গ্রহণ বলতে যুদ্ধ বা মারামারিই করতে হবে—বিষয়টা এমন নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে সীমালঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে হবে।

আলি ﷺ তাঁর গোটা খিলাফতকাল কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। (রুহুল মাআনি)

মুসলিমদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ অনেকটা আত্মহত্যার শামিল। কেননা, হাদিসের ভাষ্য হচ্ছে—সকল মুসলিম একটি দেহের মতো। এক মুসলিম আরেক মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থই হচ্ছে—আপন শরীরের এক অঙ্গ দ্বারা অপর অঙ্গকে আঘাত করা, ক্ষতবিক্ষত করা। অর্থাৎ নিজেই নিজেকে আঘাত করা।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আছে না? জমি নিয়ে মারামারি আছে না? দুজন যদি মারামারি করে, তাহলে আমরা কী করব? মিটিয়ে দেবো। সমঝোতা করব। সংকট নিরসনের উপায় বাতলে দেবো। একদল আছে—যারা মারামারি বাধলে আরও বাধিয়ে দেয়। তাদের মারামারি দেখতে ভালো লাগে! আগুন লাগলে তেল নয়; পানি ঢালা দরকার। তেমনি বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে তা উপশম করাই কাম্য; উসকে দেওয়া নয়। আপনি যদি দুজনের মধ্যে সমঝোতা করেন, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। যদি দেখেন—দুজন রিকশাওয়ালা ঝগড়া করছে, আপনি এগিয়ে গিয়ে দুজনের মধ্যে সমঝোতা করে দেবেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে মধ্যস্থতা করবেন। বন্ধুর সাথের বন্ধুর ভুল বোঝাবুঝি হলে মিটমাট করে দেবেন। এটাই প্রকৃত ঈমানদারের আচরণ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

> 'আমি কি তোমাদের রোজা, নামাজ ও সাদাকার মর্তবা থেকেও উত্তম বিষয় সম্পর্কে বলব না? সাহাবিগণ আরজ করলেন, আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন—বিবাদরতদের মধ্যে মীমাংসা করা। আর জেনে রেখ, পরস্পর বিবাদই মানুষের দ্বীন মুড়িয়ে দেয়।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯১৯)

একবার বিশ্বনবি তাঁর মেয়ে ফাতিমা ﷺ-এর বাড়ি গেলেন, কিন্তু আলি ﷺ-কে দেখলেন না। নবিজি মেয়েকে আলি ﷺ-এর কথা জিজ্ঞেস করলে

তিনি বললেন—'আমাদের মাঝে মনোমালিন্য হয়েছে, এজন্য তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে আলি ﷺ-এর খোঁজে পাঠালেন। লোকটি এসে নবিজিকে জানাল—'আল্লাহর রাসূল! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।'

নবিজি মসজিদে গিয়ে দেখলেন, আলি ﷺ কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরের চাদর একপাশে পড়ে আছে। সারা গা ধুলোমলিন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আলি ﷺ-এর শরীরের মাটিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—'ও আবু তুরাব! ওঠো। ও আবু তুরাব! ওঠো।' (সহিহ বুখারি : ৪৪১)

মাটিকে আরবিতে তুরাব বলে। আলি ﷺ যেহেতু মাটিতে শুয়ে ছিলেন, তাই নবিজি তাঁকে মজা করে বললেন—'আবু তুরাব' বা 'মাটির বাবা!' এভাবে আদুরে ডাকের মাধ্যমে নবিজি আপন মেয়ে ও জামাতার মধ্যে সমঝোতা করে দিলেন।

বিশ্বনবি দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন মিলন ও ঐক্য ঘটানোর জন্যই; ফাটল ও বিচ্ছেদ তৈরি করতে নয়। প্রিয়নবি যেখানেই গেছেন, সেখানেই মিলন ও ঐক্য ঘটিয়েছেন।

মদিনায় হিজরত করার আগে সেখানকার দুটো গোত্র আউস ও খাজরাজের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। বিশ্বনবি যখন মদিনায় এলেন, এই দুই গোত্র সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো; আশা করা যায়—তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করা হবে।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

এই আয়াতে মুমিনদের পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলাম চায়—প্রতিটি মুসলিম ভালোবাসা ও মায়া-মমতার বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করবে। একতাবদ্ধ ও মিলেমিশে থাকার ইসলামি পরিভাষা হলো—'উখওয়াত' বা ভ্রাতৃত্ব। দেশ, জাতি, অঞ্চল,

ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম মিলেই গড়ে উঠে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্ব মূলত (Brotherhood) তিন ধরনের—

১. **মানবতার ভাই :** মানুষ হিসেবে আমরা সবাই ভাই ভাই। কারণ, আমাদের আদি পিতা আদম ﷺ এবং আদি মাতা হাওয়া ﷺ। সে হিসেবে হিন্দুও আমার ভাই। খ্রিষ্টানও আমার ভাই। নাস্তিকও আমার ভাই।

২. **আপন ভাই :** আপন ভাই বলে আমরা বুঝে থাকি সহোদর ভাই বা রক্তের সম্পর্কের ভাই।

৩. **দ্বীনি ভাই :** এই ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল ﷺ-এর রিসালাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাওহিদ ছাড়া ইসলামি ভ্রাতৃত্ব কল্পনাই করা যায় না। আল্লাহর দ্বীনকে কেন্দ্র করে এই ভ্রাতৃত্বের গোড়াপত্তন বিধায় এই সম্পর্ককে দ্বীনি ভাই বলা হয়। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এতটাই শক্তিশালী, সম্পর্কের দিক থেকে তা কখনো কখনো রক্তের সম্পর্ককেও ছাড়িয়ে যায়। এই সম্পর্ক সিসাঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত। আর তাই মুসলিমরা একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী, রুহামা (Soft-hearted), পরস্পরের আয়নাস্বরূপ।

তাই মুসলিমদের মধ্যে কোনো বিবাদের সৃষ্টি হলে আলোচনার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক ঠিক রাখা আমাদের দায়িত্ব।

সূরা হুজুরাতের ১১-১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের পাঁচটি বদগুণের ব্যাপারে সাবধান করেছেন, যেগুলোর কারণে আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়। এগুলো যদি আমাদের চরিত্রের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে ত্বরিত গতিতে আমরা সংশোধন করে নেব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম।

কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়েও উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তওবা করে না, তারাই তো জালিম।' (সূরা হুজুরাত : ১১)

পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ-

'হে মুমিনগণ! অধিক অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে লেগে পড়ো না এবং একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণাই করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত : ১২)

উপরিউক্ত আয়াত দুটোতে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি নেতিবাচক গুণের কথা বলেছেন।

- অন্যের নিন্দা করা
- মন্দ নামে ডাকা
- মন্দ ধারণা করা
- অন্যের গোপন বিষয়ে পেছনে লাগা
- গিবত করা।

'সুখরিয়্যাহ' তথা বিদ্রুপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা নয়; বরং কারও কোনো কাজের ব্যঙ্গাত্মক অভিনয় করা, তার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিতসূচক কথা বলা, কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা, কাউকে অন্যের সামনে হেয় করা,

তার কথা-কাজ-চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোনো ত্রুটির দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে অন্যদের হাসি পায়—এই সবগুলোকেই বোঝায়। অর্থাৎ Putting down someone in any way or to scoff at someone-এ সবই হাসি-তামাশার অন্তর্ভুক্ত। মূল বিষয় হলো—কেউ যেন কোনোভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাশার লক্ষ্য না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাশা ও ঠাট্টার পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়োত্ব প্রদর্শন এবং অপরকে অপমানিত ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর থাকে।'

আমাদের মাঝে অনেকেরই উচ্চারণে জড়তা থাকে। কেউ-বা ভুল ও অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করে, আর তখনই আমরা হেসে উঠি। তা নিয়ে উপহাস করি। আবার কেউ হয়তো একটু খাটো অথবা মোটা অথবা কারও চুল হয়তো একটু কোঁকড়ানো অথবা অন্য যেকোনো কিছু! আমরা এসব নিয়ে কথা বলি, তাকে ছোটো করার চেষ্টা করি। এগুলো খুবই নিন্দিত কাজ! এ সবই নিষিদ্ধ।

বিশেষ করে কারও আকৃতি বা শারীরিক গঠন নিয়ে কাউকে ব্যঙ্গ করা সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে ব্যঙ্গ করার শামিল। কারণ, কারও আকৃতি বা শারীরিক গঠন তার নিজের আয়ত্তাধীন নয়; বরং আল্লাহ তায়ালাই তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের আকৃতি নির্ধারণের সুযোগ যদি আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের হাতে ছেড়ে দিতেন, তাহলে প্রত্যেকেই তার নিজেকে সবচেয়ে নিখুঁত, সবচেয়ে সুন্দর আর হ্যান্ডসাম করে তৈরি করত। কিন্তু এই ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা কাউকে দেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর পায়ের নলা ছিল খুব চিকন। একবার তিনি রাসূল ﷺ-এর জন্য মিসওয়াকের ডাল ভেঙে আনতে একটি গাছের ওপর উঠলেন। বাতাসে তাঁর পায়ের অংশ প্রকাশ হয়ে গেল। সবাই সেটা দেখে হেসে উঠল। রাসূল ﷺ এটা খুব অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন—'তোমরা তাঁর পা দেখে হাসছ? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! এই পা দুটোর ওজন মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি!'
(মুসনাদে আহমাদ : ৩৯৯১)

আয়িশা ﷺ একবার বিশ্বনবির আরেক স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই ﷺ-এর শারীরিক গঠন নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'সাফিয়া খাটো আকৃতির।' রাসূল ﷺ এটা খুব অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন—'হে আয়িশা!

তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যে কথাটিকে লোহিত সাগরের পানিতে মিশিয়ে দিলে তা পুরো সাগরের পানিকেও কলুষিত করে ফেলবে।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৭৫)

অন্যের নিন্দা করা

এখানে নিন্দা বোঝাতে لَمْز (লামাজা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে নিন্দা, বিদ্রুপ ও কুৎসা ছাড়াও আরও কিছু অর্থ নিহিত রয়েছে। ইংরেজিতে Insult, Defame, Ridicule, Finding other people's fault. যেমন : কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করা, খুঁত বের করা, অন্যের বদনাম করা, অন্যের দোষ ধরা, খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে কাউকে তিরস্কারের লক্ষ্য বানানো—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাই এগুলোকে হারাম করা হয়েছে।

আমরা অনেকে অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করি। নিজের সমালোচনা যে করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আপনি কার বদনাম করেন? কাকে গালি দেন? হয়তো-বা সে আল্লাহর কাছে আপনার চেয়েও বেশি প্রিয়।

ইংরেজি প্রবাদে বলা হয়—

Small minds discuss people.	ছোটো মনের মানুষ অন্যকে নিয়ে কথা বলে।
Average minds discuss events.	গড়পড়তার মানুষ ঘটনা নিয়ে কথা বলে।
Great minds discuss ideas. They generate ideas to make a better society.	বিশাল মনের মানুষ আইডিয়া নিয়ে কথা বলে। তারা উন্নত সমাজ গড়তে আইডিয়া তৈরি করে।

দেখুন, ব্যাপারটা কত অদ্ভুত! আল্লাহ বলেন—'অন্যের দোষ খুঁজো না।' আর আমরা সারাদিন অন্যের দোষ খুঁজতেই ব্যস্ত থাকি। মানুষ সর্বদা অন্যের সমস্যা খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু একবারের জন্যও নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না—তার মধ্যে কী কী সমস্যা রয়েছে!

মহান আল্লাহ বলেন—

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ-

'বহু দুঃখ আছে সেই ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম (এবং) মুখের ওপর নিন্দা করতে অভ্যস্ত।' (সূরা হুমাজাহ : ০১)

মনে রাখবেন, আল্লাহর দেওয়া আপনার জন্য সবচেয়ে দামি উপহার হলো 'সময়'। সময়কে কাজে লাগান। অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজিতে তা নষ্ট করবেন না। নিজের দোষ খুঁজুন। নিজেকে উন্নত করুন।

মন্দ নামে ডাকা

আমাদের সমাজে কেউ কালো হলে তাকে সাধারণত 'কালু' নামে ডাকা হয়। কেউ মোটা হলে 'মটু' 'পেটো' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যকর নামে ডাকা হয়। কেউ চিকন লিকলিকে হলে তাকে বলা হয় 'চিকনা', 'পাটকাঠি'। কারও দেহের গঠন ও শরীরের অবয়ব নিয়ে এভাবে উপহাস করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। যে কালো হয়েছে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে; সেখানে তার কোনো হাত নেই। সুতরাং এসব নিয়ে অবজ্ঞা করার অধিকারও আমাদের নেই। এসব নিয়ে মন্তব্য করলে আল্লাহর সৃষ্টির ওপর মন্তব্য করা হয়।

আল্লাহ নিষেধ করেন, কাউকে যেন মন্দ নামে ডাকা না হয়। কারও বাবা যদি চোর থাকে, তাকে 'চোরের বাচ্চা চোর' বলবেন না। তার বাবা চোর হতে পারে, কিন্তু সে তো চোর না। ইসলামে নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যার যে নাম, তাকে সে নামেই ডাকা উচিত।

বাবা-মা আদর করে ইসলামের প্রথম খলিফার সাথে মিলিয়ে ছেলের নাম রেখেছে আবু বকর। সমাজের অনেকেই তাকে ডাকে 'বক্কইররা্যা' বলে! বাবা-মা নাম রেখেছে আবদুল কুদ্দুস, সমাজের লোকেরা ডাকে 'কুদ্দুইসস্যা' (আসতাগফিরুল্লাহ!) —এ কেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! বাবা-মা নাম রেখেছেন ইসলামের প্রথম তির নিক্ষেপকারী সাহাবির নামে 'ওয়াক্কাস', লোকেরা তাকে ডাকে 'আক্কাইসস্যা' বলে!

কেউ যদি আপনার নাম বিকৃত করে ডাকে, কেমন লাগবে? নিশ্চয় ভালো লাগার কথা নয়। তাহলে আপনি কেন অন্যের নাম বিকৃত করে ডাকছেন? এমনটা কিছুতেই করা যাবে না। প্রত্যেকের কাছে নিজের নামটা বড়ো পছন্দের, বড়ো আদরের। বড়ো যত্নের। কারণ, এ নামেই তাকে সম্বোধন করা হয় এবং এ নামটাই তার প্রাথমিক পরিচয় বহন করে। তাই অন্যের ভালোবাসা, আবেগকে গুরুত্ব দিন।

অনেক সময় আমরা ভালো নাম বা উপাধিকেও খারাপ অর্থে ব্যবহার করি। যেমন : কাউকে বললাম পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সে মূলত পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী নয়—এটাও একধরনের বিদ্রুপ (Irony)।

সহজ কোথায়, প্রত্যেকে তার নিজের নামটা যে শব্দে শুনতে পছন্দ করে, তাকে সে নামেই ডাকুন। এটাই ইসলামি শিষ্টাচার।

মন্দ ধারণা করা

সব প্রকারের ধারণা করা গুনাহ নয়; বরং এমন কিছু ধারণা আছে—যেগুলো পোষণ করা উত্তম। যেমন : আল্লাহ, রাসূল ও ঈমানদারদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। এ ছাড়াও যাদের সাথে নিত্যদিন উঠাবসা হয়, তাদের ব্যাপারেও সুধারণা পোষণ করা উত্তম। তা ছাড়া বিচার প্রক্রিয়ায় প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কখনো কখনো রায় দিতে হয়—এটাও গুনাহ নয়।

কিন্তু এসব ক্ষেত্র ছাড়া কারও ব্যাপারে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মন্দ ধারণা পোষণ করা গুনাহ। বিনা কারণে কারও প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার সময় খারাপ ধারণার নিয়ে শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা— যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও ভদ্র হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির কোনো কথা বা কাজে যদি ভালো ও মন্দ ও উভয়ের সমান সম্ভাবনা থাকে, অথচ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নিই, তাহলে তা গুনাহের কাজ বলে গণ্য হবে।

যেমন : ধরুন, কোনো সৎ ও ভদ্র লোক মাহফিল থেকে চলে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারও জুতা উঠিয়ে নিলেন। আমরা যদি এখন ধরে নিই—জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন, তাহলে তা সুধারণা হবে না। কারণ, তার ভুলেও এমনটা হতে পারে। ভালো সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ হলো—ধারণা।

এজন্যই অনুমাননির্ভর কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমরা এই কাজটাই বেশি বেশি করি! এভাবে কথা বলা হলো কবিরা গুনাহ। কারণ, বেশিরভাগ অনুমাননির্ভর কথাগুলো সঠিক হয় না। নিশ্চয় আন্দাজ আর অনুমান কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, খারাপ ধারণাপ্রসূত বিষয় সর্বাপেক্ষা মিথ্যা।' (সহিহ মুসলিম : ৬৪৩০)

সাইয়্যিদুনা উমর ﷺ বলতেন—

> 'একজন মুসলিমের অন্য আরেকজন মুসলিমের কথাকে খারাপ মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। মুসলিমের উচিত, খারাপ ধারণার পরিবর্তে ভালো ধারণা পোষণ করার চেষ্টা করা।' (আল তামহিদ : ১৮/২০)

আপনার যদি কারও ব্যাপারে ধারণা করতেই হয়, তাহলে ভালো ধারণা করুন। যেখানে অর্ধেক অর্ধেক সম্ভবনা আছে, সেখানে ইতিবাচক ধারণাটিকে গ্রহণ করুণ। আপনি দেখলেন, এক বাড়িতে পুলিশ ঢুকছে। পুলিশ ঢুকতে দেখে আপনি পুরো গ্রামকে জানিয়ে দিলেন—'ওই বাড়িতে মারামারি হইছে, ইয়াবা ধরতে এসেছে' অথবা 'চোরাকারবারি ধরতে আসছে'—এমনটি ঠিক নয়। হতে পারে, ওই বাড়ির কেউ অসুস্থ। পুলিশ তার অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে এসেছে। আবার পাসপোর্টের ভ্যারিফিকেশনের জন্যও পুলিশ আসতে পারে; অথচ আপনি আন্দাজের বসে পুরো এলাকায় ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিলেন!

আপনার বন্ধুকে রিকশায় এক মেয়ের সাথে দেখে কানাঘুষা শুরু করলেন। হতেও তো পারে, মেয়েটা তার বোন বা খালা। কিন্তু আপনি ধারণা করে গুনাহ কামিয়েছেন। কারও ঠোঁট কালো দেখলেই বলা হয়, সে সিগারেট খায়; অথচ সে জীবনে কোনোদিন সিগারেট ছুঁয়েও দেখেনি। সিগারেট না খেলেও তো অনেকের ঠোঁট কালো হতে পারে। আপনাকে আন্দাজে কথা বলতে কে বলেছে? What might appear in our eyes as real, may not always be true. Perhaps, there are some hidden realities that we are totally unaware of.

অন্যের গোপন বিষয়ের পেছনে লাগা

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'গোয়েন্দাগিরি করো না।' অনেকেই গোয়েন্দাগিরি করে, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করে। অন্যের জীবন নিয়ে আমাদের অনেকেরই কৌতূহলের মাত্রাটা খুব বেশি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলালে যেন পেটের ভাতই হজম হতে চায় না। অন্যের জীবনের ব্যক্তিগত জায়গাগুলো নিয়ে নিঃসংকোচে আমরা প্রায়ই হুটহাট মন্তব্য বা প্রশ্ন করে বসি। যেমন—'আপনার বেতন কত?' 'বাচ্চা নিচ্ছেন না কেন?' 'ভাবি, শুনলাম আপনাদের নাকি ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে?'

কারও সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ না হয়ে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো করা যায় না—সেই সেন্সটাও আমাদের অনেকের নেই। অন্যের দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা ব্যক্তিগত বিষয় উদ্ধার করতে পারাটাকে আমরা বিরাট সফলতা মনে করি। এমনটা করবেন না। পারলে অন্যের দোষ ঢেকে রাখুন। অন্যের দোষ ঢেকে রাখলে আল্লাহও আপনার দোষ ঢেকে রাখবেন।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যে লোক কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।'
> (সহিহ মুসলিম : ৬৭৪৬)

অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবেন না। অনেকেই আছেন—যারা অন্যের পারিবারিক জীবন নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন। এটা ঠিক না। কারও ব্যক্তিগত চিঠি বা মোবাইলের ম্যাসেজ চুরি করে পড়বেন না। আড়ি পেতে দুজনের কথোপকথন শোনার চেষ্টা করবেন না। কারও মোবাইলের গ্যালারিতে ঢুকে তার ব্যক্তিগত ছবি দেখবেন না। কারও ফেসবুক আইডিতে ঢুঁ মেরে দেখার কৌতূহল দমন করুন। এসব অশালীন, অমার্জিত অপরাধ! Everyone has personal space & no one should interfere someone's personal world.

গিবত করা

সবশেষে আল্লাহ বলেন—'একে অন্যের গিবত করো না।' গিবত সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানে আমাদের অবস্থা এতটাই করুণ, কি আলিম সমাজ, কি সাধারণ মানুষ—সবাই এতে লিপ্ত। অফিস, বাজার কিংবা রাস্তাঘাটে গিবত বা পরনিন্দার চর্চা হয় হরহামেশা। অত্যন্ত দুঃখের কথা হলো, আল্লাহর ঘর মসজিদও এ অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের নৈতিকতার এতই অবক্ষয় হয়েছে, নামাজ শেষে মসজিদে বসেও আমরা অপর মুসল্লিকে নিয়ে গিবত চর্চা করছি! অন্যের আড়ালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি, মন্দ কথা বা দোষ চর্চা করছি। ধীরে ধীরে এগুলো আমাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের এমন গুনাহ ও পাপাচার থেকে রক্ষা করুন! এটা এতই জঘন্য ও বীভৎস কাজ—যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য সব নিঃশেষ করে দেয়।

এজন্য গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো—'গিবত কী?'

তিনি বললেন—'কারও ব্যাপারে তার অগোচরে এমন কিছু বলা, যা সে পছন্দ করে না।'

আবার বলা হলো—'তার মধ্যে যদি ওই ব্যাপারগুলো থাকে, তবুও কি গিবত হবে?'

তিনি বললেন—'যদি থাকে, তবেই তো গিবত করলে। আর যদি না থাকে, তাহলে তো তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটালে।' (জামে আত-তিরমিজি : ১৯৩৪)

আমাদের সমাজে তো এখন হালাল উপায়ে 'গিবত' প্রচলিত আছে। কেউ কেউ কথার ফাঁকে বলে ওঠে—'বললে তো গিবত হয়ে যায়, তারপরও বলি!' না, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এমনটা করা যাবে না। বললে যদি গিবত হয়, তাহলে তা কিছুতেই বলা যাবে না। ওখানেই থেমে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

একবার নবিজি সাহাবিদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দুটি কবর দেখতে পেলেন। সেদিকে ইঙ্গিত করে তাঁদের বললেন—

> 'নিঃসন্দেহে এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের কোনো কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার) কারণে শাস্তি অপরজনকে গিবত করার কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।'
> (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৪৯)

সূরা হুজুরাতের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিভিন্ন প্রকারের দোষগুলো অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামি সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তার রূপ ও আঙ্গিক, আদল ও ব্যবস্থাপনা তুলে ধরেছেন। ইসলামি সমাজ সমতার নীতি, শোষণহীন মনোভাব, মানুষের নিরাপত্তা ও আবরুর সুরক্ষায় আপসহীন হবে। মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ ও বৈষম্য তৈরি করবে না।

নিচের এই হাদিসটি যেন ইসলামি সমাজের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে। 'আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

'তোমরা কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কুচিন্তা হলো সবচেয়ে মিথ্যা কথা। কারও খারাপ বা দোষের খবর জানার চেষ্টা করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করো না। আর পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পেছনে লেগে থেকো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে।'
(সহিহ বুখারি : ৬৭২৪)

তৃতীয় অংশ (ঈমান অর্জনের ওপর)

এই সব মন্দ গুণাবলি এতটা নিপুণ ও নিখুঁতরূপে তুলে ধরার পেছনে মূল লক্ষ্য, মানুষের কাছে একটা বার্তা দেওয়া। আর তা হলো—সাধারণভাবে ভালো-মন্দ নিরূপণের যেসব মাপকাঠি (Criteria) ব্যবহৃত হয়, তা সঠিক ও যথার্থ নয়। আল্লাহ প্রদত্ত মাপকাঠিই নিপুণ ও নিখুঁত। এই কথাগুলোই পরের আয়াতে বলা হয়েছে—যাতে মানবমণ্ডলী এসব মন্দ গুণাবলি বর্জন করে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হতে পারে এবং শান্তিপূর্ণ একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেন—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপক্ষো বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।' (সূরা হুজুরাত : ১৩)

এই আয়াতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

এক. পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ম হয়েছে আদম-হাওয়া ﷺ জুটি থেকে। তাই আদমসন্তান হিসেবে আমরা সবাই সমান।

দুই. মানবসমাজে নানা বৈচিত্র্য আছে, আর তা সমাজব্যবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানুষকে একে অপরের পরিপূরক করার জন্যই। এই বৈচিত্র্য কোনোভাবেই ভালো-মন্দ নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়। কারণ, আমাদের জন্ম আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা নিজেদের ইচ্ছাধীন নই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে এই বোধ ও ধারণা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মক্কা বিজয়ের পর কাবার তাওয়াফকালে সবার উদ্দেশে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, তিনি জাহেলি দুরাচার ও অন্ধ অহমিকা দূর করেছেন। হে লোকেরা! সাধারণত সমস্ত মানুষ দুই ধরনের। প্রথমত, নেককার ও পরহেজগার; যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দ্বিতীয়ত, পাপী ও দুরাচার; যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। এ ছাড়া সমস্ত মানুষই আদমসন্তান। আর আদম তো মাটির সৃষ্টি।'
> (জামে আত-তিরমিজি : ৩৯৫৫)

তিন. সাধারণত মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মূল ভিত্তি হলো—তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা; আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মন্দ ও অকল্যাণ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা এবং কল্যাণের পথে দৃঢ় ও অবিচল থাকা। আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হওয়ার জন্য বংশমর্যাদা, পদমর্যাদা, দৈহিক অবয়ব ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেই। এগুলো গৌণ বিষয়। মুখ্য বিষয় হলো—ব্যক্তির নেক আমল, সদ্‌গুণ, সদাচার, উত্তম আচরণ, সর্বোপরি আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের অনুকরণ যার জীবনে নেই, উচ্চ বংশমর্যাদা, সুকুমার দেহাবয়ব ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও ইতর।

তাই, গরিবের ওপর ধনীর কোনো সম্মান নেই। অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার কোনো মর্যাদা নেই। সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা।

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

'ওহে মানুষ! সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয়। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের, কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি আল্লাহভীতি। তোমাদের মাঝে অত্যধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো—"আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি?" সবাই একবাক্যে বলে উঠল—"অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন—"তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়।"' (*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনে কাসির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৮ ও ৩২০-৩৪২, ই. ফা. বা.)

একটি হাদিসে নবিজি বলেন—

'তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে নিবৃত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।' (জামে আত-তিরমিজি : ৩৯৫৫)

অপর হাদিসে তিনি বলেন—

'আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহভীরু, সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।'
(সহিহ বুখারি : ৪৬৮৯)

আরও একটি হাদিসের ভাষ্য হচ্ছে—

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের বিশুদ্ধতা ও আমল দেখেন।' (মুসলিম : ২৫৬৪)

বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে বিভাজিত করেছে। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ মানবতাকে উপেক্ষা করে তাদের চারপাশে কিছু ছোটো ছোটো বৃত্ত টেনেছে।

বিভেদের উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করেছে। তৈরি করেছে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ পার্থক্য, আরব-অনারব বিভাজন, ব্রাহ্মণ আর শুদ্রের মতো উঁচু-নীচু জাতপ্রথা। ইসলাম এসে বিভেদের এই দেয়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তৈরি করেছে সাম্য, মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের সিসাঢালা প্রাচীর। যেখানে নেই কোনো ভেদাভেদ; নেই কোনো পার্থক্য। সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মানদণ্ডে। আল্লাহর চোখে সেরা, তো গোটা মানবকুলেই সেরা।

উপরিউক্ত আয়াতটি আমাদের যে সকল মৌল শিক্ষা (Core lessons) দেয়—

- ইসলামে কোনো বৈষম্য নেই (No discrimination in Islam)।
- ইসলামে তাকওয়া ছাড়া কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই (No superiority except taqwa)।
- ইসলামে মানবিক সমতা (Equality of mankind in Islam)।

শেষ পাঁচ আয়াতে ঈমানকে কেবল মৌখিক দাবিতেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং প্রকৃত ঈমান অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে—শুধু মৌখিক ঈমান যথেষ্ট নয়; বরং অন্তরে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, তবেই ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজেই তাকে বসবাস করতে হয়। মানুষের সাথেই তাকে পথ চলতে হয়। লেনদেন, আদান-প্রদান, নানা প্রয়োজন ও সমস্যা নিরসনে মানুষই মানুষের সহকর্মী, সহযোদ্ধা ও সময়-অসময়ের বন্ধু। মানুষের এই জীবনধারাকে, সামাজিক জীবনের পথচলাকে সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে মানুষকে কিছু নিয়ম ও রীতিনীতি মেনে চলতে হয়; নীতি-নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় রাখতে হয়। তবেই মানুষের জীবন সুন্দর ও ঝামেলামুক্ত হয়, সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি কিছু নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও শালীনতার কথাই এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে। এই সূরার নৈতিক শিক্ষাগুলো যদি মানুষ গ্রহণ করে, তবে জীবন হয়ে উঠবে সৌহার্দ্যময় ও সুন্দর; পথচলা হবে নির্বিঘ্ন ও বিপদমুক্ত।

নৈতিক মানোন্নয়ন, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষায় সূরা হুজুরাতের প্রতিটি গাইডলাইন একটি মাইলফলক। সূরাটি মুসলমানদের করণীয় বিভিন্ন সদাচরণের ওপর বিস্তৃত (Comprehensive) আলোচনা করেছে, যা তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত, সুসংহত ও সুরক্ষিত করে।

তাই আসুন, আমরা বেশি বেশি এই সূরাটি তিলাওয়াত করি এবং তার শিক্ষার আলোকে জীবন ও সমাজকে সাজাই।

উমর দারাজ দিল

উমর ﵁ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। সবচেয়ে সফল রাষ্ট্রনায়ক। রাসূল ﷺ-এর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তিনি নবিজির সঙ্গে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর হিদায়াতের জন্য রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। নবিজির দুআর বরকতে উমর ﵁ ইসলাম কবুল করে আলোর কাফেলায় শামিল হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ উমর ﵁ সম্পর্কে বলেন—

> 'তাঁর ইসলাম ছিল বিজয়, হিজরত ছিল সাহায্য এবং নেতৃত্ব ছিল রহমত। উমর ﵁ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমরা কাবায় নামাজ আদায় করতে পারিনি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরই আমরা কাবার চত্বরে নামাজ পড়ি।'

রাসূল ﷺ তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারুক' তথা সত্য ও মিথ্যার পৃথককারী। 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' বা দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন বিশেষ সাহাবিদের মধ্যে উমর ﵁ ছিলেন অন্যতম। তিনি ইসলামের দুর্দিনে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে পড়েছিল, তখন তিনিই বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে আবু বকর ﵁-কে খলিফা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং মুসলিম সমাজে ফিরিয়ে এনেছিলেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। তাঁর শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্য বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুবিচার ও সুশাসন। রাসূল ﷺ প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর মত ও চিন্তাকে সমর্থন করে কুরআনে ১৭-১৮টি আয়াত নাজিল হয়েছে। তিনি ছিলেন ফকিহ সাহাবিদের একজন। রাসূল ﷺ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি। এই কীর্তিমান মহান সাহাবির জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়েই আমাদের এই আলাপন।

ইসলাম গ্রহণ

উমর ﷺ মুসলিম উম্মাহর নিকট 'সুপার হিরো', আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলাম গ্রহণের আগে মোটামুটি তিনটি ঈমানি ধাক্কা বা ঈমানি ছোঁয়া তাঁর হৃদয়ে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। অদ্ভুত এক কম্পন সৃষ্টি করে। এই তিনটি ধাক্কার পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

- প্রথম ছোঁয়াটি ছিল রাসূল ﷺ-এর দুআ।
- দ্বিতীয় ছোঁয়াটি ছিল সূরা হাক্কার মাধ্যমে।
- তৃতীয় ছোঁয়াটি ছিল সূরা ত্ব-হা'র ধাক্কা।

বিশ্বনবি তাহাজ্জুদের সময় দুআ করলেন—

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ بِاَبِيْ جَهْلٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ-

'হে আল্লাহ! আবু জাহেল কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাব—এই দুজনের মধ্যে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্ত ও মজবুত করো এবং মর্যাদা দান করো।'
(জামে আত-তিরমিজি : ৩৬৮১)

রাসূল ﷺ ছিলেন অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তাশীল একজন মানুষ। তিনি বুঝতে পারলেন, মক্কায় ইসলামের দাওয়াতি কাজকে আরও বেগবান করার জন্য এই দুজনের একজনকে দরকার। কারণ, তাদের কেউ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে দাওয়াতি কাজে গতি বাড়বে। বিশ্বনবির এই দুআর একটি শুভ পরশ উমর ﷺ-এর ওপর লাগল।

কারণ, রাসূল ﷺ-এর দুআ ছিল মিসাইলের মতো। দুআর মতো দুআ করলে তা অবশ্যই তা লক্ষ্যে পৌঁছে। আল্লাহ তায়ালা উমর ফারুক ﷺ-এর জন্য নবিজির দুআটি কবুল করে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, সূরা হাক্কার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উমর ﷺ-এর মনে আরেকটি ঈমানি ধাক্কা দিলেন। ঘটনাটি ছিল এমন—একবার নবিজি মসজিদুল হারামে নামাজ পড়ছিলেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উমর ﷺ শুনতে পেলেন তিলাওয়াতের সেই সুমধুর আওয়াজ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন তিনি। নবিজি তিলাওয়াত করছেন, আর উমর ﷺ মজা পেয়ে দুলছেন। বিশ্বনবির কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত! সেটা কি আমার-আপনার মতো তিলাওয়াত? কী মধুর ছিল তাঁর তিলাওয়াত! সুবহানাল্লাহ!

উমর ﷺ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিলাওয়াত শুনছিলেন। যতই শুনছেন, ততই অবাক হচ্ছেন। কী সুন্দর শব্দের গাঁথুনি! কী প্রাঞ্জল বর্ণনা! কী চমৎকার অন্তমিল! উমর ﷺ ভাবলেন, এটা কবিতা না হয়ে পারে না।

উমর ﷺ যখন এটাকে কোনো কবিতা ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নবিজি তিলাওয়াত করলেন—

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ-

'আর এটি কোনো কবির কবিতা নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো।' (সূরা আল হাক্কাহ : ৪১)

এটা শুনে তো উমর ﷺ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না! আরে, তিনি যা ভাবছেন, মুহাম্মাদ ﷺ তো তাই তিলাওয়াত করছেন! এবার ভাবলেন—এটা হয়তো কোনো গণকের কথা হবে, যিনি মনের খবরও বলতে পারেন।

কী কো-ইনসিডেন্ট! বিশ্বনবি ﷺ দরদভরা কণ্ঠে পরের আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ-

'আর এটা কোনো গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করো।' (সূরা আল হাক্কাহ : ৪২)

উমর ﷺ আবারও অবাক হলেন। তিনি মনে মনে যা ভাবছেন, নবিজি তাই তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন। তাহলে এগুলো কার কথা? পরের আয়াতে আল্লাহ সেটার উত্তর দিলেন—

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

'এটা মহাবিশ্বের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।'
(সূরা আল হাক্কাহ : ৪৩)

এই হাক্কার ধাক্কায় উমর ﷺ-এর মনে প্রথমবারের মতো ঈমানের দক্ষিণা বাতাস লাগল। (সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৩০৫-৩০৬)

এরপর লাগে সর্বশেষ ঈমানি ধাক্কা। ডাক্তারের কাছে গেলে যেমন প্রথমে কম মাত্রার ওষুধ দেওয়া হয়। এই ওষুধে কাজ না হলে ডোজ একটু বাড়ানো হয়। এতেও কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। উমর ﷺ-এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি প্রায় এমনই ঘটছিল। আল্লাহ তায়ালার ঐশী পরিকল্পনা (Divine Plan) একটু একটু করে তাঁর হৃদয়ের অন্ধকার পর্দাটিকে সরাতে সরাতে নুরের আলোকচ্ছটায় আলোকিত করতে শুরু করেছিল।

উমর নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবি ﷺ-এর শিরচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে বের হলেন। পথে বনু জাহরা গোত্রের এক লোকের সাথে দেখা। ওই লোক জিজ্ঞেস করল—'কী উমর! কই যাওয়া হচ্ছে?'

উমর উত্তরে বললেন—'মুহাম্মাদের গলা কাটতে যাচ্ছি।'

লোকটি তাঁকে বলল—'তাঁর গলা কাটার আগে নিজের ঘর ঠিক করো। তোমার বোন তো মুসলিম হয়ে গেছে!'

এমন কথা শুনে উমর উলটো পথে হাঁটা শুরু করলেন। সোজা গিয়ে উঠলেন বোনের বাড়িতে। এদিকে উমরের বোন ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সায়িদ ﷺ কুরআন শিখছিলেন। খাব্বাব ইবনুল আরাত ﷺ ছিলেন তাঁদের শিক্ষক। উমরের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি লুকিয়ে পড়লেন। উমর ﷺ এসে দেখলেন—তাঁরা কুরআন পড়ছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বোন ও বোনজামাইকে বেধড়ক পেটালেন।

একপর্যায়ে রাগ কমে এলে উমর তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—'তোরা কী পড়ছিলি, আমায় দেখা।' ফাতিমা ﷺ বললেন—'তুমি তো অপবিত্র, এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আগে পবিত্র হয়ে এসো।'

এরপর উমর গোসল করে এলেন। অতঃপর তাঁকে কুরআনের মুসহাফটি দেওয়া হলো। মুসহাফে লেখা ছিল সূরা ত্ব-হা। উমর সূরাটি পড়তে শুরু করলেন। তিনি একটি করে আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, আর তার বিপরীতে খুলে যাচ্ছিল তাঁর হৃদয়ের একেকটি অন্ধকার পর্দা। এভাবে আস্তে আস্তে খুলে গেল তাঁর মনের সকল অর্গল। অন্তরে জ্বলে উঠল ঈমানের দীপ। তরবারি হাতে ছুটে যাওয়া খুনপিপাসু উমর প্রবেশ করলেন নতুন এক জগতে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল তাঁর হৃদয়ে। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ইসলাম গ্রহণের জন্য।

নবিজি তখন ছিলেন দারুল আরকামে। উমরকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে রাসূল ﷺ-এর চাচা হামজা ﷺ একটু চিন্তিত হলেন। কিন্তু চাচাকে অভয় দিলেন প্রিয়নবি। বললেন—'তাঁকে আসতে দাও!'

উমর ঘরে ঢুকে ঘোষণা দিলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আপনাকে সত্যনবি বলে স্বীকার করে নিলাম।' উমর ﷺ-এর এই ঘোষণা শুনে সাহাবিদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।
(সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৩০৩-৩০৫)

ইসলাম গ্রহণ করে উমর ﷺ নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'তাহলে আমরা পালিয়ে বেড়াব কেন?'

উমর ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেই চাইলেন একটি প্রকাশ্য তাওহিদের মিছিল দিতে এবং কাবা চত্বরে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে। অনেক বোঝানোর পর স্বল্প পরিসরে বিশ্বনবি অনুমোদন দিলেন। কিন্তু মিছিল যে দেবেন, লোকবল দরকার আছে না? মক্কার জমিনে কার এত সাহস যে মিছিল দেবে? এটা তো কাফির-মুশরিকদের 'প্রভাবাধীন এলাকা'!

খুঁজে পাওয়া গেল ১১ জন নওমুসলিম সাহাবি। মিছিলের এক লাইনে থাকলেন উমর ﷺ, আরেক লাইনে নবিজির চাচা হামজা ﷺ। এই ১১ জন মিলে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমরা 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার' তাকবির দিতে দিতে কাবা চত্বরের দিকে মার্চ করলেন। মিছিলের মধ্যে উমর ﷺ-কে দেখে মুশরিকদের বুক ভেঙে গেল। তারা এতটাই কষ্ট পেল, আগে কখনো এমন কষ্ট পায়নি। (তারিখে উমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনুল জাওজি : ৬-৭)

যে মিছিলের মাধ্যমে ইসলাম তাঁর আগমনবার্তা মক্কাবাসীকে জানিয়েছিল, কাবার চতুরমুখী সেই আলোর মিছিল আজও থামেনি, চলছে; কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কেউ থামাতে পারবে না। কবি আল মাহমুদ যেমনটি বলেছেন—

'আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে
আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।
কে প্রশ্ন করে আমরা কোথায় যাবো?
আমরা তো বলেছি আমাদের যাত্রা অনন্তকালের।'

ঈমানের এই মিছিল সমানে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একজন উমর আমরা চাই। এর বেশি লাগবে না। একজন উমরের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে বাংলাদেশ তথা গোটা মুসলিম উম্মাহ। কবি আসাদ বিন হাফিজের কথামালায়—

'দাও খোদা দাও আমায় আবার
উমর দারাজ দিল।
দাও আলির মতো বীর সেনানী
জাগাতে এই নিখিল!'

আজ আমরা নেতৃত্বশূন্য দিশেহারা এক হতভাগ্য জাতিতে পরিণত হয়েছি। মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব নেই। শত্রুদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছি আমরা। অনেকটা ফুটবলের মতোই দশা আমাদের; মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গড়াগড়ি খাচ্ছি। আমাদের হয়ে কথা বলার মতো যোগ্য প্রতিনিধি যেন গোটা বিশ্বে একজনও নেই। আমরা যেন অভিভাবকহীন এক ইয়াতিম সম্প্রদায়। উম্মাহর এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমরা সেই উমর ফারুক ﷺ-এর মতো সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অপেক্ষায়।

উমর ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব

নবিজি বলেন—لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ 'লা নাবিইয়্যা বা'দি।' আমার পরে আর কোনো নবি নেই। মুসলিম হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর এই বাণীকে বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিশ্বাস করতে হবে তিনিই শেষ নবি এবং শেষ রাসূল; তাঁর পরে কোনো নবি নেই! কারণ, পবিত্র কুরআনুল কারিমও আমাদের জানিয়েছে, তিনি হচ্ছেন 'খতামুন নাবিয়্যিন' তথা শেষ নবি। (সূরা আল আহজাব : ৪০)

কেউ যদি তাঁকে শেষ নবি হিসেবে না মানে, তবে সে কুরআন অস্বীকার করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়ার তাঁর কোনো অধিকার থাকবে না।

'কাদিয়ানী' নামক একটি সম্প্রদায় আছে, এরা কি মুসলিম? নিঃসন্দেহে এরা অমুসলিম। মুসলিম জাতির সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা যদি মুসলিম হতে চায়, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ নবি মানতে হবে এবং এই ঘোষণা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়ে দিতে হবে গোটা বিশ্বকে। তবেই এদের আমরা মুসলিম বলে মেনে নিতে পারব। তা না হলে তারা কোন ধর্মের– সেটাও তাদের জানিয়ে দিতে হবে। এখানে কোনো হীনম্মন্যতা (Inferiority Complex or Identity crisis) রেখে মুসলিম পরিচয় ধারণ করা সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষনবি মানবেন না, আবার নিজেদের মুসলিম বলেও দাবি করবেন—এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'আমার পরে যদি কেউ নবি হতো, সে হতো উমর।'
> (জামে আত-তিরমিজি : ৩৬৮৬)

নবিজির এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়—উমরে ফারুক ﷺ-এর যোগ্যতা ও মর্যাদা কত উচ্চ পর্যায়ের ছিল! রাসূল ﷺ-এর উত্তরসূরি হওয়ার সার্বিক যোগ্যতা তাঁর মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে বিদ্যমান! রাসূল ﷺ কাটিয়েছিলেন আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার। আর আধুনিক জাহেলিয়াতের অন্ধকার অমানিশা ভেদ করে হেরার আলোয় উদ্ভাসিত এক কল্যাণময় সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য এ রকম একজন উমর বড্ড দরকার! গীতিকার আবুল আলা মাসুমের ভাষায় বলতে হয়—

> 'প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না
> বলোনি দেবে না উমর,
> বলোনি দেবে না হামজা-তারিক
> খালিদ বিজয়ী সমর।'

সম্পর্কের দিক থেকে উমর ﷺ ছিলেন নবিজির শ্বশুর। ইসলামের চার খলিফার দুজন ছিলেন বিশ্বনবি ﷺ-এর মেয়ের জামাই, আর বাকি দুই খলিফা ছিলেন বিশ্বনবি ﷺ-এর শ্বশুর। সাইয়্যিদুনা আলি ও উসমান ﷺ বিশ্বনবির মেয়ের জামাই। অন্যদিকে আবু বকর ও উমর ﷺ ছিলেন প্রিয়নবির শ্বশুর।

উমর ফারুক ﵁ কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আল্লাহ জ্ঞানও দিয়েছিলেন, দ্বীনদারিও দিয়েছিলেন। তাই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন অর্ধ পৃথিবী! বর্তমানেও যে আলিমের মধ্যে জ্ঞান আছে আবার দ্বীনদারিও আছে, সেই আলিম গোটা বিশ্বকে জয় করে নিতে পারবে।

নবিজি সাহাবিদের মাঝে একটি স্বপ্নের বর্ণনা করছেন—

> '(স্বপ্নে) আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসা হলো। আমি তা পান করলাম। এমনকী আমার মনে হতে লাগল, সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম।'
>
> সাহাবিরা বললেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করুন।'
>
> তিনি বলেন—'তা হলো ইলম।' (সহিহ বুখারি : ৮২)

নবিজি এই দুধের ব্যাখ্যা করেন জ্ঞান। অর্থাৎ উমর ﵁-কে দুধের পেয়ালা দেওয়া মানে হলো—আল্লাহ তাঁকে দ্বীনের পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করেছেন।

উমর ﵁-কে নিয়ে বিশ্বনবি আরেকটা স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন—

> 'একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। সবার গায়ে জামা জড়ানো। কারও জামা এতটা ছোটো, কোনোভাবে বুক পর্যন্ত ঢাকতে পেরেছে। আবার কারও কারও জামা এর চেয়েও ছোটো। একপর্যায়ে উমর ﵁-কে আমার সামনে আনা হলো। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল, চলার সময় তাঁর জামা অনেকটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।'
>
> সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?'
>
> বিশ্বনবি বললেন—'তাকওয়া তথা দ্বীনদারি।'
> (সহিহ বুখারি : ৩৬৯১)

এই স্বপ্নে যার জামা যত লম্বা দেখানো হয়েছে, তাঁর দ্বীনদারি বা আল্লাহভীতি তত বেশি—এটা বোঝানো হয়েছে। উমর ﵁-এর যেমন গভীর জ্ঞান ছিল, তেমনি ছিল প্রবল দ্বীনদারি। এই দুটি গুণ কারও থাকলে তার কি অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে?

রাসূল ﷺ বলেন—পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মাঝে অনেক 'মুহাদ্দাস' ছিল। আমার উম্মতের মুহাদ্দাস হলো উমর ইবনে খাত্তাব। মুহাদ্দাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—মুহাদ্দাস হলো যে ব্যক্তিকে ফেরেশতা কথা শেখান। আবার কেউ কেউ বলেন—যে ব্যক্তি কোনো প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে না, তিনি মুহাদ্দাস। আবার কারও কারও মত হলো—যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রত্যাদেশ পান। উমর ﷺ হলেন এই উম্মাহর তেমনই একজন নকিব।

> 'আমর ইবনুল আস একবার রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে?' রাসূল ﷺ বলেন—'আয়িশা।' আমর ﷺ বললেন—'পুরুষদের মাঝে কে?' রাসূল ﷺ বললেন—'তাঁর পিতা আবু বকর।' আমর ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তারপর?' রাসূল ﷺ বললেন—'উমর।'
> (সহিহ বুখারি : ৩৬৬২)

আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'আমি একবার রাসূল ﷺ-এর সাথে একটা খেজুর বাগানে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর এক লোক এসে দরজার ওপার থেকে অনুমতি চাইল। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন—"আগন্তুকের জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" দরজা খুলে দেখলাম, আবু বকর ﷺ। আমি তাঁকে রাসূলের বক্তব্য শুনিয়ে দিলাম। তা শুনে আবু বকর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর অন্য একজন লোক এসে অনুমতি চাইলেন। রাসূল ﷺ এবারও বললেন—"দরজা খোলো এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" দরজা খুলে দেখলাম, উমর ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে নবিজির সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম। সুসংবাদ শুনে উমর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আরও একজন লোক এলেন। রাসূল ﷺ বললেন—"দরজা খোলো এবং তাঁকে বলবে, তাঁর ওপর একটা বিপদ আসবে এবং তার বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" আমি যথারীতি দরজা খুলতে গেলাম। দেখি, উসমান ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে রাসূলের সুসংবাদ শোনালাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন—"আল্লাহই সাহায্যকারী।"' (মুত্তাফাকুন আলাইহি : ৩৯২৮)

মদিনার সবচেয়ে বড়ো মুনাফিক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে মুনাফিক হলেও তার ছেলে আবদুল্লাহ ছিলেন পাক্কা ঈমানদার। বাবার মৃত্যুর পর তিনি নবিজিকে বাবার জানাজা পড়ানোর অনুরোধ করলেন। নবিজি যাওয়ার উপক্রম হলেন, কিন্তু উমর ﷺ বাধা দিয়ে বসলেন। নবিজি উমর ﷺ-এর বাধাকে পাশ কাটিয়ে জানাজায় উপস্থিত হলেন। এরপর আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করলেন—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ-

'(হে নবি!) তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্য হতে কেউ মারা গেলে তুমি তার (জানাজার) নামাজ পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেও না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তারা পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে।' (সূরা তাওবা : ৮৪)

উমর ﷺ-এর তাকওয়া ও খোদাভীতি

বিশ্বনবি একজন সাহাবির কাছে মুনাফিকদের তালিকা রাখতেন। তিনি হলেন হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ। উমর ﷺ হুজাইফা ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—'আমার নামটা কি মুনাফিকদের তালিকায় আছে?' হুজাইফা ﷺ বললেন—'না, আপনার নাম নেই।' এখান থেকেই বোঝা যায় তাঁর তাকওয়ার গভীরতা! জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও তিনি আত্মতুষ্টিতে ভোগেননি। খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, অজান্তে মুনাফিকের তালিকায় নাম উঠে গেল কি না! (তারিখ আল হিজরাতাইন, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, পৃষ্ঠা : ৬০৪)

দুনিয়ায় জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও উমর ﷺ-এর যদি এই ভয় থাকে, তাহলে আমাদেরও কি এই ভয় থাকা উচিত নয়? এজন্য আমাদেরও আল্লাহর কাছে এই বলে সব সময় দুআ করতে হবে—

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নিফাকি থেকে বাঁচান, শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ঈমানের অধিকারী করুন।'

উমর ﵁ বলতেন—

> 'তোমরা অত্যধিক জাহান্নামের আলোচনা করো। কারণ, তার তাপ অতি তীব্র, তার তলানি অতি গভীর এবং তার হাতুড়ি শক্ত লোহার।'

উমর ﵁ আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন। তিনি সর্বদা নিজের কাজের কঠিন সমালোচনা ও নির্মোহ বিচার করতেন। যদি কারও ওপর জুলুম করেছেন বলে মনে হতো, তবে সাথে সাথে সেই ব্যক্তিকে ডেকে নিজের থেকে 'কিসাস' নিতে বলতেন।

তিনি মানুষকে বলতেন—

> 'তোমরা বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজের বিচার নিজে করো। তোমাদের ভালো কর্ম পাল্লায় উঠার আগে নিজে তার মাপজোখ করে নাও এবং সবচেয়ে ভালো উপস্থাপনের (কিয়ামতের) প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'

আলি ﵁ বলেন—

> 'আমি একবার উমর ﵁-কে দেখলাম, তিনি দৌড়াচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমিরুল মুমিনিন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" উমর ﵁ বললেন—"সাদাকার একটা উট পালিয়ে গেছে, তাকে ধরতে যাচ্ছি।" আমি বললাম—"আপনি পরবর্তী খলিফাদের অক্ষম করে দিলেন।" উমর বললেন—"আবুল হাসান, আমাকে গালমন্দ করো না। ফোরাত নদীর তীরেও যদি উটের একটা রশি হারিয়ে যায়, তার জন্যও আমাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।"' (সহিহ বুখারি, মানাক্বিবু উমর)

উমর ﵁ একবার অসুস্থ হলেন। ডাক্তাররা তাঁকে মধু খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তখন বাইতুলমালে অনেক মধু ছিল—যা বিভিন্ন বিজিত অঞ্চল থেকে আগত। কিন্তু উমর তা গ্রহণ করলেন না; বরং সমস্ত মানুষকে ডাকলেন। মিম্বারে উঠে আগত মানুষের কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন—'যদি আপনারা অনুমতি দেন, তাহলেই মধু আমার জন্য হালাল; অন্যথায় তা ভক্ষণ করা আমার জন্য হারাম।' এ কথা শুনে মানুষজন কান্না শুরু করে দিলো। সবাই একবাক্যে অনুমতি দিয়ে বলতে লাগলেন—'আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ আপনাকে ভরপুর কল্যাণ দান করুন। পরবর্তী খলিফাদের আপনি অক্ষম করে দিলেন!'

এমনই ছিল উমর ফারুক ﵁-এর তাকওয়া ও খোদাভীতির মাত্রা।

উমর ﵁-এর 'ফিরাসাহ' বা দিব্যদৃষ্টি

একবার উমর ﵁ মসজিদে নববিতে জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হুট করে বলে উঠলেন—'ইয়া সারিয়াতাল জাবাল' অর্থাৎ 'হে সারিয়া! পাহাড় অভিমুখে ছোটো।' এই কথা তাঁর বক্তব্যের আগের বাক্যের সাথেও মিল নেই, পরের বাক্যের সাথেও মিল নেই। নামাজের পর সবাই জিজ্ঞেস করলেন—'আমিরুল মুমিনিন! হুট করে কেন আপনি এই কথাটি বললেন?'

উমর ﵁ বললেন—'খুতবা দেওয়ার সময় দেখলাম, মুসলিম বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। মুসলিম বাহিনীর ডানে পাহাড়, বামে উপত্যকা। তাঁরা পাহাড়ের দিকে না গিয়ে উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলো; অথচ ওদিকে শত্রুরা ওত পেতে আছে। তাই তাঁদের সাবধান করতে বললাম—উপত্যকার দিকে নয়; পাহাড়ের দিকে যাও।' এ কথা শুনে অনেকেই অবাক হলেন। উমর ﵁ আছেন মদিনায়। মদিনায় থেকে কীভাবে পারস্যে নির্দেশ করছেন? তখনকার সময়ে তো মোবাইল ছিল না, ছিল না আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা। তিনি কীভাবে এ কথা বললেন?

কিছুদিন পর ওই বাহিনী মদিনায় ফিরে এলো। কয়েকজন তাঁদের জিজ্ঞেস করল—'অমুক দিন কি আপনারা এমন কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন?' তাঁরা বললেন—'হ্যাঁ, আমরা আমিরুল মুমিনিনের আওয়াজ শুনেছিলাম। এর ফলে আল্লাহর রহমতে আমরা শত্রুর হাতে কচুকাটা হওয়া থেকে বেঁচে গেছি।' (*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩৫ পৃষ্ঠা)

উমর ﵁-এর ব্যক্তিত্ব

উমর ﵁ এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনি যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, শয়তান সেই রাস্তার আশেপাশেও থাকত না। মদিনার মুনাফিকরা তাঁকে যমের মতো ভয় পেত।

বাচ্চারা রাতে খেতে না চাইলে আমরা তাদের বিড়াল, কুকুর, বাঘ অথবা ভূতের ভয় দেখাই। আর মদিনার মায়েরা বাচ্চাদের ভয় দেখাতে বলত—'খাও খাও, ওই যে উমর আসছেন, উমর!'

উমর ﵁ ছিলেন রাশভারী প্রকৃতির মানুষ; প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁ বর্ণনা করেন—

'একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে কিছু মহিলা কথা বলছিল। তাদের গলার স্বর ছিল বেশ চড়া। এমন সময় উমর ﷺ রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উমর ﷺ-এর আওয়াজ শুনেই মহিলারা ঘাবড়ে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। নবিজি উমর ﷺ-কে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। উমর ﷺ ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, রাসূল ﷺ হাসছেন। রাসূলের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে তিনি বললেন—"আল্লাহ আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুক।" রাসূল ﷺ বললেন—"আমি এই মহিলাদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তারা আমার এখানে ছিল। যেই তোমার গলার আওয়াজ শুনল, অমনি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।" উমর ﷺ বললেন—"তাদের ভয়ের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি।" তারপর মহিলাদের লক্ষ করে বললেন—"তোমরা আমাকে ভয় করো, অথচ রাসূল ﷺ-কে ভয় পাও না?" তারা বলল—"হ্যাঁ। কারণ, আপনি নবিজির চেয়ে কঠোর ও রূঢ়ভাষী।" তখন রাসূল ﷺ বললেন—"হে খাত্তাবের ছেলে! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তান তোমায় কোনো গলিতে দেখলে সে ওই গলি ত্যাগ করে অন্য গলিতে ঢুকে পড়ে।"' (সহিহ বুখারি, মানাক্বিবু উমর : পৃষ্ঠা-৫৭)

এটাই উমর ﷺ-এর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব! আমরা এমনই এক উমরের প্রতীক্ষায় আছি, যার ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দেখে বিশ্ববাসী বলে উঠবে—মারহাবা! মারহাবা!

আবু বকর ﷺ-এর সময় কুরআন সংকলনের কাজ শুরু হয়। উমর ﷺ এগিয়ে এলেন; প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে কাজ এগিয়ে নিলেন। ৭০ জন হাফেজে কুরআনের শাহাদাতের কারণে আবু বকর ﷺ কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উমর ﷺ পরামর্শ দিলেন—'তাহলে আপনি কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নিন।'

আবু বকর ﷺ বললেন—'এটা তো নবিজি করেননি, আমি কী করে করব?'

উমর ﷺ যুক্তি দেখালেন—'এটা করলে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু হবে না।'

অবশেষে উমর ফারুক ﷺ-এর পরামর্শ শুনে আবু বকর ﷺ কুরআন সংকলনে রাজি হলেন।

এই যে আমরা হিজরি সনের হিসাব করে থাকি, এটিরও প্রবর্তন করেন উমর ﵁। নবিজির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকে স্মৃতিময় করে রাখতে তাঁর খিলাফতের সময়কাল থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন হয়।

উমর ﵁-এর অভিমতের সমর্থনে আয়াত

উমরে ফারুক ﵁-এর চিন্তাধারা এবং অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে স্বয়ং আরশের অধিপতি অনেকগুলো কুরআনের আয়াত নাজিল করেছেন।

উমরে ফারুক ﵁ অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন যে, মাকামে ইবরাহিমকে যদি নামাজের বিশেষ স্থান বানানো হতো! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করলেন—

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى-

'মাকামে ইবরাহিমকে তথা ইবরাহিম যেখানে ইবাদত করার জন্য দাঁড়ায়, সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাজের স্থানে পরিণত করো।'
(সূরা বাকারা : ১২৫)

একদিন তিনি বিশ্বনবিকে বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দরবারে কত ধরনের লোকজন আসে—তার হিসাব নেই। তাদের কেউ ভালো, কেউ মন্দ। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের হিজাবের আদেশ করতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো!' পরক্ষণেই তাঁর অভিমতের সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা হিজাবের আয়াত নাজিল করলেন।

মদের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় উমর ফারুক ﵁ আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করছিলেন এবং মনে মনে চাচ্ছিলেন, মদকে যদি চিরতরে হারাম ঘোষণা করে কোনো আয়াত নাজিল হতো! আল্লাহ তায়ালা তা-ই করলেন। মদকে হারাম ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাজিল করলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ—এগুলো হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানি কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো; আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।'
(সূরা মায়েদা : ৯০)

এভাবে তাঁর চিন্তাধারা, অভিমত বা আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন জানিয়ে কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে।

সংস্কারকর্ম

উমর ﵁ মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে বেশ কিছু প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। নতুন বিজিত অঞ্চলে তিনি প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো গঠন করেন—যাতে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, আমলাতন্ত্র ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা ছিল। পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যকে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে উমর ﵁ প্রদেশগুলোকে অনেকগুলো জেলায় ভাগ করেন। প্রদেশগুলোর শাসক ছিলেন তাঁরই নিয়োগকৃত একেকজন গভর্নর বা 'ওয়ালি'। তাঁর শাসনামলে বসরা ও কুফা শহরদ্বয় নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। আবু বকর ﵁-এর সময় সংঘটিত 'রিদ্দা'র যুদ্ধ থেকে পাওয়া হাজারো বেদুইন যুদ্ধবন্দিকে তিনি সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি দেন। এতে বেদুইন গোত্রগুলোর মাঝে উমর ﵁-এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়।

স্টেট গভর্নমেন্ট, জেলখানা, সচিবালয়, রাষ্ট্রীয় ভাতার শ্রেণিবিন্যাসের প্রবর্তন করেন উমর ﵁। আবু বকর ﵁-এর খিলাফতের সময়কালে মদিনার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তিনি। প্রায় রাতেই সিভিল ড্রেসে জনগণের খোঁজখবর নিতেন। তাঁর শাসনামলে স্বতন্ত্র ইসলামিক কারেন্সি চালু করেন। হেজাজ থেকে চিরতরে ষড়যন্ত্রকারী ইহুদিদের উৎখাত করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের জন্য বিশেষ রাষ্ট্রীয় ভাতা চালু করেন। সৈনিকদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তাদের প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর এক মাসের ছুটির ব্যবস্থা করেন উমর ﵁। এই যে রমজানে আমরা বিশ রাকাত সালাতুত-তারাবিহ পড়ি, এর সামাজিক প্রচলনও করেন তিনি। কুরআনবিশারদদের মতে, কুরআনের এমন ২২টি আয়াত আছে—যেগুলো আল্লাহ তায়ালা উমর ﵁-এর মতের পক্ষে নাজিল করেছেন।

আত্মীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান

উমর ﵁ সততা, নিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন। স্বজনপ্রীতি শব্দটি তাঁর ডিকশনারিতে ছিল না। দিনে যে আইন প্রণয়ন করেছেন, রাতে ঘরে ফিরেই সেই আইনের প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য শাসকের মতো দেশবাসী, গ্রামবাসীর বিচার করে নিজের বেলায় বিচারের কথা ভুলে যাননি। সবার জন্য যে নিয়ম, নিজের ঘরেও সেই নিয়ম বাস্তবায়ন করতেন।

তিনি নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করলে প্রথমে তা ঘরে বাস্তবায়ন করতেন। পরিবার-পরিজনকে বলতেন—

> 'আমি মানুষকে এমন এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছি, সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবে! ক্ষুধার্ত পাখি যেভাবে মাংসের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনই মানুষও তোমাদের দিকে চেয়ে থাকবে। তোমরা যদি আইন লঙ্ঘন করো, তারাও করবে; তোমরা যদি আইন মেনে চলো, তারাও চলবে। আল্লাহর কসম! যদি আমার কোনো আত্মীয়স্বজন আইন লঙ্ঘন করে, তাহলে তার সাথে আমার সম্পর্কের কারণে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো।'

তিনি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বলেন—

> 'আমি জুলাওলাতে (পারস্যে সংগঠিত একটা যুদ্ধ) অংশগ্রহণ করলাম। (বিজয়ের পর) চল্লিশ হাজার মুদ্রা দিয়ে কিছু গনিমতের মাল ক্রয় করলাম। যখন উমর ﵁-এর কাছে এলাম, তিনি বললেন—"আচ্ছা, আমাকে যদি আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হয়, আর তোমাকে বলা হয় কিছু বিনিময় দিয়ে আমাকে মুক্ত করতে, তাহলে কি আমাকে মুক্ত করবে না?" আমি বললাম—"আল্লাহর কসম! আপনাকে কষ্ট দেবে এমন যেকোনো কিছু থেকে মুক্তির জন্য আমি মুক্তিপণ দেবো।" এবার তিনি বললেন—"আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, মানুষ কেনাবেচা করছে। তারা বলছে—আবদুল্লাহ ইবনে উমর আল্লাহর রাসূলের সাহাবি আমিরুল মুমিনিনের ছেলে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয়ভাজন! তুমি সত্যিই তেমন। সুতরাং তারা তোমার মায়ায় পড়ে তোমার কাছে চড়া দামে বিক্রি না করে সস্তায় বিক্রি করেছে। তুমি তো জানো, এই মালামালগুলোর দায়িত্ব আমার ওপর এবং আমিই এগুলোর বণ্টনকারী। (তুমি তোমার ক্রয়কৃত মালামালগুলো ফেরত দাও) আমি তোমাকে কুরাইশের ব্যবসায়ীরা যা লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশি দেবো।" তারপর তিনি ব্যবসায়ীদের ডাকলেন। তারা তাঁর কাছ থেকে চার লাখ দিরহাম দিয়ে তা কিনে নিল। তিনি আমাকে আশি হাজার দিরহাম দিলেন আর বাকি মুদ্রা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁-এর কাছে মানুষের মাঝে বণ্টনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।' (সহিহ বুখারি, মানাক্বিবু উমর : ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠা)

উমর ﵁ তাঁর পরিবারের সদস্যদের জনগণের জন্য বরাদ্দ সম্পদ থেকে উপকৃত হতে দিতেন না—পাছে স্বজনপ্রীতি হয়ে যায় ভেবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বলেন—

> 'আমি একটা উট কিনলাম এবং চারণভূমিতে কিছুদিন চরাতে দিলাম। যখন তা মোটাতাজা হলো, তখন তা বাজারে তুললাম। উমর ﵁ বাজারে গিয়ে আমার উট দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"এই উট কার?" লোকে বলল—"আবদুল্লাহ ইবনে উমরের।" এবার তিনি বললেন—"বেশ বেশ, আমিরুল মুমিনিনের ছেলে!" আমাকে বললেন—"এই উট কোথায় পেলে?" বললাম—"কিনেছি, তারপর জনগণের চারণভূমিতে পাঠিয়েছি। সবার যা উদ্দেশ্য থাকে, আমারও তা-ই।" তিনি বললেন—"তারা তো বলবে, ভালো করে চরাও। আমিরুল মুমিনিনের ছেলের উট। সময়মতো পানি খাওয়াবে। হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! তোমার মূলধন নিয়ে বাকি লভ্যাংশ বাইতুলমালে জমা দাও।"'
> (সহিহ বুখারি, মানাক্বিবু উমর : ১৫৮ পৃষ্ঠা)

আসলামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'উমর ﵁-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ এক সৈন্যদলের সাথে ইরাকে গেলেন। পথিমধ্যে আবু মুসা আশআরি ﵁-এর বাড়ি। উমরের পুত্রদ্বয় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আবু মুসা আসআরি ﵁ তখন বসরার গভর্নর। তিনি তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন—"তোমাদের উপকারে আসবে, এমন কোনো কাজ কি আমি করতে পারি?" তাঁরা বললেন—"অবশ্যই করতে পারেন।" তিনি বললেন—"এখানে কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ আছে। আমি তা আমিরুল মুমিনিনের কাছে পাঠাব। তোমরা যদি চাও, এগুলো তোমাদের ঋণ দিতে পারি। তা দিয়ে তোমরা ইরাক থেকে পণ্য কিনে মদিনায় নিয়ে বিক্রি করতে পারো। পরে মূলধনটা আমিরুল মুমিনিনকে দিলেই হবে। আর লাভটা তোমাদের।" তাঁরা এতে রাজি হলেন এবং প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলেন। আবু মুসা আশআরি ﵁ আমিরুল মুমিনিনের কাছে একটি চিঠি লিখে দিলেন, যেন তিনি তাঁদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বুঝে নেন।
>
> তাঁরা যথারীতি মদিনায় ফিরে এলেন। উমর ﵁-এর সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, আবু মুসা কি সৈন্যবাহিনীর সবাইকে ঋণ দিয়েছে?" উভয়ে জবাব দিলেন—"না।"

উমর ﵁ বললেন—"তাহলে মূলধন এবং লাভ সবই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দাও।" এই কথা শুনে আবদুল্লাহ চুপ করে থাকলেন। উবাইদুল্লাহ বললেন—"আমিরুল মুমিনিন! আপনার এমন করাটা উচিত নয়। এই সম্পদ যদি নষ্ট হতো কিংবা কমে যেত, তাহলে আমরা তা পুষিয়ে দিতাম।" উমর আবারও বললেন—"তোমরা সম্পদ জমা দাও।" এবারও আবদুল্লাহ চুপ। মুখে টু শব্দটি করলেন না, কিন্তু ওবাইদুল্লাহ আবারও আপত্তি জানালেন। এবার উমর ﵁-এর সভাসদের কেউ কেউ কথা বলে উঠলেন—"আমিরুল মুমিনিন! আপনি যদি তা অংশদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন, তবে উভয়কুল রক্ষা হয়। লাভের অর্ধেক তাঁদের, অর্ধেক রাষ্ট্রের।" উমর ﵁ এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। অর্ধেক লভ্যাংশ তাঁদের দিলেন আর বাকি অর্ধেক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করলেন।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৫১৪ পৃষ্ঠা)

এই ছিল উমর ﵁-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের চিত্র, ইতিহাসের পাতায় যার দ্বিতীয় নজির নেই।

উমর ﵁ মানুষের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার ভিত্তিতে। একবার উসামা ইবনে জায়েদ ﵁-কে চার হাজার দিরহাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁-কে তিন হাজার দিরহাম দিলেন। এতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বললেন—'বাবা! আপনি উসামাকে চার হাজার দিলেন, অথচ আমাকে দিয়েছেন তিন হাজার। তাঁর পিতার এমন কোনো গুণ ছিল না—যা আপনার মধ্যে নেই এবং তাঁর মধ্যেও এমন কোনো গুণ নেই—যা আমার মধ্যে নেই। তাহলে কেন এই বৈষম্য?' উমর ﵁ বললেন—'তাঁর পিতা ছিল রাসূলের কাছে তোমার পিতার চেয়ে প্রিয়, আর সে-ও তোমার চেয়ে রাসূলের অধিক প্রিয় ছিল।' (ক্বাল আজির, মানাক্বিবু উমর : ১৪৬ পৃষ্ঠা)

একবার উমর ﵁-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু 'মেসক' ও 'আম্বর' সুগন্ধি এলো। তিনি বললেন—'হায়! যদি এমন কোনো উত্তম মহিলা পেতাম, যে আমার জন্য এই সুগন্ধিগুলো উত্তমরূপে মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেবে!' তখন তাঁর স্ত্রী আতিকা ﵁ বললেন—'আমি উত্তমরূপে ওজন করতে পারি। আমাকে দিন, আমি ওজন করে দিই।' উমর ﵁ বললেন—'না'। আতিকা ﵁ জিজ্ঞেস করলেন—'কেন?' উমর ﵁ বললেন—'আমার ভয় হয়, তুমি এভাবে নেবে। তারপর ঘাঁড়ে লাগাবে।' এ কথা বলে উমর ﵁ তাঁর দুই আঙুল কানের দুই ছিদ্রের মাঝে ঢুকিয়ে দেখালেন। এই ছিল উমর ﵁-এর তাকওয়া ও খোদাভীতির নমুনা। (সহিহ বুখারি : মানাক্বিবু উমর)

সালাবা ইবনে আবি মালিক ﵁ বলেন—

> 'উমর ﵁ মদিনার মহিলাদের মাঝে কিছু কাপড় বিতরণ করলেন। বিতরণ শেষে দেখা গেল, একটা কাপড় অতিরিক্ত রয়ে গেছে। তখন কেউ কেউ বলল—"অতিরিক্ত কাপড়টি রাসূলের নাতনি আপনার স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলিকে দিন।" তখন উমর ﵁ বললেন—"উম্মে সুলাইত তাঁর চেয়ে বেশি উপযুক্ত।" উম্মে সুলাইত ছিলেন আনসারি মহিলা। তিনি রাসূলের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। উমর ﵁ বলেন—"উম্মে সুলাইত উহুদের দিন আমাদের পানির পাত্র এগিয়ে দিয়েছেন।"' (সহিহ বুখারি : ২৮৮১)

উমর ﵁ তাঁর স্ত্রীদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাক গলাতে দিতেন না। একবার উমর ﵁ কয়েকজন গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র লিখলেন। এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি তাঁদের ওপর রেগে গেলেন কেন?' তখন উমর ﵁ চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন—'দূর হও! তোমাকে এখানে নাক গলাতে কে বলেছে?'

একবার উমর ﵁-এর কাছে তাঁর মেয়ের জামাই এলেন। তিনি উমর ﵁-এর কাছে বাইতুলমাল থেকে কিছু সম্পদ চাইলেন। উমর ﵁ তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন—'তুমি কি চাও আমি আল্লাহর কাছে একজন দুর্নীতিপরায়ণ বাদশাহ হিসেবে উপস্থিত হই?'

এমনই ছিলেন উমর ﵁। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে কঠোর আচরণ করেছেন তিনি। কাউকে চুল পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় তো দেনইনি; বরং তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকেও কম দিয়েছেন, যেন কেউ কোনো কথা বলার সুযোগ না পান। জনগণের সম্পদ ও অধিকারের ব্যাপারে এমনই স্বচ্ছ ও আমানতদার ছিলেন তিনি।

উমর ﵁-এর ন্যায়পরায়ণতার চিত্র

মিশরের ঘটনা। আমর ইবনুল আস ﵁ তখন মিশরের গভর্নর। আর উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ ছিলেন সমগ্র বিশ্বজাহানের খলিফা। আমর ইবনুল আস ﵁ একটা মসজিদের আয়তন বিস্তার করলেন। আয়তন বাড়াতে গিয়ে এক কিবতির ঘর ভেঙে ফেলা হলো; অথচ তাকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ বা ভিন্ন কোনো ঘর দেওয়া হলো না। ভুক্তভোগী ব্যাপারটা আমর ইবনুল আস ﵁-এর কাছে

উত্থাপন করতে ভয় পেলেন। লোকেরা তাকে পরামর্শ দিলো খলিফার কাছে যেতে। ফলে দুই মাসের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লোকটি মদিনায় উমর ﵁-এর কাছে এলেন। এসে দেখলেন, উমর ﵁ যথারীতি খেজুর গাছের নিচে বসে আছেন। তিনি খলিফার কাছে ব্যাপারটা খুলে বললেন। উমর ﵁ সব শুনে আমর ইবনুল আস ﵁-এর কাছে একটা চিঠি লিখলেন—

> 'বিল আদলি নাহইয়া—সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমেই আমাদের উত্থান হবে, আমরা জেগে উঠব।'

লোকটা বাক্যটার মর্ম বুঝতে পারল না। তিনি পত্র নিয়ে যখন মিশরে পৌঁছলেন, তখন জুমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমর ইবনুল আস ﵁ মিম্বারে দাঁড়িয়েছেন। লোকটা মসজিদের বাইরে থেকে আমর ইবনুল আস ﵁-কে ডেকে বললেন—'আপনার জন্য আমিরুল মুমিনিনের একটা পত্র আছে।' আমর ﵁ তাকে ডেকে পত্রটি পাঠ করলেন। তারপর বললেন—'তুমি কি তোমার অধিকার এখন নেবে, নাকি নামাজের শেষ পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দেবে।' লোকটা বলল—'নামাজের শেষে দিলেই হবে।'

তারপর লোকটা নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। অতঃপর আমর ইবনুল আস ﵁ তার কাছে এলে লোকটা বলল—'এখন অধিকার ফিরে পাওয়ার চেয়ে এই বাক্যটির মর্ম বোঝাই আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।' আমর ইবনুল আস ﵁ বললেন—'জাহেলি যুগে আমরা ঘোড়ার ব্যাবসা করতাম। একবার আমি ও উমর ﵁ পারস্যে গেলাম ব্যাবসা করতে। কিন্তু পারস্যের বাদশাহর ছেলে আমাদের ধোঁকা দিলো। সে আমাদের ঘোড়া নিয়ে বিনিময় দিলো না। তখন আমরা কিসরার দরবারে অভিযোগ করতে গেলাম। কিন্তু দোভাষী আমাদের কথা বলল না। সে বাদশাহকে বলল—"আমরা কবি। তার কাছে কিছু উপহার চাই।" বাদশাহ আমাদের পাওনার অধিক দিলেন। পরের দিন আমরা আবার গেলাম। তখন দোভাষী ছিল অন্য একজন। সে প্রকৃত ঘটনা বাদশাহকে খুলে বলল। বাদশাহ তখন আমাদের বলল—"আজ রাতে আমার আতিথ্যে অবস্থান করুন। আগামীকাল ভিন্ন দরজা দিয়ে বের হবেন।" পরের দিন ভিন্ন দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে দেখি, বাদশাহর সন্তানের লাশ ঝুলছে। এই ছিল তার শাস্তি। সেখানে উক্ত বাক্যটা লেখা ছিল। আর পারস্যের বাদশাহর ন্যায়পরায়ণতা কি মুসলিমদের চেয়ে বেশি?' এই কথা বলে আমর ইবনুল আস ﵁ লোকটির হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটি সুপরিসর বড়ো ঘর ক্ষতিপূরণ দিলেন। (সহিহ বুখারি : মানাক্বিবু উমর)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বলেন—

> 'আমার ভাই আব্দুর রহমান (উমর ﵁-এর ছেলে) মিশরে শরাব পান করে মাতলামি অনুভব করল। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন আমর ইবনুল আস ﵁। আব্দুর রহমান স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে গিয়ে এ কথা স্বীকার করল এবং তাঁকে শাস্তি দিতে অনুরোধ করল। আমর ইবনুল আস ﵁ শাস্তিস্বরূপ গোপনে তাঁকে চাবুক মারলেন এবং গোপনে মাথা ন্যাড়া করে দিলেন। এ সংবাদ যখন উমর ফারুক ﵁-এর কাছে পৌঁছল, উমর ফারুক ﵁ আমর ইবনুল আস ﵁-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন আর বললেন— "আব্দুর রহমানকে মদিনায় পাঠিয়ে দাও।" আব্দুর রহমান ﵁ মদিনায় পৌঁছলে তিনি তাঁকে পুনরায় প্রকাশ্যে চাবুক মারলেন— যাতে সবাই বুঝতে পারে, আইন সবার জন্য সমান; বরং খলিফার সন্তানের জন্য এটা আরও ভয়ংকর।' (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৯/২৩২)

এই ছিল উমর ﵁-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের চিত্র।

শাহাদাতবরণ

উমর ফারুক ﵁-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক কাহিনি দিয়ে আমরা এই আলোচনার ইতি টানব। একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি লাল মোরগ তাঁকে তিনটি ঠোকর মেরেছে।

একবার মুগিরা ইবনে শোবা'র দাস অগ্নিপূজক আবু লুলু উমর ﵁-এর ওপর ক্ষেপে যায়। ফলে সে উমর ﵁-কে আঘাত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমনকী সে উমর ﵁-কে মারার জন্য একটি দ্বিমুখী খঞ্জরও তৈরি করে।

এক ভোরের ঘটনা। উমর ﵁ ফজর নামাজের ইমামতি করছেন। তাঁর ঠিক পেছনে ছদ্মবেশে অবস্থান নিয়েছে আবু লুলু। হাতে তার সেই ভয়ানক দ্বিমুখী খঞ্জর। উমর ﵁ যখন নামাজের কেরাত শুরু করলেন, তখন পেছন থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে উমর ﵁-এর বুকে পরপর তিনটা আঘাত হানল আবু লুলু। আঘাতের তীব্রতায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন উমর ﵁। ইমামের এই অবস্থায় পেছন থেকে একজন এসে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

কিছু মুসল্লি উমর ﵁-এর সহায়তায় এগিয়ে এলেন। আর খুনি আবু লুলু পেছন দিকে ছুটতে লাগল। আবু লুলু আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই পাশে যাকেই পেল, তাকেই খঞ্জর দিয়ে আঘাত করল। এতে আরও ১৩ জন সাহাবি মারাত্মকভাবে জখম হলেন। ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন সাতজন। বাকি ছয়জন পড়ে রইলেন আশঙ্কাজনক অবস্থায়।

অবশেষে খুনিকে আটাকানোর জন্য তার দিকে একজন সাহাবি চাদর ছুড়ে দিলেন। এতে সে চাদরের সাথে পেঁচিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। যখন সে দেখল ধরা পড়ে গেছে, তখন সাথে সাথেই খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে আত্মহত্যা করল।

নতুন ইমাম খুব সংক্ষিপ্ত কেরাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ করলেন। এদিকে খঞ্জরের আঘাতে বেঁহুশ হয়ে পড়লেন উমর ﵁। তাঁর মুখের মধ্যে কিছু দুধ দেওয়া হলো, কিন্তু সেই দুধ নাভি বেয়ে পড়তে লাগল! ডাক্তার আনা হলো। ডাক্তার উমর ﵁-কে দেখে শঙ্কা প্রকাশ করলেন। অনেক্ষণ পর উমর ﵁ চোখ খুললেন। চোখ খুলেই তিনি বললেন—'আমার ইমামতিতে যে ফজরের নামাজ শুরু হয়েছিল, সেটা কি আপনারা শেষ করেছেন?' আল্লাহু আকবার! এই শঙ্কটাবস্থায়ও তিনি দায়িত্বের কথা ভোলেননি। জিজ্ঞেস করছেন—তাঁর দায়িত্বে যে নামাজ শুরু হয়েছিল, তা শেষ হয়েছে কি না! নেতা তো দরকার এমনই, যিনি মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনো হা-হুতাশ করেননি, ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে ব্যস্ত হননি! খোঁজ নিয়েছেন তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে কি না!

এভাবেই পারস্যের এক অগ্নিপূজারি আততায়ীর হাতে এ মহান সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। তিনি সব সময় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন, যেন তিনি মদিনায় শাহাদাতবরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই গোলামের একনিষ্ঠ দুআ কবুল করেছেন। মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বকর ﵁-এর কবরদ্বয়ের পাশেই চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তিনি।

আমাদের এই পথহারা মুসলিম উম্মাহর জন্য উমর ﵁-এর মতো একজন নেতাই যথেষ্ট। আমরা চাই, আমাদের সন্তানরা উমর ﵁ সম্পর্কে আরও বেশি জানুক! তাঁকে নিয়ে আরও বেশি গবেষণা করুক! তাহলে ইনশাআল্লাহ, আমাদের নতুন প্রজন্মও উমর ﵁-এর গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

উমর ﵁ ছিলেন সততা, নিষ্ঠা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও রাসূলপ্রেমের এক চির ভাস্বর প্রতিবিম্ব। তাঁর শাসনামলে মুসলিম খিলাফতের সীমানা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের মান-মর্যাদা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। ধুলার তখতে বসে শাসন করেছিলেন প্রায় অর্ধ জাহান। তাঁর শাসন ছিল মুসলিমদের কল্যাণের শীতল স্রোতধারা, যার শীতল পানিতে পিপাসা মিটেছে গোটা আর্তমানবতার। উমর ﵁ মানবেতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। তাঁর নামে এখনও কেঁপে উঠে বাতিলের অন্তরাত্মা। উমর ﵁-এর জীবনেতিহাসে এখনও মুসলিম উম্মাহ খুঁজে ফেরে তাঁর হারানো গৌরবময় ও সমৃদ্ধ বর্ণালি অতীত। উমর নামের স্মরণে এখনও মনোবল ফিরে পায় মুসলিম তারুণ্য! সেই উমর ﵁-এর জিন্দেগিতে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

এই মহান খলিফার জীবনী আমাদের সোনামণিদের কাছে তুলে ধরতে হবে। তারা টিভিতে বিভিন্ন মুভিতে বা সিরিয়ালে সুপারস্টার দেখে তাদের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখে; অথচ তার চেয়েও হাজারগুণ বড়ো 'মেগাস্টার' আমাদের নাগালেই আছে। আমারা কি পেরেছি আমাদের মেগাস্টারদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে?

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

চরিত্রের বেশ কিছু ধরন দৃশ্যমান। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক চরিত্র দিয়েই মানবসত্তাকে মূল্যায়ন করা হয়। তবে দুনিয়াতে সবচেয়ে ঘৃণিত চরিত্র—নিফাকি তথা কপটতা। একজন মুনাফিকের চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দুনিয়ায় আর কেউ নেই। মুনাফিক মানেই দ্বিমুখী চরিত্রের বর্ণচোরা লোক। প্রতারক শ্রেণির এই লোকগুলো সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদাই এদের উপস্থিতি ছিল। স্থান, কাল ও সময় ভেদে এদের চেহারা বদলালেও চরিত্র এক ও অভিন্ন। ওপরে বন্ধু সেজে ভেতরে ক্ষতি সাধনে হীন কর্মেই এরা লিপ্ত থাকে সব সময়। ইসলামের ইতিহাসেও এমন গোপন শত্রু ছিল, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। এদের মুখে মধু আর অন্তরে বিষ। এরা গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। ফলে এদের চেনা বড়ো দায়।

'মুনাফিক' আরবি শব্দ। ইংরেজিতে বলে Hypocrite। উৎপত্তিগতভাবে মুনাফিক শব্দটি 'আন-নিফাক' শব্দ হতে এসেছে। আন-নিফাক শব্দটি এসেছে 'নাফাকা' শব্দ হতে। নাফাকা শব্দের বাংলা অর্থ সুরঙ্গ (Tunnel)। সাধারণত প্রত্যেক সুরঙ্গের দুই প্রান্তে দুটি মুখ থাকে। তেমনই মুনাফিকও হলো দুই মুখওয়ালা বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা ব্যক্তি (Two Faced Personality)। মুনাফিকরা দুই দলের কাছে গিয়ে দুই রকম কথা বলে। দুই দলের কাছে

দুই রকম চেহারা নিয়ে হাজির হয়। যখন যার কাছে যায়, তখন তার পক্ষে কথা বলে। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে তাদের এই Double Standard-এর ব্যাপারে বলেছেন—

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ۙ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ-

'তারা যখন ঈমানদার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে—"আমরা ঈমান এনেছি।" কিন্তু শয়তানের সাথে একান্তে সাক্ষাতে বলে—"মূলত আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আর তাদের (ঈমানদারদের) সঙ্গে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।"' (সূরা বাকারা : ১৪)

দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও মুনাফিকরা নিজেদের সুবিধামতো নীতি পরিবর্তন করে। নিজের জন্য যা সুবিধাজনক, শুধু সেগুলোই বেছে বেছে গ্রহণ করে। আবার নিজেদের স্বার্থে আঘাত এলে পাশ কাটিয়ে চলে। একই জিনিস নিজের বেলায় সত্য ও সঠিক, কিন্তু অন্যের বেলায় ভুল ও বেআইনি—এটাই হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দুমুখো নীতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে মুনাফিকদের ব্যাপারে মুসলিমদের সাবধান করতে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا-

'তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই দিকে আসো এবং রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদের দেখবেন—তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।' (সূরা নিসা : ৬৬)

মুনাফিককে দুই মুখওয়ালা বলার হেতু হচ্ছে—মরুভূমিতে একটি প্রাণী আছে, যার নাম 'আন-নাফিকা' (النافقاء)। এই প্রাণিটি তার ঘরে দুটি দরজা রাখে, যেন শত্রু একটি দরজা দিয়ে আক্রমণ চালালে বিকল্প দরজা দিয়ে সে পালাতে পারে। এই চরিত্রের প্রাণীর সাথে মিল থাকায় দুমুখো লোকদের বলা হয় মুনাফিক। এখান থেকে মুনাফিকের দ্বৈত চরিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। মুনাফিক অর্থ দুই চরিত্র বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা মানুষ।

ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক ওই ব্যক্তি, যে অন্তরে কুফরি ও ইসলামবিরোধিতা রেখে মুখে ও প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলে এবং নিজেকে মুসলিম দাবি করে।

ইংরেজি ভাষায় লেখা আমার এক গবেষণা প্রবন্ধে মুনাফিকদের পরিচয় আমি যেভাবে তুলে ধরেছি, তার সারসংক্ষেপ—

> 'Basically, hypocrites are two faced people who maintain double standard and act as if they are pious believers, though they do not have faith in their hearts. Hypocrisy is loosely defined as putting up a false appearance that shows piousness in public but does not have faith in private. In matters of faith, it describes the sort of actions that are associated with pretending to accept the faith of Islam when a person actually does not. He does so in order to win favor with Muslims and to try to be accepted as one of them. They are the most dangerous enemies of Islam and Muslims.'

ইতিহাসের আয়নায় মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ

মুসলিমদের সুসময়ে মুনাফিকদের উত্থান শুরু হয়। বিশ্বনবির মাক্কি জীবনের ১৩ বছরে মুনাফিকদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, মক্কায় নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়া ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু মাদানি জীবনের ১০ বছর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সময় মুসলিমদের ছোটো হলেও একটি ইসলামি রাষ্ট্র ছিল। মুসলিমরা স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারত। আর এ সময়ই মুনাফিকদের উৎপত্তি ঘটে। তাই মাদানি যুগে নাজিলকৃত বেশিরভাগ সূরাতেই মুনাফিকদের ব্যাপারে কমবেশি আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা বাকারা, সূরা নিসা, সূরা তাওবা ও সূরা আহজাবে। তা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে সরাসরি তাদের নামেই 'সূরা মুনাফিকুন' নামে একটি ছোটো সূরা কুরআনে স্থান পেয়েছে।

মূলত বদর যুদ্ধের পরপরই মদিনায় একটি নতুন গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা নিজেদের দ্বিমুখী নীতির কারণে মুনাফিক নামে পরিচিতি লাভ করে। নবি করিম ﷺ-এর মাক্কি জীবনের শেষের দিকেই মুনাফিকির প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। এই সময়ের মুনাফিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তারা ইসলামের সত্যতার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করত না;

বরং সত্যতা স্বীকার করে ঈমানের ঘোষণা দিত। কিন্তু এই ঘোষণার ফলে যেসব অনিবার্য বিপদ তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল, অর্থাৎ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি। সেগুলোর মোকাবিলায় তারা ছিল একেবারেই অপ্রস্তুত ও নারাজ।

বদর যুদ্ধের পরপর মদিনায় মুনাফিক গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করলেও মুনাফিকির প্রকাশ্য রূপ ধরা পরে উহুদের যুদ্ধে। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হয়ে মাঝপথে তার ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে মদিনায় ফিরে আসে। ঠিক তখন থেকেই মুনাফিকির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ (Official Manifestation) ঘটে।

সূরা বাকারা নাজিলের সময় মুনাফিক গোষ্ঠীগুলোর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। তাই এই সূরায় তাদের আত্মপ্রকাশের প্রতি বেশি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকল, আল্লাহ তায়ালা ততই অন্যান্য সূরাগুলোতে বিস্তারিতরূপে বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকলেন।

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিমদের ওপর একই সঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্ব এসে পড়ে। একাধারে মদিনার সমাজ সংস্কার, ইসলামি দাওয়াতের প্রসার, চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তি এবং কুরাইশদের মোকাবিলাসহ চতুর্মুখী কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এসবের সাথে ইহুদিদের ধূর্ততা কূটকৌশলের মুখোশ উন্মোচন এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর হুমকি নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিমরা ছিল নিজেদের কাজে চরম ব্যস্ত। এরই মধ্যে মুনাফিকরা মুসলিমদের ভেতর থেকে আঘাত হানতে শুরু করে। এটা ছিল মুসলিমদের জন্য খুব ভয়ংকর রকমের ইন্টার্নাল থ্রেট। ক্রমশ মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআনে বিভিন্ন আয়াত নাজিল হতে থাকে। উন্মোচিত হতে থাকে তাদের চরিত্রের নানা দিক; কিন্তু মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ডিরেক্ট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। কারণ, মুসলিমরা বাহির সামলাতেই এতটাই ব্যস্ত ছিল, ভেতরের দিকে তাকানোর কোনো ফুরসতই ছিল না। তা ছাড়া রাসূল ﷺ বাহ্যিক অবস্থা দেখে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করতে বলেছিলেন।

উমর ফারুক ﷺ কয়েকবার তাদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ বলেছিলেন—'না, এটা করতে যেয়ো না। কারণ, তারা তো ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে। অন্তরে ঈমান না থাকলেও আপাতদৃষ্টিতে তারা মুসলিম।

তাই তাদের হত্যা করলে আরব গোত্রগুলো বলতে শুরু করবে—"মুহাম্মাদ তাঁর নিজ অনুসারীদেরই হত্যা করছে।"' তাই মুনাফিকদের কূটচাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের করার মতো তেমন কিছু ছিল না।

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কুরাইশদের সাথে দীর্ঘ যুদ্ধের একটা সাময়িক বিরতি ঘটে এবং বাইরের সমস্যাগুলোও কমতে শুরু করে। এই সময়ে মদিনায় মুনাফিকদের কদর্যতাও চরম রূপ ধারণ করে। তখন মুসলিমরা ঘরের সমস্যা সমাধানের প্রতি মনোযোগী হন। নবিজি তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু করেন।

নবম হিজরিতে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাক্কালে নবিজি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ﵁-কে সুওয়াইলিম নামক এক ইহুদির ঘরে আগুন লাগানোর নির্দেশ দেন। কারণ, সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলিমদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার কৌশল নিয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র করত। সবশেষে বিশ্বনবি তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আরও হার্ডলাইনে চলে যান।

মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মুনাফিকরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যেখানে বসে তারা সকল ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি করত। পবিত্র কুরআনে এ মসজিদটিকে 'মসজিদ-ই-দ্বিরার' বা ক্ষতিকর মসজিদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল ﷺ মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদ-ই-দ্বিরার ভেঙে, জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দেন। এভাবে মুনাফিকদের আস্তানা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। নবম হিজরির শেষের দিকে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল মারা গেলে তারা ধীরে ধীরে দুর্বল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পরে।

তবে এই দলটি কখনোই চির বিলুপ্ত হয়নি। কারণ, তারা বর্ণচোরা। ওপর দিয়ে ইসলাম প্রকাশ করে, কিন্তু ভেতর দিয়ে কুফরি লালন করে। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে এবং তৎপরবর্তী সময়েও তাদের তৎপরতা লক্ষণীয়। যুগে যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল এই দলটি।

তুলনামূলক বিচারে মুনাফিকের চেয়ে কাফির ভালো। কারণ, তাদের আমরা চিনি। তারা তাদের আইডেন্টিটি লুকায় না। মুনাফিকের চেয়ে মুশরিক ভালো। কারণ, তারা প্রকাশ্যেই শিরক করে। মুনাফিকের চেয়ে ইহুদি ভালো। কারণ, তারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। তাদের শত্রুতায় কোনো লুকোচুরি নেই।

কিন্তু মুনাফিক কারা—আমরা তা জানি না। কারণ, তারা ঈমানের ঘোষণা দেয়, কিন্তু অন্তরে কুফরকে লালন করে। আর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। কে না জানে—প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে গোপন দুশমন বেশি ভয়ংকর।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুনাফিকরা মুমিন। তারা আমাদের মতো নামাজ পড়ে, দাড়ি রাখে। আমাদের সাথেই তাদের উঠাবসা, কিন্তু তাদের হৃদয় ঈমানশূন্য। কোনো কাফির কখনো মুনাফিক হতে পারে না। কোনো মুশরিক কখনো মুনাফিক হতে পারে না। কোনো ইহুদিও কখনো মুনাফিক হতে পারে না। মুনাফিক হতে হলে মুসলিম হতে হয়। তাই এরা এত ভয়ংকর। এজন্যই মুনাফিকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বারবার সতর্ক করেছেন।

মদিনায় সর্বসাকুল্যে মুনাফিক ছিল প্রায় ৩৭০ জন। ৩০০ জন পুরুষ এবং ৭০ জন নারী। নবিজি তাদের সবাইকে চিনতেন, কিন্তু কারও কাছে তাদের নাম প্রকাশ করতেন না। ইন্তেকালের আগে নবিজি মদিনার মুনাফিকদের তালিকা শুধু হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁-এর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নবিজির সকল গোপন তথ্যের ধারক ও বাহক। উমর ﵁ তাঁর খিলাফতকালে কেউ মারা গেলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জানাজায় যেতে চাইতেন না, যতক্ষণ না হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ সেই জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। হুজাইফা ﵁ গেলে উমর ফারুক ﵁ সেই জানাজায় শরিক হতেন। কারণ, তিনি জানতেন, মদিনার মুনাফিকদের নামের তালিকা একমাত্র হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁-এর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ যদি কারও জানাজায় শরিক হতেন, তখন এটা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যেত—মৃত লোকটি মুনাফিক নয়।

উমর ফারুক ﵁ একবার হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁-এর কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন—'হে হুজাইফা! আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আগে বলো, আমাকে এর উত্তর জানাবে কি না?' হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ বললেন—'ইয়া আমিরুল মুমিনিন! এটা কেমন কথা যে আপনি কিছু জানতে চাইবেন, এর আমি উত্তর দেবো না!' উমর ফারুক ﵁ বললেন—'একমাত্র তুমিই জানো, কারা মুনফাফিক। তুমি ছাড়া এটা আর কেউ জানে না। আমার জানতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে যে মুনাফিকদের তালিকা আছে, সেখানে আমার নাম আছে কি না? যদি থেকে থাকে, তাহলে মৃত্যুর আগে নিজেকে

সংশোধন করে পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে মরতে চাই।' হুজাইফা ﷺ বললেন—'জি না। আপনার নাম সেখানে নেই।'

কী করে উমর ফারুক ﷺ-এর নাম মুনাফিকদের তালিকায় থাকবে? যিনি দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। যাকে রাসূল ﷺ 'ফারুক' তথা হক-বাতিলের পার্থক্যকারী উপাধি দিয়েছেন। যার মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন—'আমার পরে কেউ নবি হলে উমর নবি হতো।' এখানে Moral of the story হচ্ছে—উমর ফারুকের মতো এত বড়ো সম্মানিত সাহাবি নিফাকির ব্যাপারে চিন্তিত—'আমার কোনো কাজ মুনাফিকদের সাথে মিলে যাচ্ছে না তো! আমার অন্তরে নিফাকি বাসা বাঁধছে না তো!' তাহলে আমি, আপনি এবং আমরা কোন পর্যায়ে আছি। আমরা কি এ বিষয়ে আদৌ চিন্তিত?

মুনাফিকের প্রকারভেদ

আমরা নিফাক ও মুনাফিকিকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. বিশ্বাসগত মুনাফিকি (Doctrinal/Major Hypocrisy) Hypocrisy in Belief

২. কর্মগত মুনাফিকি (Practical/Minor Hypocrisy) Hypocrisy in Action

১. বিশ্বাসগত মুনাফিকি : বিশ্বাসগত মুনাফিকি হলো মূল কপটতা বা Major hypocrisy। অন্তরে কুফরি রেখে নিজেকে মুসলিম দাবি করা বিশ্বাসগত মুনাফিকি। এ ধরনের মুনাফিকির কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিধানকে স্বীকার করে না, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় কিংবা ইসলামের বৃহত্তর ক্ষতির লক্ষ্যে বাহ্যিকভাবে মুসলিম সাজার ভান করে। এই শ্রেণির নিফাকি তাদের ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দেয়। আল্লাহ ক্ষমা না করলে এরা অবশ্যই পরকালে জাহান্নামে যাবে।

এই শ্রেণির মুনাফিকদের কপটতা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا-

'নিশ্চিত জেনে রেখ, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তোমরা তাদের জন্য কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।' (সূরা নিসা : ১৪৫)

২. কর্মগত মুনাফিকি : কর্মগত মুনাফিকি (Minor Hypocrisy) বলতে ঈমানদারদের ওই শ্রেণিকে বোঝায়, যাদের অন্তরে ঈমান আছে আবার কাজকর্মের মাঝে মুনাফিকির কিছু বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। তাদের মধ্যে অনেকে এ রকম আছে—যাদের ঈমান যাওয়া-আসার মাঝে দোদুল্যমান কিংবা তারা ঈমান আনলেও জাহেলি যুগের নীতিগুলোকে প্রাত্যহিক কাজকর্ম থেকে বাদ দিতে পারেনি। মূলকথা, এই শ্রেণির লোকদের মাঝে মুনাফিকদের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তবে তাদের মধ্যে ঈমানও আছে। এই শ্রেণির নিফাকি তাদের ঈমান থেকে খারিজ করে না।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাদানি জীবনটা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। প্রতিদিন কোনো না কোনো বিধানসংবলিত আয়াত নাজিল হচ্ছিল। মুসলিমরা সে বিধিবিধান আত্মস্থ করছিল। রাসূল ﷺ একটা একটা করে ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচার (Islamic Social Etiquette) সবাইকে শেখাচ্ছিলেন। ইসলামের পারিবারিক আইন, সামাজিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন—এভাবে সবকিছুই ঢেলে সাজানো হচ্ছিল। মুসলিমরা তখন নির্বিঘ্নে ইসলাম পালন করতে পারছিল।

অন্যদিকে মুসলিমদের শত্রুর সংখ্যা থেমে ছিল না; সেটাও দিনকে দিন বেড়েই চলছিল। বাইরের শত্রুদের মোকাবিলা করতে করতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে মুনাফিকরা মুসলিমদের ভেতরে অবস্থান করে ইসলামের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাদের মতো কাজ করত। ফলে মুসলিমরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল। আক্রমণকারী শত্রুদের দমনের জন্য পরিচালিত যুদ্ধের বিপক্ষে প্রচারণা, এমনকী যুদ্ধাগমনের মাঝপথে সৈন্যদলসহ ফিরে যাওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজও তারা করেছিল।

বিশ্বাসগত মুনাফিকিতে লিপ্ত লোকেরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের যাত্রাপথকে রুদ্ধ করে দেওয়ার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিল। তাদের সরদার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সিরাতগ্রন্থ ও ইতিহাসবিদদের বর্ণনা হতে বোঝা যায়, সে ছিল মদিনার খাজরাজ গোত্রের নেতা। নবিজির মদিনায় হিজরতের আগ মুহূর্তে মদিনার লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাদের প্রধান নেতা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বনবি ﷺ-এর আগমন উবাইয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দেয়।

মদিনায় তিনটি ইহুদি গোত্র (কাইনুকা, নাজির ও কুরায়জা) বসবাস করত। তাই মদিনার লোকজন আল্লাহ, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে আগে থেকেই অবগত ছিল। এমনকী আখেরি নবির আগমন, নবুয়তের আলামত সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল। তাই তারা খুব সহজেই রাসূল ﷺ-কে মেনে নিয়েছিল।

বিশ্বনবি মদিনায় আগমনের পর তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠে মদিনাতুন্নবি বা নবির শহর—যার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব। আর আমরা এখন এই শহরকেই মদিনা মুনাওয়ারাহ নামে চিনি। সে সময় মদিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। আরবদের সংস্কৃতিই ছিল এমন। তুচ্ছ কারণে গোত্রে গোত্রে লড়াই, যুদ্ধ, খুনোখুনি, রক্তারক্তি ছিল তাদের কাছে ডাল-ভাত। কিন্তু নবিজির আগমনের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন। মদিনার গোত্রগুলো পরস্পরের ঘোরতর শত্রু থেকে আবদ্ধ হয় পরম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে।

মহামহিম আল্লাহ মদিনাবাসীদের তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

'আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, সে কথা স্মরণ রেখ। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নির্দশনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

তবে বিশ্বনবি ﷺ-এর আগমনে সবচেয়ে মর্মাহত হয় ওইসব লোক, যারা মদিনার নেতৃত্বে আসার প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে নবিজির বিরোধিতাও করতে পারছিল না। তাই মুনাফিকির পথ বেছে নিয়েছিল। এই মুনাফিকদের সরদার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই—যাকে মদিনাবাসীরা নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল; কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বের আসনে আরোহণই বাকি ছিল।

কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মুনাফিকদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা মূলত এই সকল মুনাফিকদেরই বর্ণনা। এবার আমরা মুনাফিকদের এই আলামতগুলো নিয়ে আলোচনা করব—যাতে করে আমরা এসব আলামতগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারি।

মুনাফিকের আলামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে মুনাফিকদের বাহ্যিকভাবে দেখে আলাদা করা যেত না। তারা ছিল বাকি মুসলিমদের মতোই। সবার সাথে একই সমাজে চলাফেরা করত, নামাজ পড়ত, মসজিদে যেত। তবে বিশেষ বিশেষ কিছু মুহূর্তে আল্লাহ তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিতেন। কুরআন ও হাদিসে আমরা তাদের কিছু আলামত দেখতে পাই।

হাদিসে এসেছে—আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে পুরোপুরি থাকবে, সে পুরোদস্তুর মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার কোনো একটি থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থাকবে। স্বভাব চারটি হচ্ছে—সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। চুক্তি করলে লঙ্ঘন করে এবং যখন ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল গালিগালাজ করে।' (সহিহ বুখারি : ২৪৫৯)

এই হাদিস হতে মুনাফিকের চারটি বিশেষ আলামত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুনাফিকের আরও বেশ কিছু আলামতের সাথে আমরা পরিচিত। ধারাবাহিকভাবে সেসব আলামত তুলে ধরা হচ্ছে—

মিথ্যা কথা বলা : মুনাফিকরা যেহেতু মুসলিম ছিল না এবং মুসলিম সমাজে ঈমানদার সাজার ভান করত, তাই বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তাদের মিথ্যা বলতেই হতো। মুখে ইসলামের কথা বললেও মূলত তাদের অন্তরে ছিল ইসলাম-বিদ্বেষ। তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۘ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ-

'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে—"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"' (সূরা মুনাফিকুন : ০১)

আল্লাহ মুনাফিকদের এক নম্বর আলামত বলেছেন—তারা মিথ্যাবাদী। কোনো ঈমানদার মুসলিমের মধ্যে যদি এই রোগ থাকে, তবে তাকে সরাসরি মুনাফিক বলা যাবে না, কিন্তু অবশ্যই সতর্ক করতে হবে এই কারণে—তার মাঝে মুনাফিকি দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এবার একটু নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবুন তো, আপনার মাঝে কি এই মিথ্যা বলার স্বভাবটি আছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে আজ থেকে এটি পরিহার করা শুরু করুন।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। একটা মিথ্যাকে ঢাকতে আরও অনেক মিথ্যা বলতে হয়। কিয়ামতের দিন যখন বিচারের জন্য অপেক্ষমাণ মানুষ একে একে সকল নবির কাছে সুপারিশের জন্য যাবে, সকল নবিই নানা কারণে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। কুরআনে এসেছে—সেদিন তাঁরা নিজেদের ব্যাপারেই ভীত থাকবেন।

আমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম ﷺ-এর কাছে সুপারিশের জন্য যাওয়ার পর তিনি বলবেন—'আমি দুনিয়াতে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম (যদিও তা মিথ্যা ছিল না)। আমি নিজেই জানি না—আমার কী হবে!'

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন—

'ইবরাহিম ﷺ সমগ্র জীবনে তিনটা মিথ্যা বলেছেন।'

উক্ত তিনটি মিথ্যা ছিল—

১. মেলায় না যাওয়ার অজুহাত হিসেবে তিনি বলেছিলেন—

إِنِّيْ سَقِيْمٌ 'আমি অসুস্থ।' (সূরা ছাফফাত : ৮৯)

২. মূর্তি ভেঙেছে কে? এরূপ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন—

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا-

'বরং তাদের বড়ো মূর্তিটাই এ কাজ করেছে।' (সূরা আম্বিয়া : ৬৩)

৩. মিশরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সারা-কে তিনি বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। (সহিহ বুখারি : ৩১৭৯)

শুধু এতটুকু কারণে যদি ইবরাহিম ﷺ তাঁর নিজের ব্যাপারে ভীত থাকেন, তবে আমাদের কী হবে! অথচ আমাদের মিথ্যার সংখ্যা অগণিত; গণনা করে শেষ হবে না! প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হরহামেশাই আমরা মিথ্যা বলি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা-ই বলে বেড়ায়।' (সহিহ মুসলিম : ০৫)

অথচ আমরা কান দিয়ে শ্রবণ করা তো দূরের কথা, অনুমান করেই কত কথা যে নিজ দায়িত্বে প্রচার করি কার কোনো ইয়েত্তা নেই! বিশেষত আমাদের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শি কিংবা সহকর্মীদের ব্যাপারে এটা বেশি করি। এখান থেকেই উৎপত্তি হয় চোগলখোরি, গিবতের মতো মারাত্মক গর্হিত কাজ। এসবের সাথে জড়িতদের আল্লাহ লানত করেছেন। আর গিবতকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। এরপরও আমরা এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে নিজেদের নিবৃত রাখি না; বরং এমনভাবে এই কাজ করি, যেন এর চেয়ে মহৎ কাজ আর হয় না! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন!

আর এখন এই আধুনিক সমাজে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কারণে মিথ্যা বলাটা আরও অনেক সহজ হয়ে গেছে। ফেসবুক, টুইটারে কোনো খবর দেখা মাত্রই সত্যতা যাচাই না করেই আমরা তা শেয়ার করি। উপরোল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী—এসব কাজ করলে মিথ্যাবাদী হতে হবে।

সামান্যতম মিথ্যার ব্যাপারেও বিশ্বনবি ﷺ কেমন সিরিয়াস ছিলেন—তা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'ধ্বংস তার জন্য, যে লোক হাসানোর জন্য কথা বলে এবং এতে সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।' (জামে আত-তিরমিজি ও আবু দাউদ : ৪৯৯০)

ওয়াদা ভঙ্গ করা : মুনাফিকির দ্বিতীয় লক্ষণ হলো—ওয়াদার বরখেলাপ করা।

ওয়াদা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—অঙ্গীকার, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। ইংরেজিতে Promise। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কেউ কোনো অঙ্গীকার করলে, কাউকে কোনো কথা দিলে বা লিখিত চুক্তি করলে তার নামই হলো ওয়াদা।

আমাদের সমাজে ওয়াদা খেলাফকারী ব্যক্তি অহরহ। বিশেষ করে আমাদের নেতা-নেত্রীরা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য যেসব ওয়াদা দেয়, তার তো বেশিরভাগই খেলাফ হয়; বরং এসব ওয়াদা তারা রক্ষা করতে পারবে না—এটা জেনেই ওয়াদা করে। এগুলো মুনাফিকির চিহ্ন।

আমরা ব্যক্তিজীবনেও ছোটো-বড়ো সকল ওয়াদা রক্ষা করার চেষ্টা করব। হোক না সেটা সময়মতো কোথাও উপস্থিত হওয়া কিংবা সময় মাফিক লেনদেন করা। প্রয়োজনে সময় চেয়ে নেব, মাফ চেয়ে নেব, তবুও ওয়াদা ভঙ্গ করব না। দেখা যায়—কারও থেকে সাত দিনের জন্য টাকা ধার নিয়েছি, কিন্তু সেটা ওয়াদা মাফিক ফেরত দিতে পারছি না। আমাদের উচিত হবে—যিনি আমাদের সাহায্য করেছেন, তার কাছে আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে সুন্দরভাবে আরও সময় নেওয়া।

কিন্তু আমরা করি তার উলটোটা! মোবাইল রিসিভ করা বন্ধ করে দিই। ফেসবুকে ব্লক করে দিই কিংবা মেসেজ নোটিফিকেশন অফ করে দিই অথবা সিন করেও রিপ্লাই দিই না। অর্থাৎ সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। এমন ভাব নিই, যেন আমাদের দুর্দিন আর আসবে না; তিনি আমাদের ধার দিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছেন, এখন তার উচিত এই পাপের শাস্তি ভোগ করা। আর আমি নিজ দায়িত্বে তাকে সেই শাস্তি দিচ্ছি!

না, এমনটা কখনোই করা যাবে না। এটা মুনাফিকির লক্ষণ। আর আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

আমানতের খেয়ানত করা : মুনাফিকির তৃতীয় লক্ষণ হলো—আমানতের খেয়ানত করা।

আমানত আরবি শব্দ। এর মূল শব্দ 'আমনুন'—যার বাংলা অর্থ নিরাপত্তা। আমনুন থেকে আমানাহ করলে অর্থটা আরও বেড়ে গিয়ে হয় বিশ্বস্ততা, Trustworthiness। অর্থাৎ আমানত শব্দটির সাথে দুটি শব্দ জড়িত : বিশ্বাস ও নিরাপত্তা। পারস্পরিক নিরাপত্তার ব্যাপারে একে অপরকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস করাই আমানত।

যেমন : আমি আমার বন্ধুর নিকট কিছু সম্পদ জমা রাখলাম। নিশ্চয়ই সেই বন্ধুর প্রতি আমার পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস আছে, আমি সম্পদগুলো আবার নিরাপদে ফেরত পাব। যদি আমি সেই সম্পদগুলো নিরাপদে ফিরে না পাই, তবে তার প্রতি আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। এটিই খেয়ানত। অর্থাৎ আমানতের বিপরীত কাজ হচ্ছে খেয়ানত। খেয়ানত করা হলে একই সঙ্গে বিশ্বাস নষ্ট এবং নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়। অথচ ইসলামের সুমহান শিক্ষা হলো—প্রত্যেক মুসলিমের জান ও মাল আরেক মুসলিমের নিকট মূল্যবান হিসেবে বিবেচ্য হবে।

নবিজি মানুষের আমানতকে খুব গুরুত্ব দিতেন। এজন্য মক্কাবাসী তাঁকে 'আস-সাদিক, আল আমিন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। 'আস-সাদিক, আল আমিন' অর্থ সত্যবাদী, আমানতদার। এমনকী হিজরতের দিন যখন কাফিররা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, সেদিনও তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত আমানতের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে গচ্ছিত মক্কাবাসীর সকল আমানত আলি ﵁-এর কাছে দিয়ে যান, যেন আলি ﵁ এগুলো যারা আমানত রেখেছিল তাদের কাছে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দিতে পারেন। আমানতের গুরুত্ব এই একটা ঘটনা দিয়েই বহুলাংশে বোঝা যায়।

আমানত খুবই ব্যাপক একটি বিষয়। আমার প্রতি আপনার যে দায়িত্ব এবং আপনার প্রতি আমার যে অধিকার, তা সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ভাবলাম—এটাই আমানত।

আমানত সৃষ্টির সাথেও হয়, স্রষ্টার সাথেও হয়। আল্লাহ তায়ালা যে জীবনব্যবস্থা (ইসলাম) পাঠিয়েছেন, তা আমাদের নিকট আমানত।

এই আমানতের ভার অনেক বেশি। আল্লাহ বলেছেন—

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا-

'আমি এ আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিঃসন্দেহে সে বড়ো জালিম ও অজ্ঞ।' (সূরা আহজাব : ৭২)

সুতরাং ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের নিরাপত্তা আমাদের দিতে হবে। ইসলামের বিধিবিধান ও ইবাদতসমূহ আমাদের যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অন্যথায় তা হবে আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া এই আমানতের খেয়ানত।

আল্লাহ আমাদের যত যোগ্যতা, সম্পদ ও নিয়ামত দিয়েছেন—সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। অর্থাৎ আমার চেহারা, শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা, জ্ঞান, পরিবার, সম্পদ—সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এসব ব্যবহার করতে হবে। এর অন্যথা হলে তা হবে আমানতের সুস্পষ্ট খেয়ানত।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا-

'নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা নিসা : ৫৮)

এই আয়াতে মূলত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বনি ইসরাইলদের প্রতি। তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ তথা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্বপূর্ণ পদ (Positions of trust) এমনসব লোকদের হাতে দেওয়া শুরু করেছিল—যারা ছিল অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, খেয়ানতকারী ও ব্যভিচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাদের আল্লাহর আজাবে পতিত হতে হয়েছে।

মুসলিমদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—তোমরা এই বনি ইসরাইলদের মতো আচরণ করো না; বরং যোগ্য লোকদের হাতে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে, কেবল তাদের হাতেই আমানত তুলে দাও।

বিশ্বনবি একদিন সাহাবিদের আমানত নষ্ট করার শাস্তিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন—যখন আমানতকে নষ্ট করা হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমানত কীভাবে নষ্ট হবে?'

রাসূল ﷺ বললেন—'যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।' (সহিহ বুখারি : ৬৪৯৬)

যার যেই চেয়ারে বসার যোগ্যতা নেই, জোর খাটিয়ে সেই লোক যদি ওই চেয়ারে বসে, তাহলে সেটাই হলো আমানতের খেয়ানত। যেমন : খতিব হওয়ার যোগ্যতা নেই, কিন্তু লবিং করে খতিব হয়েছেন। জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা নেই, অন্যায়ভাবে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। বিচার করার যোগ্যতা নেই, কিন্তু প্রভাব খাটিয়ে দেদারছে এলাকার বিচার-আচার পরিচালনা করছেন, কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নয়, অনৈতিকভাবে সেটা অর্জন করেছেন—এগুলো সবই আমানতের খেয়ানত।

একজন কর্তাব্যক্তির দায়িত্ব ও গুণাবলি কী হবে—তা-ও আল্লাহ বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ۔

'এরা এমনসব লোক—যাদের আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি, তাহলে এরা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।' (সূরা হজ : ৪১)

তাই নেতা বা কর্তাব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য নির্বাচন করাটাও আমানতের খেয়ানত। একজন মসজিদের ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন তার ঈমান, ইলম, আমল ও আখলাক বিবেচনা করি, তেমনি সমাজের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তার সততা ও যোগ্যতা দেখতে হবে।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নেতার চারটি গুণাবলির কথা বলেছেন।

- নামাজি হবে, নামাজ কায়েম করবে।
- জাকাত পরিশোধ ও আদায় করবে।
- ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং
- খারাপ কাজের নিষেধ করবে।

এই চারটি গুণ যাদের মধ্যে থাকবে, তাদেরই আমরা নেতা হিসেবে নির্বাচন করব। কেননা, আল্লাহ এই গুণাবলিসম্পন্ন মানুষদেরই যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

একজন ব্যক্তি একটি পদের জন্য যোগ্য নয়; কিন্তু আমি যদি স্বজনপ্রীতি করে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে ওই পদে নিযুক্ত করি, তবে তা হবে আমানতের খেয়ানত। নিজ দলের বা পছন্দের লোক হওয়ার কারণে চরিত্রহীন, দুর্নীতিপরায়ণ লোককে বড়ো কোনো পদে বসাই, নেতা হিসেবে নির্বাচিত করি, ভোট দিই, তবে তা হবে আল্লাহর ঘোষণার বিপরীত এবং আমানতের খেয়ানত—স্পষ্টতই যা মুনাফিকি চরিত্রের অন্তর্গত।

অশ্লীল কথা বলা : যাপিত জীবনে কত রকম মানুষের সাথেই মেলামেশা ও লেনদেন করতে হয়, এতে কখনো কখনো মতের অমিল দেখা দেয় এবং মাঝেমধ্যে তা কলহ-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিন কোনো অবস্থাতেই মুখের ভাষা খারাপ করতে পারে না। সব সময় সে ভদ্রতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদ হোক, চিন্তা-চেতনার অমিল হোক, রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক বিরোধ হোক, কোনো অবস্থাতেই একজন মুমিন তার মুখ দিয়ে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করবে না।

হাদিসের দৃষ্টিতে এরূপ করা মুনাফিকের আলামত। কারণ, কেবল মুনাফিক ব্যক্তিই অন্যের সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হলে খারাপ শব্দ ব্যবহার করে এবং অবলীলায় অশ্লীল-অশ্রাব্য গালমন্দ শুরু করে দেয়।

বর্তমান যুগে আমরা নিজেরাই অনেক অশ্লীল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছি। কিছু কিছু বিষয় এমন হয়ে পড়ছে, আমরা সেগুলোকে গুনাহই মনে করছি না। অথচ অশ্লীলতা পছন্দ করা মুনাফিকের অভ্যাস, যার বিনিময়ে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

'যারা চায় মুমিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা দুনিয়ায় ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।' (সূরা নুর : ১৯)

অপ্রয়োজনে কসম করা : কথায় কথায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শপথ করা বা কসম কাটা মুনাফিকদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً-

'তারা নিজেদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।'
(সূরা মুনাফিকুন : ০২)

মদিনার মুনাফিকরা যেহেতু বিশ্বাসগতভাবে মুসলিম ছিল না, সেহেতু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যেত। তখন ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা কসম কেটে ঈমানের সাক্ষ্য দিত।

তাই কোনো মিথ্যা জিনিসকে ঢেকে দেওয়া বা গোপন করার জন্য কসমই ছিল মুনাফিকদের একমাত্র অস্ত্র। আমরাও অনেক সময় মিথ্যা কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কসম করে বসি। যেমন : অনেক ব্যবসায়ী তাদের ক্রেতাকে কনভিন্স করার জন্য বলে—

'আল্লাহর কসম! আমি এটা ১০০ টাকা দিয়ে কিনেছি, আপনার জন্য ১১০ টাকা। মাত্র দশ টাকা লাভেই দিয়ে দিচ্ছি।'

'আল্লাহর কসম! বিশ্বাস করেন ভাই—আপনাকে একেবারে কেনা দামে কোনো লাভ ছাড়াই দিলাম। কারণ, আপনি "বউনি কাস্টমার" অর্থাৎ আপনারে দিয়েই আজকের কেনাবেচা শুরু করলাম।'

হয়তো এর আগে আরও বিশজনের কাছে বিক্রি করেছে আর সবাইকে কসম কেটে একই কথা বলছে—'আপনিই আমার প্রথম কাস্টমার।'

এগুলো করা যাবে না। এগুলোই মুনাফিকের লক্ষণ।

একান্ত জরুরি প্রয়োজনে কোনো অকাট্য সত্যকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্য যদি সত্যিই কসম করার প্রয়োজন হয়, তবে তা হবে শুধু আল্লাহর নামে। আমাদের মাঝে অনেকেই মায়ের কসম, বিদ্যার কসম, মাথার কসমসহ হরেক রকম নামে কসম কাটে—এগুলো কোনোটাই বৈধ নয়।

ইসলামের কাজে বাধা দেওয়া : মুনাফিকরা নিজেকেও যেমন আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখত, তেমনি অন্যকেও ইসলামের দিকে আসতে বাধা দিত। মুমিনদের ভয়-ভীতি দেখাত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

'তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে।' (সূরা মুনাফিকুন : ০২)

আমাদের সমাজেও কিছু মুসলিম নামধারী লোক মুসলিমদের সাথে মিশে মুখে খুব ইসলামের কথা বলে, কিন্তু তারা আল্লাহর পথে আসতে, চলতে মানুষকে বাধা দেয়। ট্যাগ দেয় জঙ্গি বলে। বিভিন্ন নামে ট্রল করে। এগুলো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবেও কেউ যদি ইসলাম পালন করতে চায়, ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়, তাদেরও বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চালানো হয় বিভিন্ন নানান ধরনের অপপ্রচার। ইসলামি বইকে জঙ্গি বই বলে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। দাড়ি রাখার কারণে চাকরির ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাচ-গানের অনুষ্ঠান করতে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ইসলামি প্রোগ্রাম করতে হলে অনুমতি নিতে হয়। অনেক নিয়ম-নীতির বাহানা দেওয়া হয়, ইচ্ছাকৃত হয়রানি ও গড়িমসি করা হয়—এগুলো সবই কিন্তু ইসলামের কাজে বাধা দেওয়ার শামিল এবং অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হতে হলে আমাদের এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ওপর দিয়ে ফিটফাট : মুনাফিকের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যান্য মুনাফিকরা ছিল মদিনার নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের উঠাবসা, কথাবার্তার মাঝে ছিল আভিজাত্যের ছাপ। তারা যখন মুসলিমদের মাঝে আসত, তখন তাদের পোশাক ছিল চাকচিক্যময়। কথাবার্তায় ছিল রসিক। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۚ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۚ
كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ-

'তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে, তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুঁড়ির মতো।'
(সূরা মুনাফিকুন : ০৪)

তাদের বাইরের আচরণ ছিল অভিজাত প্রকৃতির, কিন্তু ভেতরটা ছিল খুবই কদর্য ও পূতিগন্ধময়। তারা এসব বাহ্যিকতার আড়ালে মুমিনদের ধোঁকা দিত। আমাদের সমাজেও অনেক লোক মুসলিমদের বন্ধু সেজে, সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলে মুসলিমদের সাথে মুনাফিকি করে। তাই কারও মিষ্টি কথা ও পরিপাটি বেশ-ভূষা দেখে তাকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমত্তা নয়।

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবি ﷺ বলেছেন—

> 'লজ্জা, সম্ভ্রম ও অল্প কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। অশ্লীলতা ও বাচালতা নিফাকির (মুনাফিকির) দুটি শাখা।' (জামে আত-তিরমিজি : ২০২৭)

ভীত ও সন্দেহপ্রবণ হওয়া : কথায় আছে—'চোরের মন পুলিশ পুলিশ' অথবা 'যার মনে যা, ফাল দিয়ে উঠে তা।'

বিশ্বনবির যুগে মুনাফিকরা মিথ্যা ঈমানের পর্দা দিয়ে নিজেদের অবিশ্বাসী অন্তরকে ঢেকে রাখত। তাই তারা খুব ভয়ের মধ্যে থাকত—এই বুঝি তাদের বিরুদ্ধে ওহি নাজিল হলো! কোথাও কোনো জনসমাগম হলে তারা ভাবত, তাদের নিয়েই বুঝি আলোচনা হচ্ছে। ঈমানদাররা এই বুঝি তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল! এ ধরনের নানান আশঙ্কায় তারা সর্বদা ভীত থাকত।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ-

> 'একটু আওয়াজ হলেই এরা সেটা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।' (সূরা মুনাফিকুন : ০৪)

এখানে তাদের অপরাধী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই আয়াতের আলোকে আজকের দিনের মুনাফিকদের চিনে নেওয়া খুবই সহজ। দেখবেন, কিছু মানুষ সারাক্ষণ ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

قُلِ اسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ-

> 'হে নবি! তাদের বলে দাও—"বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছ, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।"' (সূরা তাওবা : ৬৪)

অহংকারী ও দাম্ভিক : মুনাফিকদের যখন বলা হতো—তোমরা আল্লাহর নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাও, তখন তারা এটাকে নিজেদে জন্য অপমানজনক মনে করত। তারা দাম্ভিকতার সাথে এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করত।

কুরআন বর্ণনা করেছে—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَ
رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ-

'যখন তাদের বলা হয়—এসো, আল্লাহর রাসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেন, তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয়। আর তুমি দেখবে, তারা অহমিকাভরে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ত।' (সূরা মুনাফিকুন : ০৫)

অহংকারের দুটি প্রধান চিহ্ন হচ্ছে—নিজেকে বড়ো মনে করা এবং সত্যকে গ্রহণ না করা। মুনাফিকরা ইসলামকে সত্য বলে জানার পরও গ্রহণ করত না। তাদের উক্তি ছিল এমন—

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ-

'তারা বলে—"এবার আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে সম্মানীরা (ইজ্জতওয়ালা) নীচুদের বের করে দেবে।"' (সূরা মুনাফিকুন : ০৮)

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফেরার সময় মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুসলিমদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছিল। কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন সে অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে এই আয়াতটি নাজিল হয় এবং মুনাফিকদের দাম্ভিকতা ও মিথ্যাচার ফাঁস হয়ে পড়ে।

জায়েদ ইবনে আরকাম ﷺ বলেন—

'আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এই কথা (যা সে গোপনে বলেছিল) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করল, তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক তিরস্কার করলেন। এমনকী আমার মনে হলো—রাসূল ﷺ ও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন।

এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো—যা জীবনে আর কখনো হয়নি। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। পরে এ আয়াতগুলো নাজিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেন—"ছেলেটার কান ঠিকই শুনেছিল। আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।"'
(সিরাতে ইবনে হিশাম)

দান করতে চায় না : মুনাফিকদের আরেকটা স্বভাব হলো—তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চায় না। দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে চায় না। দান করাকে তারা জরিমানা মনে করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا-

'এরাই তো সেই সব লোক—যারা বলে, "আল্লাহর রাসূলের সাথিদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও—যাতে তাঁরা সরে পড়ে।"'
(সূরা মুনাফিকুন : ০৭)

মদিনার মুনাফিকরা মুসলিমদের কটাক্ষ করে এরূপ কথা বলত। কারণ, আনসাররা হিজরতকারী মুহাজিরদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করত। মুনাফিকরা চাইত—যাতে এই সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমান সময়েও এই ষড়যন্ত্র চালু রয়েছে। অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন নির্যাতিত মুসলিম দেশগুলোতে সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধের জন্য অনেক নামধারী মুসলিম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামি সংস্থাগুলোর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যও কিছু মুসলিম নামধারী কর্তাব্যক্তি তৎপর। এগুলো মুনাফিকি কাজ। এগুলো বর্জন করতে হবে; নয়তো আমরাও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে যাব।

আমাদের উচিত সুস্থ-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যথাসম্ভব সাধ্যমতো আল্লাহর পথে দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ
رَبِّ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-
وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে—"হে আমার রব! তুমি আমাকে আরও কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।" অথচ যখন কারও সুযোগের সময় শেষ হয়, তখন আল্লাহ তাকে আর অবকাশ দেন না। তোমরা যা কিছু করো, সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।' (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)

কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব : ইসলাম আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। সবার আগে মানবতা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়। ইসলাম যেমন সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের (Religious Co-Existence) কথা বলেছে, একই সঙ্গে কাফিরদের দ্বীন ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে নিষেধ করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা দ্বীন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাফিরদের ভালোবাসতো। গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখত এবং তাদের অনুসরণ করত।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কড়া সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আর যেসব মুনাফিক ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু বানায়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে—এ সুসংবাদটি তাদের জানিয়ে দাও।' (সূরা নিসা : ১৩৮)

এখানে বন্ধু বলতে ওই সকল অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বোঝায়—যাদের দ্বারা অন্যরা সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবিত হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমরা মুসলিমরা অনুসরণীয় বন্ধু হিসেবে কাফিরদেরই গ্রহণ করেছি। তাদের নিয়ম-নীতিকেই সঠিক ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে ধরে নিয়েছি—যা মুসলিমের জন্য মোটেই উচিত না। এসব মুনাফিকের চরিত্র। আমাদের সতর্ক হতে হবে।

লোক দেখানো নামাজ : ইসলামের অন্যতম একটি প্রধান স্তম্ভ হলো নামাজ। যার নামাজ নেই, তার ঈমান নেই। কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে নামাজের হিসাব চাইবেন। ঈমান আনার পরই নামাজ কায়েমের হুকুম। কিন্তু নামাজের গুরুত্ব এত বেশি কেন?

নামাজ মুসলিমদের জন্য একটি প্রশিক্ষণস্বরূপ। ইসলাম একজন মানুষের মধ্যে যে সকল গুণের সমন্বয় ঘটাতে চায়, তার জন্য অন্যতম প্রধান ট্রেনিং প্রোগ্রাম হলো নামাজ। এতে সংঘবদ্ধভাবে অঙ্গ সঞ্চালনের (যেমন : রুকু, সিজদা ইত্যাদি) মাধ্যমে শারীরিক কসরত হয়, আধ্যাত্মিকতার চর্চা হয়, আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভূত হয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ (Complete Submissiveness) প্রদর্শিত হয়। আর সময়মতো সকল নামাজ নিয়মিত পড়া নিঃসন্দেহে কঠিন একটি কাজ। কিন্তু একজন মুসলিম যখন এই কঠিন কাজটিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্যান্য দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে আদায় করাটা তার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ-

'সবর ও সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য তালাশ করো। বিনয়াবনত ছাড়া অন্যদের জন্য নিঃসন্দেহে এ কাজ বড়োই কঠিন।'
(সূরা বাকারা : ৪৫)

একজন সৈনিকের মূল কাজ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে দেশকে নিরাপদ রাখা। কিন্তু এ কাজে নিজেকে সক্ষম করার জন্য তাকে প্রতিদিনই কিছু প্রশিক্ষণমূলক কাজ করতে হয়। তেমনিভাবে একজন মুসলিমকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা সঠিকভাবে পালনে নিজেকে সক্ষম রাখার জন্য নামাজ অন্যতম একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সময়মতো মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহর নবি ﷺ-এর জামানায় সাহাবিরা আজান হলেই সব কাজ ফেলে মসজিদে চলে যেতেন। তাঁরা সবার আগে মসজিদে যাওয়া এবং সবার পরে মসজিদ হতে বের হওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁরা এটা করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। নামাজ তাঁদের মাঝে নবপ্রাণ সঞ্চার করত।

কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এটা ছিল একটা আজাবের মতো। তাদের পরিচয় প্রকাশ হওয়ার ভয়ে তারা বাধ্য হয়ে নামাজে যেত। কেননা, কোনো মুসলিমের জন্য নামাজের সময় মসজিদে না যাওয়াটা ছিল অকল্পনীয়। তাই মুনাফিকরা চরম বিরক্তি নিয়ে কোনোরকম মসজিদে হাজিরা দিত।

وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا -

'আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।'
(সূরা নিসা : ১৪২)

তাই আল্লাহ তায়ালা এই সকল মুনাফিক নামাজিদের জন্য দুর্ভোগের আভাস দিয়েছেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ -

'তারপর সেই নামাজিদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফিলতি করে, যারা লোক দেখানো কাজ করে।'
(সূরা মাউন : ৪-৬)

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো—মুনাফিকদের এই রোগগুলো আমাদের মাঝে জেঁকে বসেছে। আজ অধিকাংশ মুসলিমই সময়মতো নামাজ পড়ে না। অনেকে এক ওয়াক্ত পড়ে তো চার ওয়াক্ত পড়ে না। অনেকে সপ্তাহে শুধু জুমার নামাজটা পড়ে। অনেকে পড়ে শুধু রমজান মাস এলে। এই হলো বর্তমান সময়ের মুসলিমদের অবস্থা। ইসলাম আমাদের কীভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, আর আমরা কী করছি? আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কাদের সাথে মিলে যাচ্ছে? ঈমানদারদের সাথে নাকি মুনাফিকদের সাথে? অথচ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো বিনয়ের সাথে নামাজ পড়া। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ -

'নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত।'
(সূরা মুমিনুন : ১-২)

সাহাবায়ে কেরাম যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া জামাত তরক করাকেও মুনাফিকের আলামত বলেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন—আমরা মনে করি সর্বজনবিদিত মুনাফিক ছাড়া কেউই জামাতে নামাজ আদায় ছেড়ে দেয় না।

অথচ রাসূল ﷺ-এর যুগে এমন ব্যক্তি জামাতে উপস্থিত হতো— যাকে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে নামাজের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। (মুসলিম : ১৩৭৪)

তা ছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন—

'মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে কষ্টকর নামাজ হলো এশা আর ফজরের নামাজ।' (সহিহ বুখারি : ৬৫৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন তাকবিরে উলার সঙ্গে (নামাজ শুরুর তাকবিরের সঙ্গে) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, তার জন্য দুটি নাজাত লিপিবদ্ধ করা হলো; এক. জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং দুই. মুনাফিকি হতে মুক্তি।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৪১)

অর্থাৎ, নামাজে অলসতা করা হলো মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য যেকোনো মূল্যে নামাজে অলসতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

সর্বদা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে : মুনাফিকরা সব সময় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। ডানে যাবে না বাঁয়ে যাবে, এর সাথে থাকবে না ওর সাথে থাকবে—এসব নিয়ে সংশয়ে থাকে। তারা সহজে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। দুই নৌকার মধ্যে দুই পা রাখলে কারও অবস্থা যেমন হয়, তাদের অবস্থাও ঠিক তেমন। প্রবাদ বাক্যে বলা হয়—'নেহি ইধর নেহি ওধর, দারমিয়ান মে সদর বদর।'

পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদে তাদের এই স্বভাবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا -

'তারা কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে; না পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তার জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না।'
(সূরা নিসা : ১৪৩)

সুবিধাবাদী ও ফাঁকিবাজ : তাদের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—যেখানে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত, সেখানে তাদের পাওয়া যায়। আর যেখানে সেক্রিফাইসের প্রয়োজন পড়ে, সেখানে তাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায় না। পঞ্চম হিজরিতে সংগঠিত বনু মুস্তালিকের অভিযানে প্রায় সকল মুনাফিক অংশগ্রহণ করেছিল। কারণ, এই অভিযানের দূরত্ব কম এবং বিজয় ছিল নিশ্চিত। অপরদিকে, নবম হিজরিতে তাবুক যুদ্ধ ছিল গ্রীষ্মকালে। পাশাপাশি সফরের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। তাই মুনাফিকরা মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ-

'হে নবি! যদি সহজ লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং সফর হালকা হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়োই কঠিন হয়ে গেছে। এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে—"যদি আমরা চলতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম।" তারা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা তাওবা : ৪২)

মদিনায় মুনাফিকরা বিপুল সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিল। দুই-একজন ছাড়া তাদের প্রায় সবাই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যখন মদিনায় পৌঁছল এবং জনবসতির একটি বড়ো অংশ পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানি জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন এ শ্রেণিটি পড়ল উভয়সংকটে।

তারা দেখল, ইসলাম তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাংশ, এমনকী তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ঈমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কুফরির ঝান্ডা উত্তোলিত করে রাখে, তাহলে সমাজে তাদের নেতৃত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি—সবকিছুই হারিয়ে যাবে। মদিনায় থাকাবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে, তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে; এমনকী নিজেদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে।

আর যদি তারা মদিনা ত্যাগ করে, তাহলে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে।

অন্যদিকে কুফরির প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারত। এ উভয়সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদিনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামাজ পড়ত এবং জাকাতকে জরিমানা ভেবে হলেও অগত্যা আদায় করত। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, কোনো না কোনো বহিরাগত দুশমনের সাথে পাঞ্জা কষাকষি এবং জান ও মাল কুরবানির যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে—তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশি অস্থির ছিল, যদি তারা সাধারণ কোনো সুড়ঙ্গ তথা কোনো গর্তও দেখতে পেত এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভবনা থাকত, তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। (ইবনে কাসির)

তাদের এই মানসিক অবস্থার কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তুলে ধরেছেন–

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ-

'যদি তারা কোনো আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোনো গিরি-গুহা কিংবা ভেতরে প্রবেশ করার মতো কোনো জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।' (সূরা তাওবা : ৫৭)

ভালো কাজের নিষেধ এবং মন্দ কাজের আদেশ : আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদের 'খইরু উম্মাহ' বা (The best among nations) শ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, আমরা ভালো কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজের নিষেধ করি। কিন্তু মুনাফিকদের স্বভাব হলো ঠিক তার উলটো। তারা ভালো কাজ থেকে মানুষকে বারণ এবং অশ্লীল ও অকল্যাণকর কাজে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۘ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভালো কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন।' (সূরা তাওবা : ৬৭)

যুগে যুগে মুনাফিকদের আগমন ঘটবে। ইসলামকে রুখে দেওয়ার জন্য তারা চক্রান্তের জাল বুনবে। কিন্তু এই দ্বীন ইসলাম আল্লাহর। তিনিই এর রক্ষাকর্তা। দুনিয়ার কারও ক্ষমতা নেই এই দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার। আমাদের মধ্যে মুনাফিকের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে আমরা যেন আল্লাহর কাছে তওবা করি। নিজের জীবন থেকে তা দূর করার চেষ্টা করি।

নিফাক তথা কপটতা অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। কপট মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থেকে মানুষ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। তারা অনেকটা ভাইরাসের মতোই; সমাজে কেবল বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্বের জীবাণু ছড়ায়। মানুষে মানুষে সংঘাত তৈরি করে। তারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজের জন্য হুমকি ও মূর্তিমান আতঙ্ক। তাই তারা ঘৃণ্য ও বর্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে নিফাকির জঘন্যতা থেকে মুক্ত রেখে শুদ্ধ আলোকিত জীবনযাপনের তাওফিক দিন।

উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি

জীবনের বিচিত্র রূপ। নানা বর্ণ ও গন্ধে পূর্ণতা পায় জীবনের পরিধি। কথায় আছে—জীবন সর্বদা এক রকম যায় না। জীবনে উত্থান-পতন (Ups & Downs) থাকবেই। জীবনে বদল আছে, পরিবর্তন আছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। এটাই জীবনের নিয়ম। যে জীবনের বদল নেই, তা একঘেয়ে, বিরক্তিকর। জীবন অনেকটা বহতা নদীর মতো সদা ধাবমান, বহমান। হাজারো পরিস্থিতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবন-নদী।

প্রকৃতিতে যেমন ঋতুর পালাবদল ঘটে, তেমনি জীবনেও অবস্থার বদল হয়। সুখ ও আনন্দের শিহরন যেমন থাকে, তেমনি কষ্ট ও দুঃখের রোদনও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আশার আলোয় যেমন জীবন আলোকিত হয়, তেমনি হতাশার কালো মেঘেও ঢেকে দেয় জীবন-প্রদীপ। তবে কোনো পরিস্থিতিই মানবজীবনে স্থায়ী নয়। জীবনে সবকিছুই সাময়িক। তাই সুখের সাগরে যেমন আকণ্ঠ ডুবে যেতে নেই, তেমনি দুঃখের সাহারাতেও মনোবল হারাতে নেই। মনে রাখতে হবে—আঁধার কেটে রাঙা প্রভাত আসবেই, মেঘভাঙা রোদে উদ্ভাসিত হবেই জনপদ।

কালের উত্থান-পতন নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۚ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

'এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে একই ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধীপক্ষের গায়েও। এ তো কালের উত্থান-পতন! মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। আর এই অবস্থাটি তোমাদের ওপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান—তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তাদের বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাক্ষী হবে। কেননা, জালিমদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।' (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

হতাশাও জীবনের একটি রূপ মাত্র; একমাত্র নয়। হতাশা যেমন জীবনের বাস্তবতা, তেমনি হতাশার অবসানও জীবনের বাস্তবতা। কষ্টের পরে সুখ—এটাই জীবনের নিয়ম।

বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন যেন অনেকটাই নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে। জীবনের রং, গন্ধ তাদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। হতাশার নিকষকালো অন্ধকার গ্রাস করছে সবুজে ভরা জীবনকে। এ জীবন তো কোনো মিছে খেলাঘর নয়। নির্মম বাস্তবতা অনেক সময় ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে আনে। আর হতাশাগ্রস্ত মন ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। অথচ জীবন এখানেই থেমে যাওয়ার মতো ছিল না। সুবহে সাদিকের মতো করে লাল আভার আলোকচ্ছটা একটু পরেই রাঙিয়ে দিতে পারত অন্ধকারকে। হতাশা সে পথ খোলা রাখেনি। হতাশা জীবনকেই যেন কেড়ে নেয়, বাঁচতে দেয় না; দেয় না পৃথিবীর মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে।

কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে হতাশার এই কালো অক্টোপাসের করাল গ্রাস থেকে? নিস্তারের উপায়ই-বা কী?

অনেকেই মনে করেন, বিষণ্নতা ও হতাশা একই বিষয়। মূলত তা নয়। বিষণ্নতা আমাদের একটা আবেগ মাত্র, যার স্থায়িত্বকাল সর্বোচ্চ চৌদ্দ দিন পর্যন্ত। কিন্তু হতাশা একটি সাইকোলজিক্যাল ডিজ-অর্ডার, যা প্রফেশনাল হস্তক্ষেপ ব্যতীত পুরোপুরি দূর করা যায় না। বিষণ্নতায় ভোগা লোকেদের রাগ, অসুখী ভাব, ক্ষোভ ইত্যাদি অনুভূতি প্রকাশ পায়, কিন্তু হতাশায় আচ্ছন্ন লোকেরা জীবনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। যেন হঠাৎ করে থেমে যায় জীবন-নদীর নৌকা। পালে লাগে না হাওয়া। ফলাফলে তারা নিজেদের শেষ করে দেয় চিরতরে।

তাহলে কারা এই হতাশা নামক রোগে আক্রান্ত?

হতাশা অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে সব মানুষকে কমবেশি ঘায়েল করে। তবে সাধারণত তরুণ প্রজন্মের মাঝেই বেশি দেখা যায়; অথচ তারাই জাতির মূল চালিকাশক্তি। তাদের ওপর ভর করেই একটা জাতি দাঁড়ায়। যে জাতির তরুণ প্রজন্ম হতাশাগ্রস্ত ও আশাহত, সে জাতির কপালে দুর্দশা অনিবার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তরুণ প্রজন্মের মাঝেই হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত তরুণদের মাঝে হতাশার মাত্রা আরও বেশি। তারা বিভিন্ন কারণে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। আর বিষণ্নতা থেকেই সৃষ্টি হয় হতাশা। হতাশা কখনো চরম মাত্রায় পৌঁছে। কেউ কেউ বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাবে—বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, অর্থাৎ সংখ্যাটি এক বছরে প্রায় ৮ লাখ। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে হতাশা বিশ্বের অন্যতম বড়ো একটা অসুখে রূপ নেবে। ফলে, আত্মহত্যার মাত্রাও বাড়বে ভয়াবহরূপে।

বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যমতে—বাংলাদেশে গড়ে এক লাখে ৪০ জন আত্মহত্যা করে, যার বেশিরভাগই বয়সে তরুণ এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাটাই বেশি। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হারটা খুবই আশঙ্কাজনক।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে—সারা বিশ্বে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার ৫০ শতাংশের কারণ হতাশা। হতাশা জীবন সম্পর্কে অনীহার সৃষ্টি করে। বেঁচে থাকার অনাবিল আনন্দ কেড়ে নেয়। ফলে হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকতে চায় না। তাই হতাশা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা।

কিন্তু তরুণদের এই মানসিক অস্থিরতাগুলো আমরা সহজে ধরতে পারি না। অনেকেই ভাবেন, মানসিক সমস্যা বা অস্থিরতার অর্থ হলো—ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। বিষয়গুলো অনেকটা সামাজিক ট্যাবুর মতো।

হতাশ তরুণরা পরিবার ও সমাজকে তাদের পাশে পায় না। ফলে তারা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে। আবার আমাদের সমাজে তথাকথিত অনেক মোটিভেশনাল স্পিকার আছে, যারা তরুণদের মোটিভেশন দিতে গিয়ে অতিমাত্রায় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী করে তুলছে। দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাদের আত্মা মরে যাচ্ছে। আদতে এই বস্তাপচা মোটিভেশনগুলো আত্মার প্রশান্তি এনে দেওয়ার পরিবর্তে আত্মাকে করছে কলুষিত। ফলাফল—হতাশা, মেন্টাল ডিজ-অর্ডার।

তাই আমাদের এর সমাধান খুঁজতে হবে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে শুধু ধর্মীয় কথার ওপর নির্ভর করলেও এই গুরু-সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, গভীর ডিপ্রেশনাল ডিজ-অর্ডারের ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। তবে ইসলামিক নীতিগুলো মেনে চললে হতাশা ও বিষণ্নতা অনেকাংশেই কমে যায়। কারণ, ইসলাম প্রকৃত জীবনবোধ শিক্ষা দেয়—যা মানুষের ভেতর স্পিরিচুয়াল প্রশান্তি জোগায়। আর এই প্রশান্তি হতাশার মুখে স্থায়ী কুলুপ এঁটে দেয়।

২০১৯ সালে জার্মান একদল মনোবিজ্ঞানীর প্রকাশিত গবেষণা বলছে—

> 'মুসলিমরা তাদের জীবন নিয়ে অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে সন্তুষ্ট। কারণ, তারা সবচেয়ে বেশি একাত্মবাদে বিশ্বাস করে।'

সর্বপ্রথম আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে, এই পৃথিবীটা পরম সুখ-শান্তির জায়গা না। পৃথিবী একটি পরীক্ষাক্ষেত্র, যার সময়কাল খুবই ক্ষণস্থায়ী। আরেকটি গন্তব্যে যেতে আমরা তো পৃথিবীতে শুধু দুদিনের মুসাফির (We are here in a very short transition period)। এটি জীবনের যাত্রাপথে একটি বিরতি মাত্র। এই জীবনের সুখ-দুঃখ কোনোটিই স্থায়ী নয়।

মহামহিম আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ-

> 'নিশ্চয় আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।'
> (সূরা বালাদ : ০৪)

একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবীর দুষিত পরিবেশে পতিত হয়। এখান থেকেই কষ্টের শুরু। এরপর ধারাবাহিকভাবে একের পর এক কষ্টের মধ্য দিয়ে যাপিত হয় মানবজীবন। কষ্ট, অভাব, না পাওয়া—সবই জীবনের অপরিহার্য অনুসঙ্গ। এগুলো ছাড়া জীবন কখনোই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ-

> 'আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনীহা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করব। এ অবস্থায় যারা সবর করে, আপনি তাদের সুসংবাদ দিন।'
> (সূরা বাকারা : ১৫৫)

সুতরাং সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ নিয়েই মানুষের জীবন। এগুলোকে সাথে নিয়েই জীবনপথ পাড়ি দিতে হয়। দিনের আলো শেষে যেমন রাতের নিকষকালো অন্ধকার নেমে আসাটাই স্বাভাবিক, তেমনই বিপদাপদও মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা।

কিন্তু আমরা অনেকেই এই স্পষ্ট সত্যটি মেনে নিতে চাই না। অলীক সুখের আশায় এই দুনিয়ার মরীচিকার পেছনে লাগামহীন ছুটতে থাকি। দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদে পতিত হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো– এহেন পরস্থিতিতে আমরা অনেকে আল্লাহকেই ভুলে যাই! বলে বসি—'আল্লাহ যদি থাকেই, তবে কেন এত অবিচার?' 'আমার ওপরেই কেন এত বিপদ?' 'কেন আমার সাথেই সব সময় এমন হয়?' আসতাগফিরুল্লাহ! কী ভয়ানক চিন্তা লালন করি আমরা!

আচ্ছা, নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন তো, বছরে মোট অসুস্থ ছিলাম কয়দিন? মাসে না খেয়ে ছিলাম কয়দিন? উত্তর হচ্ছে—সুস্থ ছিলাম বেশি আর অসুস্থ ছিলাম হাতেগোনা অল্প কয়েকটা দিন মাত্র। কখনো হয়তো অভুক্ত অবস্থায় থাকিইনি, তারপরও জীবন নিয়ে আমাদের হাজারটা অভিযোগ। 'কেন এমনটা হলো না? কেন ওটা পেলাম না। আমার ভাগ্যটাই একটা কুফা।' মনে রাখবেন, আপনি যে অবস্থানে থেকে স্রষ্টার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, ওই অবস্থানটা অনেকের কাছে রঙিন স্বপ্ন। আপনি যা পেয়েও খুশি হতে পারেননি, সেটা অর্জনের জন্য অনেকে দিন-রাত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাই হতাশ হওয়া যাবে না। শোকরগোজার হতে হবে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অন্ধকার ছাড়া যেমন আলোর কোনো অস্তিত্বই নেই, তেমনই দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সুখের অনুভূতিরও অস্তিত্ব নেই। ক্ষুধা না থাকলে যেমন খাবারের মূল্য বোঝা যায় না, তেমনই কষ্ট না থাকলে সুখের অনুভূতিও উপলব্ধি হয় না। সুখ ও দুঃখ তাই একে অন্যের পরিপূরক।

এবার সুখ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। সুখ সাধারণত তিন প্রকার—

ক. মিছে সুখ : অনেকেই জীবনের দুঃখ-কষ্টকে ভুলতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মদ, গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি সেবন করে। বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়। তারা ভাবে—এর মাধ্যমেই তার সকল দুঃখ-কষ্ট, যাতনা মুছে যাবে। কিন্তু এসব মিথ্যা সুখানুভূতি ছাড়া কিছুই না; না কোনো স্থায়ী সমাধান (Permanent Solution)।

৫. ক্ষণস্থায়ী সুখ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সুখ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দুনিয়ার জীবনের সুন্দর উপমা এঁকেছেন। তিনি বলেছেন—

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ۔

'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়; যেমন একটি বৃষ্টির অবস্থা—যার সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়।' (সূরা হাদিদ : ২০)

নশ্বর পৃথিবীতে যদি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা, সম্পদ, খ্যাতির প্রাচুর্য থাকে, কিন্তু চিরস্থায়ী পরকালে কিছুই না থাকে, তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সুখ দিয়ে কী লাভ হবে? আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের পাল্লায় পড়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের নাটাইকে হাতের নাগালের বাইরে ছেড়ে দিই। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী সুখের ধোঁকায় আমরা যেন না পড়ি, তাই আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে—

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۔ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى۔

'কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো; অথচ আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।' (সূরা আ'লা : ১৬-১৭)

৬. প্রকৃত সুখ : একজন মানুষ প্রকৃত সুখের দেখা পেতে পারে কেবল জান্নাতেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ۔

'অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

পরকালে জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তিই প্রকৃত সফল ও সুখী। বড়ো কিছু অর্জনের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয়। পরকালীন সাফল্যের জন্য দুনিয়ার এই বিপদ-মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মাত্র। পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হলে রয়েছে পুরস্কার, আর অকৃতকার্য হলে রয়েছে কঠিন শাস্তি!

তাই বিপদ-মুসিবত আমাদের জীবনের মৌলিক সমস্যা না; বরং স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের জন্য প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো—কীভাবে এই সংকটগুলোকে মোকাবিলা করব? এখন আমরা সেই কৌশলগুলো শেখার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। তার পূর্বে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নেওয়া যাক।

জীবনের লক্ষ্য

প্রত্যেক কাজের পেছনেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি আমাদের সৃষ্টির পেছনেও আল্লাহ তায়ালার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। নিছক খেয়ালি মনে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ-

'এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই আছে—এগুলো আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।' (সূরা আম্বিয়া : ১৬)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ-

'তোমরা কি মনে করেছ, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?' (সূরা মুমিনুন : ১১৫)

তিনি আবার বলেছেন—

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

'কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।' (সূরা মুলক : ০২)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

'জিন ও মানুষকে আমি শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে।' (সূরা আজ-জারিয়াত : ৫৬)

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য একটাই—আল্লাহর ইবাদত করা। আর ইবাদতের অর্থ হলো—আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই জীবনযাপন করা। তিনি যে পরিস্থিতিতে আমাদের রাখেন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা। এটাই আমাদের গোলামি। এভাবে তাঁর সন্তুষ্টির ওপর জীবন কাটাতে পারলেই পরকালে রয়েছে অনন্তকালের অনাবিল সুখ ও শান্তি!

আল্লাহ যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, যদি আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক থাকে, তবে এই দুনিয়ায় হারানোর আর কিছু নেই। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার! আমরা অনেকেই দুনিয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দিই। ফলে দুনিয়ার সামান্য ক্ষতিতেই যারপরনাই ভেঙে পড়ি। মনে করি, সবই তো শেষ হয়ে গেল। আদতে কিছুই শেষ হয় না।

সুতরাং দুনিয়াতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য (Aim in life) হবে আল্লাহর গোলামি করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালে জান্নাত পাওয়া। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি আমাদের কোনো দুনিয়াবি লক্ষ্য থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তবে সেটাও হবে আল্লাহর দেখানো পন্থায় এবং উম্মাহর খেদমতের স্বার্থেই। দুনিয়ায় পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর গোলামি করার জন্য জাহেলিয়াতের বিপরীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। আর এজন্যই দুনিয়াবি যোগ্যতা অর্জন এবং ক্যারিয়ার গঠন করতে হবে। তবে এটা জীবনের মূল লক্ষ্য নয়; বরং উপলক্ষ্য হতে পারে।

এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো—

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا-

'আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না।' (সূরা কাসাস : ৭৭)

আমাদের জীবন শুধু দুনিয়াকেন্দ্রিক যেন না হয়। দুনিয়াকে আমরা বশ করব, দুনিয়াকে আমরা রাজ করব, দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় কবজা করব; কিন্তু হৃদয়ে স্থান দেবো না। হৃদয়ে স্থান দেবো আখিরাতকে। লক্ষ্য যদি হয় আখিরাত, তবে ইহকাল-পরকাল দুটোই পাওয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু লক্ষ্য শুধু দুনিয়া হলে ইহকালে সফল হলেও আখিরাতে কিছুই থাকবে না; পেতে হবে শাস্তি, ভোগ করতে হবে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

'যারা কেবল দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে, তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই দিয়ে দিই এবং এ ব্যাপারে তাদের কম দেওয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে) যা কিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে, সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' (সূরা হুদ : ১৫-১৬)

মুসলিম চোখে বিপদাপদ

মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি—দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ একটা অনিবার্য ব্যাপার। এসব জীবনেরই অংশ। এখন প্রশ্ন হলো—যদি আমরা কোনো বিপদাপদের মুখোমুখি হই, তখন কীভাবে একে মোকাবিলা করব? এর থেকে উত্তরণের উপায়ই-বা কী?

আল্লাহর পক্ষ হতে বিপদাপদ আসতে পারে দুইভাবে।

ক. শাস্তিস্বরূপ : আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিকে সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের অনেক আয়াতে এসবের বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত ﷺ-এর কওমের ঘটনা খুব সুপ্রসিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা পাপের শাস্তিস্বরূপ বিপদের প্রসঙ্গে বলেন—

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ-

'তারপর যখন আমার ফয়সালার সময় এসে গেল, তখন গোটা জনপদটি উলটে দিলাম এবং তার ওপর পাকা মাটির পাথর অবিরামভাবে বর্ষণ করলাম।' (সূরা হুদ : ৮২)

সুতরাং আমাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো নিজেদেরই কর্ম। অনেক বিপদ আমাদের হাতের কামাই। তাই কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হলে আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় পাপ কাজ হতে নিজেকে নিবৃত রাখা। তাহলে আল্লাহ আমাদের মাফ করে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর একমাত্র আল্লাহই পারেন সকল বিপদ-মুসিবত থেকে আমাদের রক্ষা করতে। তিনি ভিন্ন অন্য কারও সেই ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

'হাতের কামাইস্বরূপ মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়; হয়তো তারা বিরত হবে।' (সূরা আর-রুম : ৪১)

খ. পরীক্ষাস্বরূপ : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দাকে ভালো-মন্দ দুই পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার মাধ্যমেই আসল-নকল চেনা যায়। সোনাকে যতই আগুনে পোড়ানো হয়, তা ততই খাঁটি হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ-

'আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' (সূরা বাকারা : ১৫৫)

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ-

'তারা কি লক্ষ করে দেখে না যে, প্রতিবছর তাদের ওপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এরপরও তারা তওবা করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না।' (সূরা তাওবা : ১২৬)

তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে যদি বিপদাপদ আসে, তবে আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

'(হে নবি) বলো, হে আমার সেসব বান্দা, যারা ঈমান গ্রহণ করেছ! তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়ো। ধৈর্যশীলদের তো অঢেল পুরস্কার দেওয়া হবে।' (সূরা জুমার : ১০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

'হে ঈমানদাররা! সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা : ১৫৩)

সুতরাং বিপদাপদের সময় ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আবু ইয়াহইয়া সুহাইব ইবনে সিনান ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

> 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখে পৌঁছলে সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।' (মুসলিম : ২৯৯৯)

দুঃখ-কষ্টকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার জন্য ইসলাম কিছু কৌশল আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। এবারে সেগুলো সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

দুঃখ-কষ্টকে জীবনের অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া : প্রথমেই আমাদের এ বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এ জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই বাস্তবতা মেনেই পথ চলতে হবে। তাহলে দুরবস্থা মোকাবিলা করার একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকবে।

নবি-রাসূলগণ বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সান্ত্বনাও দিতেন। যেমন : কাফিররা যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করত, তখন রাসূল ﷺও মর্মাহত হতেন। দুশ্চিন্তায় নিপতিত হতেন। তখন আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا-

> 'হে মুহাম্মাদ! যদি এরা এ কথার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।' (সূরা কাহাফ : ০৬)

কুরাইশদের বড়ো বড়ো কাফির সরদাররা বিশ্বনবির বিরুদ্ধে মিথ্যার ঝড় সৃষ্টি করেছিল। তারা ভালোভাবেই জানত এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মজলিশে এ কথা স্বীকার করত, নবি ﷺ-এর বিরুদ্ধে তারা যেসব অপবাদ দিচ্ছে, সেগুলো একেবারেই অমূলক, ভিত্তিহীন। তবুও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে তারা পিছপা হতো না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবিকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন—

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ-

> 'এদের তৈরি কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।' (সূরা ইয়াসিন : ৭৬)

উহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের ফলে সাহাবিদের অনেকে মনমরা এবং কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে কুরআনের আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ-

'মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে—যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এ ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধীপক্ষের গায়েও। এটা তো কালের উত্থান-পতন; মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯-১৪০)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো নবি-রাসূলগণ। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তাঁদেরও আল্লাহ বিপদ-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন; আর আমরা তো সাধারণ মানুষ! আমাদের বিপদ-মুসিবত আসবে না—এটা একটা নিছক অযৌক্তিক কল্পনা!

পৃথিবী যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এর বিপদাপদও ক্ষণস্থায়ী। আর ক্ষণস্থায়ী বিপদ কোনো বিপদই না! আঁধারকে যেমন সূর্যের আলো মিটিয়ে দেয়, তেমনি একদিন এই দুঃখগুলোকেও আল্লাহ জীবন থেকে মুছে দেবেন।

আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাস রাখা : পরিস্থিতি যত খারাপই হোক না কেন, আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাস আমাদের মানসিক প্রশান্তি দেবে। মনে রাখতে হবে, আমার সাথে যা কিছুই ঘটছে, তা আল্লাহর পর্যবেক্ষণে আছে। আল্লাহ সব দেখছেন। আর একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। বিপদের মধ্যেও তিনি কোনো পরিকল্পনা রেখেছেন। এর ফলাফল পরে আমরা বুঝতে পারব। যেমন : কোনো কারণে আপনি কোথাও যাওয়ার বাস মিস করলেন। এতে আপনার অনেক বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে গেল, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর জানলেন—বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ভেবে দেখুন তো, সামান্য এই বিপদ আপনাকে আরও কত বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা করেছে?

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে এ রকম—'خُطَّةُ اللهِ اَعْظَمُ مِنْ خُطَّتِنَا'-অর্থাৎ আল্লাহর পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পনার চাইতে অনেক বড়ো। আমরা অনেক সময় সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতে পারি না। সাময়িক কোনো সমস্যা আমাদের কাছে খুব বড়ো হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্ল্যানে কী আছে, আমরা সেটা জানি না। এমনকী সে পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে চাই না। তাই আমাদের মনোভাব (Attitude) এমন হওয়া উচিত—আমি আমার সবটুকু করেছি, বাকিটা আল্লাহ তায়ালা দেখবেন। বলা হয়—

'I do my level best,
Allah will do the rest.'

এটাই হচ্ছে আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের স্বরূপ।

বিপদের সময় মনে এই চেতনা বারবার জাগ্রত করতে হবে—আল্লাহ আমার সাথেই আছেন। তিনিই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবেন। হিজরতের সময় বিশ্বনবি ﷺ ও আবু বকর ﷺ পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। কাফিররা তাদের খুঁজতে খুঁজতে প্রায় গুহার মুখে এসে পৌছাল। আবু বকর ﷺ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন—দুশমনদের একজন যদি একটু ভেতরে ঢুকে উঁকি দেয়, তাহলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু নবিজি একটুও বিচলিত না হয়ে আবু বকর ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

পরবর্তী সময়ে সকল মুমিনদের জন্য এই ঘটনা উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ পেশ করেছেন এভাবে—

ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'যখন সে ছিল মাত্র দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়জন, যখন তাঁরা দুজন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তাঁর সাথিকে বলেছিল—"চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর মানসিক প্রশান্তি নাজিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন—যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বক্তব্যকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবা : ৪০)

তাকদিরের ওপর অটল বিশ্বাস রাখা : তাকদিরে বিশ্বাস রাখা ফরজ। এটি ঈমানের অংশ। তাকদিরে বিশ্বাসের বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে। দুঃখ-কষ্ট হতে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে এটি কার্যকর ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাকদির বা ভাগ্যে বিশ্বাস আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সৃষ্ট মানসিক কষ্ট হতে প্রশান্তি দেয়। আমরা চিন্তা করি, আল্লাহ এর বিনিময়ে হয়তো আমার জন্য কোনো কল্যাণ রেখেছেন।

বিপদাপদে পতিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ-

'পৃথিবীতে তোমাদের ওপর যেসব মুসিবত আসে, তার একটিও এমন নয় যে তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক, তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন না হও।' (সূরা হাদিদ : ২২)

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

'তাদের বলে দাও—আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরা তাওবা : ৫১)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

'আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনো কোনো মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন।' (সূরা তাগাবুন : ১১)

আমরা অনেক সময় কোনো বিপদ ঘটার পরে বলে ফেলি, কেন এমনটা করলাম? কিংবা যদি সে এটা না করত, তবে বেঁচে যেত! প্রিয়জনের মৃত্যু নিশ্চয়ই কষ্টের, কিন্তু এটাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। তাই এসব বলা উচিত নয়। এ ধরনের কথা মানসিক কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া এই মন্তব্যগুলো ভাগ্য সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করে। আল্লাহ এসব থেকে মুমিনদের সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনে হুঁশিয়ারি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَ اللّٰهُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

'হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কখনো সফরে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে) তারা বলে—"যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তাহলে মারা যেত না এবং নিহত হতো না।" এ ধরনের কথাকে আল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। নয়তো জীবন-মৃত্যু তো একমাত্র আল্লাহই দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৬)

সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা : তাওয়াক্কুল মানে আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করা। একজন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা নারী যেকোনো ভালো ও কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সকল ব্যাপারে নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় ইয়াকিন রাখবে—এটাই তাওয়াক্কুল। সে সর্বদা বিশ্বাস রাখবে, আল্লাহ তায়ালা যা লিখে রেখেছেন, ফলাফল তা-ই হবে। আর তাতেই রয়েছে চূড়ান্ত সফলতা ও কল্যাণ। এটাই তাওয়াক্কুলের মূলকথা।

তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না, নিরাশ হয় না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসিবত, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কোনো ক্রাইসিস মোমেন্টে মোটেও ঘাবড়ে যায় না। যেকোনো দুর্বিপাক, দুর্যোগ, সংকট, বিপদ-মুসিবতে আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকার অমানিশায় প্রত্যাশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। যত জুলুম, অত্যাচার,

নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড়-তুফান আসুক, কোনো অবস্থাতেই সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের জন্য যা লেখা রয়েছে, ঠিক তা-ই হবে; তাঁর চেয়ে এক বিন্দু বেশিও না, কমও না। সুতরাং আমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আমাদের কাজটুকু করে যাব, অতঃপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন বান্দারা আল্লাহ তায়ালার ওপরই তাওয়াক্কুল করে।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

'সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।' (সূরা আনফাল : ০২)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।' (সূরা তালাক : ০৩)

তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা মানে পস্তানো নয়। আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন, কিন্তু পস্তাতে বলেননি। অনেকে নিজেদের অপারগতা, দুর্বলতা, কর্মহীনতা ও অলসতাকে তাওয়াক্কুল বানিয়ে নিয়েছে। অপারগতা ও অলসতার নাম তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা নয়। তাওয়াক্কুল হলো পরিকল্পনা করা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় বের করা এবং বিভিন্ন উপায়-উপকরণের সাহায্য নিয়ে সে অনুযায়ী প্রাণান্তকর চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কর্মশেষে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। This is the mechanism of Tawakkul. This is the essence of putting your complete trust on Allah (SWT).

অপারগতা, দুর্বলতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সব সময় আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। আল্লাহর কাছেও দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে শক্তিশালী ঈমানদার উত্তম। (মুসলিম : ১৫২৬)

আমরা এই আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকলাম—আল্লাহ আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন; অথচ সেজন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতিজনিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিসের কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগই আমরা গ্রহণ করলাম না অথবা কোনো পড়াশোনা না করে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরীক্ষার হলে গিয়ে ঢুকলাম। এর নাম তাওয়াক্কুল নয়; এর নাম অলসতা, অপারগতা বা দুর্বলতা।

সিরাত থেকে জানতে পারি, বিভিন্ন সময়ে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতেন। এটা তাওয়াক্কুলবিরোধী নয়; বরং এটাই তাওয়াক্কুলের পূর্বশর্ত। বৈধ উপায়-উপকরণ বৈধ পন্থায় ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এগুলোর ওপর ভরসা করা যাবে না; বরং ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপর।

নবিজির হিজরতের কথাই ধরুন। মদিনা হলো মক্কা থেকে উত্তর দিকে। তিনি হিজরতের সময়ে মক্কা থেকে সরাসরি মদিনার দিকে (উত্তরে) না গিয়ে কৌশল অবলম্বন করে মদিনার বিপরীত (দক্ষিণ) দিকে সওর পর্বতে যান। শুধু তা-ই নয়; মক্কার মানুষ মদিনায় যাওয়ার জন্য সাধারণত যে পথ অবলম্বন করতেন, রাসূল ﷺ সে পথটি একেবারেই পরিত্যাগ করে অপরিচিত পথে রওয়ানা দেন—যাতে মক্কার কুরাইশরা তাঁকে না ধরতে পারে। তিনি রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে একেবারে গোপনে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন এবং একজন গাইডের সহায়তায় উপকূলীয় পথ ধরে মদিনায় গিয়ে পৌঁছেন।

আমরা যে পদ্ধতিতে তাওয়াক্কুল করি, রাসূল ﷺ যদি সেভাবে তাওয়াক্কুল করতেন, তাহলে হয়তো বলতেন—'আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর; আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম। আমি মূল রাস্তা দিয়েই যাব; সবার নাকের ডগার সামনে দিয়ে দ্বীনের আলোতেই মক্কা ত্যাগ করব। দেখি, আল্লাহর শক্তি বেশি নাকি মক্কার মুশরিকদের শক্তি বেশি।' কিন্তু না, তিনি এমনটা করেননি।

রাসূল ﷺ-এর তাকওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা চালাতেন

এবং কৌশল অবলম্বন করতেন; চেষ্টা না করে ভাগ্য আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন না। উহুদ যুদ্ধে তিনি একটার পর একটা করে দুটো বর্ম গায়ে দিয়েছিলেন। সায়েব ইবনে ইয়াজিদ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি বর্ম পরে জনসম্মুখে এসেছিলেন। (আবু দাউদ : ২৫৯০)

খন্দকের যুদ্ধের সময় পেটে পাথর বেঁধে সাহাবিদের সাথে নিয়ে পরিখা খনন করেছেন। এগুলো কোনোটাই তাওয়াক্কুলবিরোধী নয়; বরং এগুলোই তাওয়াক্কুলের প্রকৃষ্ট নমুনা। আর এভাবে তাওয়াক্কুল করলে হতাশা বা নিরাশা আর গ্রাস করতে পারে না।

যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা : মনের প্রশান্তিই প্রকৃত সুখ। আর আত্মতুষ্টি মনে প্রশান্তি আনে। আত্মতুষ্টির মৃদু বাতাস তখনই বইবে, যখন আপনার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু আজকাল আমরা যত পাই, তত চাই। ফলে আমাদের অন্তরও মরে যাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা কেবল নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করি। কে সুইজারল্যান্ডে হানিমুনে গিয়ে ফেসবুকে ছবি দিলো, কে আইফোন ১২ প্রোম্যাক্স কিনে ফেসবুকে ছবি দিলো, কে নতুন ব্র্যান্ডের লাক্সারিয়াস কার কিনল—এসব দেখি আর ভাবি, আহ! তারা কতই না সুখী! কী বস্তাপচা জীবন আমার, কিছুই পেলাম না! অথচ আমরা আশেপাশে তাকিয়ে দেখি না, মানুষ কী কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

সময় পেলে হাসপাতালের বার্ন ইউনিটগুলো ভিজিট করে আসুন। দেখে আসুন, আগ্নিদগ্ধ মানুষগুলো কীভাবে কাতরাচ্ছে। ক্যানসারে আক্রান্ত লোকদের দিকে একটু তাকান, আহা! দেখুন, কী করুণ তাদের বাঁচার আকুতি! অনাথ আশ্রমের শিশুদের দিকে একটু চোখ দিন; যারা জানেই না—কে তাদের বাবা, কে তাদের মা!

রাস্তায়, ফুটপাতে, রেলস্টেশনে কত মানুষ অনাহারে ঠিকানাহীনভাবে জীবনযাপন করছে। কত লোক ঋণের বোঝায় জর্জরিত, বাড়িভাড়ার টাকা পরিশোধ করতে না পেরে কত লোক রোজ অপমানিত হচ্ছে। আমাদের অবস্থা কি তাদের চেয়েও খারাপ? আমরা কি তাদের চেয়ে একটুও ভালো অবস্থানে নেই? তাহলে কেন আমাদের এত অভিযোগ? আমাদের মাথায় শুধু ঘোরে—কেন সুইজারল্যান্ড যেতে পারলাম না। কেন একটা আইফোন প্রোম্যাক্সের মালিক হতে পারলাম না।

এজন্য রাসূল ﷺ বলেছেন—

'তোমার চেয়ে দুরবস্থায় যে আছে—তার দিকে তাকাও (তাহলে তোমার শোকরগোজার হতে মন চাইবে)। আর তোমার চেয়ে ভালো অবস্থায় যে আছে—তার দিকে তাকিয়ে আফসোস করো না (তাহলে মনে হবে, আল্লাহ তোমায় কিছুই দেয়নি)।'
(সহিহ মুসলিম : ২৯৬৩)

অন্যের প্রাচুর্যের দিকে তাকালে কখনোই মানসিক প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব না। মনের শান্তি পেতে হলে আমাদের যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কত নিয়ামত আল্লাহ আপনার মাঝে দিয়েছেন! এই নিয়ামতগুলোকে অনুভব করুন। এতে অন্তরে প্রশান্তির সুবাতাস বইবে; থেমে যাবে নৈরাশ্যের বৈরী হাওয়া।

শয়তানের ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করা : অনেক সময় হতাশা ও বিষণ্নতা শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে আসে। এটা শয়তানের একটা কৌশল। আর শয়তান হচ্ছে আমাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ্য দুশমন। মনে রাখবেন, শয়তান সব সময় আপনাকে আরও চাওয়ার, আরও পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেবে। আপনার জীবনে যতই থাকুক, আপনি আরও চাইবেন। আপনার সব সময় আরও কিছু পাওয়ার একটা জেদ থাকবে। কারণ, নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হলে আপনি ধীরস্থির হয়ে যাবেন এবং আল্লাহর তায়ালার কথা ভাবা শুরু করবেন। ফলে আপনার ভেতরে প্রশান্তি আসবে এবং তা আপনার পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আপনার ছেলেমেয়েগুলো সুস্থ পরিবারে বড়ো হয়ে আদর্শ মানুষ হবে। তখন তারা সমাজের মধ্যে সুখ-শান্তি ছড়িয়ে দেবে। শয়তান কোনোভাবেই চায় না, এর কোনোটাই হোক। তাই যেভাবেই হোক শয়তান কখনো আপনাকে জীবনে ধীরস্থির হয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবার, আল্লাহকে নিয়ে ভাবার, পরিবারকে নিয়ে ভাবার সুযোগ দেবে না। মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

'যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' (সূরা আ'রাফ : ২০০)

শয়তানের কাজই হলো মানুষের মনে হতাশা ঢুকিয়ে তাকে দিয়ে অপকর্ম করানো অথবা বিপদে পরিচালিত করা; যাতে সে সুস্থির মন নিয়ে ভালো কাজে অংশগ্রহণ না করে। তাই মনে হতাশার জন্ম নিলে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

আল্লাহর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা : বিপদ-মুসিবদ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর বিপদ থেকে রক্ষাও করতে পারেন কেবল আল্লাহই। তাই বিপদ এলে হতাশ না হয়ে এবং এর জন্য আল্লাহকে দায়ী না করে বরং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। বেশি বেশি করে দুআ, সালাত, জিকির, সাওম, সাদাকা করা উচিত। এতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হন। আল্লাহর খুশির চেয়ে পরম পাওয়া তো আর কিছু নেই!

রাসূল ﷺ কোনো বিপদে পড়লে অথবা চিন্তিত হলেই নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। কারণ, সালাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার একান্ত যোগাযোগ (Private Connection)। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'সিজদায় লুটিয়ে পড়ো আর আমার নিকটবর্তী হও।' (সূরা আলাক : ১৯)

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'বান্দা যখন সিজদাবনত থাকে, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে আসে। তাই তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে থাকো।' (সহিহ মুসলিম : ৩৫০)

ইউনুস ﷺ-কে যখন মাছ খেয়ে ফেলেছিল, তখন তিনি ভেঙে পড়েননি, হতাশ হননি; বরং এর পরিবর্তে তিনি ভরসা রেখেছিলেন আল্লাহর ওপর। নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন অবিরত। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর খুশি হয়েছিলেন। দুআয় সাড়া দিয়ে এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন তাঁকে। ইউনুস ﷺ-এর দুআ আল্লাহর এত পছন্দ হয়েছিল, তিনি কুরআনের মধ্যেও এই দুআকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى
الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

'আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো— যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাঁকে পাকড়াও করব না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠল—"তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি অতি পবিত্র সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।"' (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

অবশ্যই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি

আমাদের প্রিয়নবির জীবনের দিকে একটু তাকান। তিনি পৃথিবীতে আসার পর কখনো পিতার আদর পাননি। ছোটোবেলায় মা মারা যান। এরপর দাদার কাছে মানুষ হতে থাকেন। দাদার আদরও বেশিদিন কপালে জোটেনি। দাদা মারা যাওয়ার পর চাচার কাছে লালিত-পালিত হন।

নবুয়ত পাওয়ার পর আপন বংশের লোকেরা এমনকী নিজের চাচা আবু লাহাবও ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করল। একের পর এক গালিগালাজ, অপমান, মানসিক নির্যাতন তাঁর দিকে তিরের মতো ছুটে আসতে লাগল। নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়িভুঁড়ি গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো। নবিজিকে আখ্যা দেওয়া হলো কবি, গণক, জাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে।

একাধিক সন্তানের মৃত্যুর পর কাফিরদের টিপ্পনী-টিটকারি আরও বেড়ে গেল। তারপর শুরু হলো অবরোধ। তিন বছর ধরে চলল সেই শিয়াবে আবু তালিবের অবরোধ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণায় এক বর্ণনাতীত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হলো তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে।

তায়েফবাসীর আঘাতে রক্তাক্ত হলেন। আবার ফিরে এলেন মক্কায়। এরপর চলল হত্যাচেষ্টা। ফলে বাধ্য হয়ে নিজ জন্মভূমিই ত্যাগ করতে হলো তাঁকে। মদিনায় গিয়েও শান্তি হলো না তাঁর। কুরাশইদের সাথে একের পর এক যুদ্ধ, উহুদে বিপর্যয়, কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর মদিনা আক্রমণ তথা খন্দকের যুদ্ধ, বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতা, হুদাইবিয়া সন্ধির প্রেক্ষাপট মোকাবিলা, পরাশক্তি রোমানদের আক্রমণ মোকাবিলা প্রভৃতি ঘটনার মতো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে।

এগুলোর একটিও সাধারণ কোনো মসিবত ছিল না; ছিল পাহাড়সম! কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ এতটুকু ভেঙে পড়েননি, বিচলিত হননি। দাঁড়িয়ে ছিলেন কঠিন পাহাড়ের মতো। আর বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে এসব মোকাবিলা করেছেন বলেই তাঁর আদর্শ হাজার বছর পরও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত আছে।

রাসূল ﷺ-এর এমন বেদনা-বিধুর জীবনের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াত ও সূরা নাজিল করেছেন। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা হলো—সূরা আদ-দোহা ও সূরা ইনশিরাহ। এ সূরা দুটোকে কুরআনের মোটিভেশনাল সূরা বলা হয়। আশা জাগানিয়া সূরা দুটি হতাশ ও বিষণ্ন প্রকৃতির লোকদের জন্য আলোর মশাল হিসেবে কাজ করে।

এই সূরাগুলোর সান্ত্বনা-বাণীতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—অচিরেই তাঁর জন্য সুদিন আসবে, তাঁর সম্মান আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর সাথে জানিয়ে দিয়েছেন এক চিরায়ত নিয়ম—'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।'

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ- وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ- الَّذِىْٓ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ- فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا- فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ- وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ-

'আমি কি তোমার অন্তর প্রশস্ত করে দিইনি? তোমার ওপর থেকে ভীষণ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি—যা তোমার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল? তোমার মান-সম্মান উঁচু করেছি? তাহলে অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অবশ্যই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। তাই যখনই কোনো কাজ থেকে অবসর পাও, তখনই নিবেদিত হও। তোমার প্রভুকে পাওয়ার জন্য তাঁর দিকে ফিরে যাও।' (সূরা ইনশিরাহ)

এই সূরা থেকে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাই, বিপদ-মুসিবতের দিনগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। কীভাবে মানসিক সেটআপ করতে হয়। কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয় এবং কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। যেকোনো বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্য এই সূরার বিষয়বস্তুকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

- কষ্ট পার্মানেন্ট নয়; বরং কষ্টের পর স্বস্তি আসে।
- সারা বছর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু ভালো ফলাফলে আনন্দ।
- সারা মাস চাকরিতে কষ্ট, কিন্তু বেতন পেলে আনন্দ।
- রোজায় কষ্ট, কিন্তু ইফতারিতে আনন্দ।
- ২০ রাকাত তারাবি পড়তে কষ্ট, কিন্তু শেষ করলে এক অনাবিল আনন্দ।
- নয় মাস গর্ভধারণে অনেক কষ্ট, কিন্তু ফুটফুটে নতুন মেহমানের আগমনে এক অপূর্ব আনন্দ।

ঠিক একইভাবে দুনিয়ার জীবনের এই সাময়িক দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম সহ্য করার পর মৃত্যুর পর বিশ্বাসীগণ যখন মহা আনন্দ তথা জান্নাতের দেখা পাবে, তখন দুনিয়ার জীবনের এই সাময়িক দুঃখ, কষ্ট, আর সংগ্রামের কথা মানুষ এক নিমিষেই ভুলে যাবে। সূরা ইনশিরাহতে 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি'—কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে আমরা এই কথাটা ভালোভাবে মনে রাখতে পারি এবং গুরুত্বের সাথে ব্যাপারটা অনুভব করি।

কষ্টের সময়গুলোতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ, কষ্টের পরেই আছে আনন্দ। একদিক থেকে চিন্তা করলে কষ্টের দিনগুলোতে এই ভেবে আমরা শান্তি নিতে পারি—যেহেতু কষ্টের সময় যাচ্ছে, তাই এটা নিশ্চিত, আনন্দের দিন সামনে অপেক্ষা করছে।

জীবনে কষ্ট ও হতাশা থাকবেই। দুঃখ ও দুর্দশাই জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হতাশার ঘোর অন্ধকার একদিন কেটে যাবে। বুকভরা হাহাকার ও অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস প্রাপ্তি ও অর্জনের পূর্ণতায় চাপা পড়বে। তাই ভেঙে পড়লে চলবে না। সব পিছুটান ভুলে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে একদিন সফলতা এসে পদচুম্বন করবেই, ইনশাআল্লাহ।

আশা জাগানিয়া এ নাশিদটির কথামালা আপনার হতাশা আর বিষণ্নতা কাটাতে সাহায্য করবে—

'Everytime you feel like you cannot go on
You feel so lost
That you're so alone
All you is see is night
And darkness all around
You feel so helpless
You can't see which way to go
Don't despair and never lose hope
Cause Allah is always by your side
InshaAllah, InshaAllah, InshaAllah.'

রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিছু ফিতরাত তথা সহজাত মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সহজাত বৈশিষ্ট্য দিয়েই মানুষের মেজাজ ও প্রকৃতি তৈরি হয়। বিচিত্র ভাব-অনুভব ও বিপুল আবেগ-অনুভূতিতে সমৃদ্ধ মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মনোজগৎ। কোনো অনুভূতি মানুষকে হাসায়, আবার কোনোটি কাঁদায়। কোনো অনুভূতি মানুষের মনে আশ্চর্য সুখানুভূতি এনে দেয়, আবার কেনোটি মানুষকে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত করে। এই আবেগ-অনুভূতিই মানুষকে তাড়িত করে, প্রেরণা জোগায়। মানুষের বিচিত্র সহজাত অনুভূতিগুলোর একটা হলো—রাগ বা ক্রোধ; ইংরেজিতে Anger। রাগ নেই—এমন মানুষ দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। স্বভাবতই অসুন্দর ও অশালীন কিছু দেখলে মানুষের অনুভূতি আহত হয়, ক্রুদ্ধ হয়। মানবমনের এই সহজাত প্রতিক্রিয়ার নামই রাগ।

Cambridge Dictionary অনুযায়ী—

> 'A strong feeling that makes you want to hurt someone or be unpleased because of something unfair or unkind that has happened.'

অর্থাৎ 'রাগ হচ্ছে এমন একটি দৃঢ় অনুভূতি, যা কারও প্রতি আপনাকে আগ্রাসী করে তোলে অথবা এমন অন্যায্য কিংবা অন্যায় কোনো ঘটনা—যা কিনা বিরক্তিকরভাবে আপনাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে।'

এখন কথা হলো—মানুষ কেন রেগে যায়?

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, কিছু করার অক্ষমতা, অন্যায়ভাবে ভীতি প্রদর্শন, অন্যের দ্বারা অসম্মানিত হওয়া, অন্যায্য আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণত আমাদের রাগান্বিত করে তোলে।

তবে রাগ নিয়ে আমরা যতই নেতিবাচক কথা বলি না কেন, এটা কিন্তু সর্বদাই খারাপ গুণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, রাগ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ কিংবা আমাদের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি। তবে এখানেও কথা আছে। রাগকে সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রয়োগ না করলে এটি শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে। এই অনিয়ন্ত্রিত রাগ নিয়ে বিখ্যাত একটি উক্তি আছে—'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।'

ক্রোধ বা রাগের নানা রকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি রয়েছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। রাগ হলো অনেকটা ঝড়ের মতো। ঝড় শেষে টের পাওয়া যায় কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড় যেমন একপাশ থেকে এসে সব লন্ডভন্ড করে আরেক পাশ দিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি রাগও সব ধ্বংস করে দিতে পারে। মানুষ যখন প্রচণ্ড রেগে যায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ফলে অতিমাত্রায় রাগের কারণে মানুষ যেসব রিঅ্যাকশন নেয়, তার অধিকাংশরই ফলাফল হয় ভয়াবহ।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় রাগ সংবরণ করতে ও ক্ষমাশীল হতে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

'যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে (তারাই সৎকর্মশীল); বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

আকাশ-জমিন বিস্তৃত সুবিশাল জান্নাত যে সকল মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তৈরি করেছেন, তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

তাদের অন্যতম একটি গুণ (Attribute) হলো, তারা রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আমাদের অনেকেরই এই সমস্যাটা রয়েছে। আমরা অল্পতে রেগে যাই। ইংরেজিতে এই আচরণকে বলে—Short-tempered, অর্থাৎ যারা হুটহাট করে রেগে যায়। সুতরাং রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা বিশাল এক গুণ।

ইসলামের একটা নীতি আছে। ধরুন, কেউ কোনো অন্যায় কাজ করল। আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের অনুমতি আছে। এর স্বীকৃতি ইসলাম দেয়। তবে সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিশাল পুরস্কার। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

'খারাপের প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ। অতঃপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।' (সূরা শুরা : ৪০)

আমরা যখন কাউকে ক্ষমা করে দিই, তখন শুধু তাকে ক্ষমা করাই হয় না; তার কৃতকর্ম নিয়ে পুনরায় ভাবারও সুযোগ দেওয়া হয়। এতে সে অনুতপ্ত হয়। অন্যায় ও গর্হিত কাজ ছেড়ে সৎ ও কল্যাণের পথে ফিরে আসে। আর এটাই ইসলামের প্রত্যাশা। ইসলাম চায়—মানুষ সকল প্রকার অন্যায় কাজ বন্ধ করে দিক। সমাজে ন্যায়, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হোক।

নবিজি একবার সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন—

'তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা অধিক শক্তিশালী মনে করো?' তাঁরা উত্তর দিলেন—'যে ব্যক্তি কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে।' নবি করিম ﷺ বললেন—'সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।' (সহিহ বুখারি : ৫৬৮৪)

The strong man is not one who is good at wrestling, but the strong man is in fact one who controls himself when he is angry. তাই রাসূল ﷺ সাহাবিদের সব সময় রাগ সংবরণের নসিহত করতেন।

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত—

'এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে বলল—"আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন—"রাগ করো না।" লোকটি বারবার নবিজির নিকট উপেদশ চায়, আর তিনি বলেন—"রাগ করো না, রাগ করো না।"' (সহিহ বুখারি : ১৫৩৫)

মানুষ হিসেবে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকের মধ্যে এই ফিতরাতটি বিদ্যামান। তবে ব্যক্তিভেদে রাগী মানুষ কয়েক ধরনের হয়। বিখ্যাত ইসলামি স্কলার ড. সালমান আল আওদা রাগান্বিত মানুষের শ্রেণিবিভাগ করেছেন এভাবে—

প্রথম : কিছু লোক আছে, যারা খুবই মন্থর গতিতে রাগে। তাদের রাগ ভাঙতেও বেশ সময় লাগে। কোনোভাবে যদি একবার রেগে যায়, তাহলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

দ্বিতীয় : একশ্রেণির মানুষ আছে, যারা দ্রুতই রেগে যায় আবার দ্রুত রাগ পড়েও যায়। এমন মানুষের সঙ্গে একটু বুঝে-শুনে আচরণ করলেই সহজেই কাজ উদ্ধার করা যায়।

তৃতীয় : আরেক শ্রেণির মানুষ আছে—যারা মন্থর গতিতে রাগে, কিন্তু দ্রুতই রাগ ভাঙে। এটাই তুলনামূলক সর্বোত্তম অবস্থা। এই সমস্ত লোকজন সচরাচর রেগে যায় না। কালেভদ্রে রেগে গেলেও দ্রুতই রাগ নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করে। নিজের বোধ ও বিবেক ফিরে পায়।

চতুর্থ : এই পর্যায়ের লোকেরা দ্রুতই রেগে যায়, কিন্তু কিছুতেই রাগ কমে না। ক্ষোভ প্রশমিত হয় না। কারণে-অকারণে দ্রুতই রেগে যায়। একবার যদি রাগে, তবে সেই রাগ ভাঙানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের লোকদের থেকে সাবধান থাকতে হয়।

আরব বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার, দাঈ ও সুবক্তা ড. শাইখ আইদ আল কারনি (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন—'আমাকে যদি পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ করতে বলা হয়, তাহলে আমি চারটি বাক্য বলব। আরও পঞ্চাশ বছর পর যদি আবারও আমার কাছে উপদেশ চাওয়া হয়, তাহলেও আমি এই চারটি বাক্যই বলব।' এই চারটি বাক্যের মধ্যে অন্যতম একটি ছিল—'লা তাগদাব' অর্থাৎ রেগে যাবেন না। তাঁর পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ চারটি উপদেশবাক্য হলো—

১. লা তাহজান (لَا تَحْزَنْ)—হতাশ হবেন না।

২. লা তাখাফ (لَا تَخَفْ)—ভয় পাবেন না।

৩. লা তাগদাব (لَا تَغْضَبْ)—রেগে যাবেন না।

৪. লা তাসখাত (لَا تَسْخَطْ)—অসন্তুষ্ট হবেন না।

এ পর্যায়ে আমরা রাগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছোট্ট কিন্তু দারুণ শিক্ষণীয় একটা গল্প শুনব।

'ছোট্ট একটি ছেলে খুব রাগী। বাবা কিছুতেই ছেলের রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না। একদিন বাবা ছেলেকে স্নেহের পরশে কাছে ডাকলেন। একটি পেরেকভর্তি ব্যাগ দিয়ে বললেন—"যতবার তুমি রেগে যাবে, ততবার একটি করে পেরেক আমাদের বাগানের কাঠের বেড়াতে লাগিয়ে আসবে। এটা তোমার প্রতি আমার আদেশ।"

প্রথমদিনেই ছেলেটিকে বাগানে গিয়ে ৩৭টি পেরেক মারতে হলো। কারণ, সে এদিন ৩৭ বার রেগে গিয়েছিল। ক্রমশ সে উপলব্ধি করছিল, তার রাগ অনেক বেশি—৩৭ বার পেরেক মারতে হয়েছে। আরও ভাবল, কষ্ট করে পেরেক মারার চেয়ে রাগ কমিয়ে দেওয়া সহজ। ছেলেটি পেরেক মারার কষ্ট লাঘব করতে করতে রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা শিখে গেল। ধীরে ধীরে পেরেক মারা কমতে থাকল এবং অবশেষে একদিন তাকে আর একটি পেরেকও মারতে হলো না।

বাবা বুঝলেন, তার প্রিয় সন্তান রাগ নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এবার তিনি তাকে প্রতিদিন বাগানের বেড়ার একটি করে পেরেক তুলে ফেলতে বললেন। বাবার আদেশ পালন করল ছেলেটি। পেরেক তোলা শেষ হয়ে গেলে তার বাবা তাকে বাগানে নিয়ে কাঠের বেড়াটি দেখিয়ে বললেন—'দেখ, কাঠে পেরেকের গর্তগুলো এখনও রয়ে গেছে। কাঠের বেড়াটি কখনো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। যখন তুমি কাউকে রেগে গিয়ে কিছু বলো, তখন তার মনে ঠিক এমন একটা আঁচড় পড়ে যায়—যা কখনোই আর মুছে যায় না বেটা। তাই নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। মানসিক ক্ষত অনেক সময় শারীরিক ক্ষতের চেয়েও ভয়ংকর।'

রাগের ক্ষতিকর দিক

কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তখন তার দেহে অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) নামক একপ্রকার হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। এতে মানুষ উত্তেজিত হয় এবং তার হার্টবিট বেড়ে যায়। এটা অতিমাত্রায় নিঃসরিত হলে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। রাগের কারণে মুখভঙ্গি ও শারীরিক অভিব্যক্তি (Facial Expression & Body Language) বদলে যায়। তার সাইকোলজিক্যাল রেসপন্স অ্যাবনরমাল হয়ে কাজ করতে থাকে। ফলে সে মারাত্মকভাবে রিঅ্যাক্ট করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে, মারামারি করতে চায়, ভাঙচুর করতে চায়। যে হরমোন নিঃসরণ হওয়ার ফলে মানুষ রেগে যায়, সে হরমোনের ধরনটাই এমন। Adrenaline triggers the body's fight response.

এই রাগের কারণে কখনো কখনো—

ক. পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

খ. বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।

গ. স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটে।

ঘ. মারামারি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

রাগের ক্ষতিকর দিক নিয়ে একটা ঘটনা বলি—

'একটি ছোট্ট মেয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে। বাবা নিজের গাড়ির ময়লা পরিষ্কার করছেন। গাড়িটি ধুলোয় একাকার! মেয়েটা হঠাৎ করে একটি চক দিয়ে গাড়িটার ওপর কীসব আঁকিবুঁকি করতে লাগল। এটা দেখে বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। হুংকার দিয়ে বললেন—"এত কষ্ট করে পরিষ্কার করছি, আর তুই সেটা নষ্ট করছিস!" বলেই কষে এক চড় বসিয়ে দিলেন মেয়েটির গালে। মারের চোটে মাটিতে পড়ে গেল মেয়েটি। ব্যথায় কাঁদতে শুরু করল। তারপর মনের দুঃখে ঘরের দিকে চলে গেল। বাবা মেয়ের আঁকিবুঁকির জায়গাটা আবার পরিষ্কার করতে গিয়ে লক্ষ করলেন, সে কিছু একটা লিখেছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলেন, তার মেয়ে ছোট্ট হাতে লিখেছে—"আমার বাবা অনেক ভালো।" অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন বাবা, কিন্তু ততক্ষণে ছোট্ট মেয়েটির মনে কষ্টের বিশাল ছাপ বসে গেছে।'

আসলে রাগ বা উত্তেজনাকে দমন করতে না পেরে বাবা যে আচরণটি করলেন, তা আর কখনোই তাকে স্বস্তি দেবে না।

রাগ কখনো আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না; আনে শুধু তিক্ততা আর কষ্ট। এ পর্যায়ে রাগের কিছু কুফল নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পারিবারিক অশান্তি : রাগের কুফলের সবচেয়ে নির্মম বলি হয় আমাদের পরিবারের সদস্যরা। আমরা অনেকেই পরিবারে বেশি রেগে যাই, সন্তানের ওপর রেগে যাই, সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়ে কথা বলি। একটি সম্পর্ক গড়তে সময় লাগে, কিন্তু রাগের মাথায় এমন কথা বলে ফেলি। যার ফলে অনেক বছরের সম্পর্ক এককথায় নষ্ট হয়ে যায়। আপনি মনে করছেন রাগ দেখালে স্ত্রী-সন্তান আপনার অনুগত থাকবে, কিন্তু বাস্তবতা হলো—রাগী মানুষকে কেউ পছন্দ করে না; এমনকী সন্তানরাও রাগী মা-বাবাকে পছন্দ করে না।

মূলত উত্তেজনা কখনোই কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে আরেকজনকে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মনের কথাটা বোঝানো যায় না। কথাটা তার কানে ঢুকবে, কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। বোঝাতে গেলে কণ্ঠস্বরকে নামাতে হবে। যত কণ্ঠস্বর নামাতে পারব, ততই কথাটা তার ভেতরে ঢুকবে। হৃদয় থেকে কোমলভাবে কথা বললে সেটা অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

মানসিক প্রশান্তি নষ্ট : প্রতিটি মানুষ স্ফটিক-স্বচ্ছ অন্তর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক নেতিবাচকতায় প্রভাবিত হয়ে আপনি যখন রেগে যাচ্ছেন, তখন এই অন্তরে নেগেটিভ প্রভাব পড়ে। অন্তরে যত নেগেটিভ প্রভাবের পরিমাণ বাড়তে থাকে, আপনার মনের প্রশান্তি তত কমতে থাকে। যত রেগে যাবেন, বাইরের কেউ কিছু বলুক আর না বলুক, আপনি কখনো প্রশান্তিতে থাকতে পারবেন না। নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার যখন রাগ থাকে, তখন ভেতরে প্রশান্তি অনুভব করেন কি না? কাউকে কষ্ট দিয়ে, দুর্ব্যবহার করে কখনো মনে শান্তি পাওয়া যায় না।

শারীরিক ক্ষতি : গবেষণায় দেখা গেছে, রেগে ক্ষিপ্ত হওয়ার দুঘণ্টার মাঝে আপনার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট বাঁধতে পারে—যা স্ট্রোকের সম্ভাবনা বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। অপ্রকাশিত রাগ—যা আমরা দমিয়ে রাখি, তার সাথে হৃদরোগের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানীগণ। গবেষণায় আরও দেখা গেছে—রাগ যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি, তাদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা যখন রেগে যাই, আমাদের দেহে কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন : হার্টরেট, ব্লাডপ্রেসার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—দীর্ঘ সময় ধরে যদি এই রেসপন্স চলতে থাকে, তাহলে অনেক ধরনের ক্রনিক রোগ হতে পারে। যেমন : ইনসমনিয়া, হাইপারটেনশন,

ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, আলসার, মৃগী, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইন, ফুসফুসের অসুখ, এমনকী ক্যানসারও। এ ছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং আয়ুষ্কালের ওপরও রাগের প্রভাব আছে। বলা হয়—যারা হাসিখুশি মানুষ, তারা দীর্ঘদিন বাঁচে। তাহলে কি চিন্তিত আর রাগান্বিত মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি উলটো? গবেষকরা বলেছেন, রাগ ও স্ট্রেস আমাদের স্বাস্থ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেউ যদি সার্বক্ষণিক চিন্তিত ও রাগান্বিত থাকেন, তাহলে তিনি নিজের আয়ু কমিয়ে ফেলছেন।

জীবনে সফলতার পথে বড়ো বাধা : মস্তিষ্ক আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু। যে মস্তিষ্কের কারণে আমরা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করছি, রেগে যাওয়ার কারণে সে মস্তিষ্ক হয়ে যায় অকর্মণ্য। যখন রেগে যাই, উত্তেজিত হই, তখন এই সুপার কম্পিউটার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম নিউরনগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। তখন ব্রেইনের ওয়েব ফ্রিকুয়েন্সি আলফা, বিটা ছাড়িয়ে একেবারে গামা লেভেলে চলে যায়। নিউরনের মধ্যে যখন যোগাযোগ অচল থাকে, তখন সে অতীত স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিতে পারে না। হার্ভার্ড ডিসিমন সাইন্স ল্যাবরেটরির জেনিফার লারনার দেখেছেন—মানুষ যখন রেগে যায়, তখন সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে খুব বেশি ভাবতে চায় না, বোকাদের মতো চিন্তা করে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করে। রেগে গেলে মানুষের কোনো কিছুতে মনোনিবেশ (Concentrate) করার ক্ষমতা কমে যায় এবং শুধু রাগের বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছু মাথায় থাকে না। তাই, ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—'রাগান্বিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিয়ো না, শপথ করো না, আদেশ দিয়ো না এবং শাস্তি দিয়ো না।'

রাগ ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে : রাগ আপনার ব্যাপারে জনমনে একটা নেগেটিভ ধারণা তৈরি করে; যা আপনার ব্যক্তিত্ব বা ইমেজকে নষ্ট করে। প্রত্যেক মানুষই চায়, সবার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকুক। লোকজন তাকে ভালোবাসুক, তার কাছে আসুক, তার ব্যাপারে একটা পজেটিভ ধারণা রাখুক। কিন্তু যখনই মানুষ দেখবে যে আপনি বদমেজাজি, অল্পতে চটে যান, তখন আর কাউকে কাছে পাবেন না। সবাই আপনাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে।

এবার আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকাই। নবিজির সিরাহ বা জীবনী যদি পড়ি, তাহলে দেখব—পুরো জিন্দেগিতে অগণিত মানুষ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। নবুয়ত পাওয়ার পর মক্কার তেরো বছর ছিল তাঁর কষ্ট ও দুর্দশায় পূর্ণ। সবাই তাঁকে চরম কষ্ট দিয়েছে—কি কাছের মানুষ, কি দূরের মানুষ। তারপরও তিনি রাগান্বিত হতেন না।

তায়েফের ঘটনা আমরা প্রত্যেকেই জানি। নেতাদের প্ররোচনায় দুষ্ট বালকরা পাথর ছুড়ে নবিজির শরীর রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন—রক্তের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তাঁর জুতার তলাটা রক্তে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর জিবরিল ﷺ যখন প্রতিশোধ নিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, তখন দয়ার নবির উত্তর ছিল—'(না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি—মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান দেবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।' (সহিহ বুখারি : ৪৫৪)

তবে হ্যাঁ, আল্লাহর বিধানের লঙ্ঘন হলে তিনি রেগে যেতেন। আর এটা হলো মুত্তাকিদের একটি বৈশিষ্ট্য। মুত্তাকিরা সব জায়গায় রাগ দেখায় না; বরং আল্লাহর খুশির জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যেখানে রেগে যাওয়া অপরিহার্য, সেখানে তারা রেগে যায়।

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজের কোনো ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ মহান আল্লাহর কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তার যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।'
(আল জামে বাইনাস-সহিহাইন : ৩১৮৪)

আলি ﷺ-এর একটি বিখ্যাত ঘটনা আমরা মনে হয় সকলেই জানি।

'আলি ﷺ এক যুদ্ধে অমুসলিম বাহিনীর এক সেনাকে সম্মুখযুদ্ধে ধরাশায়ী করলেন এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় লোকটি আলি ﷺ-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। ওই সেনা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'আপনি তো আমাকে হত্যা করতে পারতেন, ছেড়ে দিলেন কেন?' উত্তরে আলি ﷺ বললেন—'তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নেই। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি শুধু অবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে। আমার মুখে থুথু নিক্ষেপের পর তোমার প্রতি আমার আক্রোশ চলে এসেছিল। এই অবস্থায় যদি আমি তোমাকে হত্যা করতাম, তবে তা হতো আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ—যা আমি কখনোই চাই না।' (সাহাবা চরিত)

কতই না উত্তম শিক্ষা রয়েছে এই গল্পের মধ্যে! তাই আমাদের ভালোবাসা-রাগ-ক্ষোভ সবই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; ব্যক্তিগত কারণে নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যে কেউ আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে এবং (কাউকে কিছু) দিয়ে থাকে আল্লাহর জন্যই এবং (কাউকে কিছু) দেওয়া থেকে বিরত থাকেও আল্লাহরই জন্য, তাহলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো।' (আবু দাউদ : ৪৬৮১)

একবার তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আলি ও ফাতিমা ﷺ-কে ডাকতে গেলেন। গিয়ে বললেন—'তোমরা তাহজ্জুদ নামাজ পড়ছ না কেন?'

আলি ﷺ একটি কৌশলী জবাব দিলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রুহ তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে ইচ্ছা করবেন, তখন জাগিয়ে দেবেন।'

এমন জবাব শুনে নবিজির রাগ হলো। তিনি নিজের উরুতে আঘাত করতে করতে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا-

'মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই তর্কপ্রিয়।' (সূরা কাহাফ : ৫৪)

আলি ﷺ-কে আর কিছু না বলে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে করতেই নবিজি চলে গেলেন। (সহিহ বুখারি : ১১২৭)

এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো—নবিজি নিজের উরুর ওপর আঘাত করে রাগ প্রশমন করেছিলেন। অন্য কাউকে আঘাত করে কিংবা ধ্বংসাত্মক কোনো আচরণের মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণ করেননি। কিন্তু আমরা কী করি? একবার রাগ উঠে গেলে আর রক্ষা নেই। চোখের সামনে যাই থাকুক, হোক কোনো ব্যক্তি বা বস্তু; তার ওপর আঘাত করে রাগের প্রতিক্রিয়া ঝেড়ে ফেলি। যেমন : ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর, নিজের স্ত্রী-সন্তান বা অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ; এমনকী গাছপালা কিংবা প্রাণীর সাথেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করি। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ পরিপন্থি।

তাই আমাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল জানতে হবে। রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো। আগুনের স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়ায় সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে এই রাগ। এ কারণে রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। রাগ অন্যান্য ইমোশনগুলোর মতো স্বাভাবিক একটি ইমোশন। এটি একটি লিমিট পর্যন্তই আমাদের জন্য উপকারী। যেমন : কোনো কাজ করার জন্য উদ্যমী করে তোলা, না বলতে পারা কথাগুলো বলে ফেলা। কিন্তু লিমিট পেরোলেই রাগের চেয়ে খারাপ ইমোশন আর একটিও হয় না। রাগ যদি ভুল সময়ে ভুল জায়গায় চলে আসে, তাহলে নানাভাবে এটা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি স্কিল। তাহলে কীভাবে আমরা রাগের বহিঃপ্রকাশ করব এবং কীভাবেই-বা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করব?

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং আধুনিক বইপত্রের কোনো অভাব নেই। রাগ নিয়ন্ত্রণের কোর্স এবং প্রোগ্রামগুলো পাশ্চাত্যের দেশে একটি বিরাট ব্যাবসা। সেসব দেশের একটা বিরাটসংখ্যক লোক মেন্টাল স্ট্রেসে ভোগে। বিশেষ করে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো তাদের সেলস এবং কাস্টমার সাপোর্ট কর্মচারীদের রাগ নিয়ন্ত্রণের ওপর কোর্স করতে বাধ্য করেন। কারণ, কোম্পানির কাস্টমার হারানো এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির একটি বড়ো কারণ—কর্মচারীদের রাগ অথবা রাফ বিহেইভ।

রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা করে বের করার পদ্ধতিগুলো প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকেই আমরা জানতাম। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে রাগ দমন করতে হয়। ইসলাম মানুষের সকল কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেছে। তেমনই রাগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির ব্যাপারেও আলোচনা করেছে। আমরা কুরআনিক গাইডলাইন এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে রাগ নিয়ন্ত্রণের বেশ কিছু পদ্ধতি শিখতে পারি।

প্রথম পদ্ধতি : দুআ পড়া

সকল কাজে আল্লাহরই দারস্থ হওয়া ইসলামের শিক্ষা। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্যও আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইব।

একবার দুজন সাহাবি নবিজির সামনে পরস্পরের সাথে রাগারাগি করলেন। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হলো। রাগের আতিশয্যে একজনের চেহারা তো টগবগে লাল হয়ে গেল, রগগুলো ফুলে উঠল।

আমাদের সামনে দুজন লোক তর্কাতর্কি, রাগারাগি বা গালাগালিতে লিপ্ত হলে আমরা কী করি? ধমক দিয়ে দুজনকে চুপ করতে বলি অথবা রেগে গিয়ে দুজনকে গালাগালি শুরু করি। কিন্তু নবিজির সামনে যখন দুজন সাহাবি এমনটা করলেন, নবিজি তাদের ধমকও দিলেন না, রাগারাগিও করলেন না। বললেনও না যে, তোমরা দুজনেই খারাপ। বললেন—'আমি এমন একটি দুআ জানি, যেটা পড়লে রাগ দূর হয়ে যাবে।'

দুআটি কী? দুআটি হলো—

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।' (সহিহ বুখারি : ৩২৮২)

এটা হলো রাগ কমানোর দুআ। কেউ যদি রাগের মধ্যে এই দুআটি পড়ে, আশা করা যায়—আল্লাহ তায়ালা তার রাগ কমিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : চুপ থাকা

রেগে গিয়ে অনেকে বাক্যবাণ ছুড়তে থাকে, অশ্লীল-অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। একজন রাগান্বিত ব্যক্তি কী বলে, সে হয়তো নিজেই টের পায় না। কারণ, রাগান্বিত হলে হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়—যা আমাদের চিন্তাশক্তিকে কমিয়ে দেয়। তাই এ সময় আমরা যত বেশি কথা বলব, ভুল হওয়ার সম্ভবনা তত বেশি হবে। অপরদিকে চুপ থাকা আমাদের শান্ত হতে সহযোগিতা করবে।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

'তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে।' (ইমাম বুখারি, আদাবুল মুফরাদ : ২৪৪)

প্রত্যেকটি ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিক দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করা যায়। আমাদের রাগান্বিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো—অন্যরা যা বলছে তা ঠিক না, আমি যা বলছি বা মনে করছি সেটাই একমাত্র সঠিক—এমনটা ভাবা। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এখন যেটাকে সঠিক মনে হচ্ছে, স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে তা সঠিক না-ও হতে পারে।

তাই স্ট্যান্ডার্ডবিহীন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা যদি রাগের মাথায় তর্ক চালিয়ে যাই এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কিছু করে ফেলি, তবে এর জন্য পরবর্তী সময়ে অনুশোচনায় ভুগতে হতে পারে। এমনও হতে পারে, আমার পূর্বের উপলব্ধিটাই সঠিক ছিল না! পরে হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছি।

তাই রাগ নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—রাগ উঠলেই চুপ থাকা। কেউ যদি আমাদের সাথেও রাগান্বিত হয়, তবে আমাদেরও উচিত হবে তার সাথে তর্কে না জড়িয়ে বরং চুপ থাকা। রাগ কমে গেলে এবং মেজাজ ভালো থাকলে বোঝানোর চেষ্টা করা; অন্যথায় রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় থেকে দেখা গেছে, শর্ট-টেম্পার্ড হওয়ার কারণে যে সেনসেশন হয়, সেটা সাধারণত কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী থাকে। অর্থাৎ রাগ বেরিয়ে আসার আগে আমরা যে অসহ্যকর অনুভূতি অনুভব করি, সেটা স্থায়ী হয় অল্প কয়েক সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে রাগ প্রকাশ করে ফেললে তা বারবার হতে থাকে, রাগ আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোনোরকম রিঅ্যাক্ট না করে চুপ থেকে কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে দিতে পারি, তাহলে সেই সেনসেশনটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা নিজেদের ওপর আবার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাই।

তৃতীয় পদ্ধতি : কার্যকলাপ (Action) কমিয়ে দেওয়া

রাগের সময় আমাদের গতিবিধি কমিয়ে দিলে রাগ দ্রুত কমে যায়। কিন্তু আমরা করি তার উলটো। আমরা রাগের সময় আরও বেশি সক্রিয় হই। বসে থাকলে দাঁড়িয়ে যাই, অস্থিরতা আর ছোটাছুটি শুরু করি। ফলে আরও বেশি ভুল হয়। না, এটা করা যাবে না; বরং তখন কার্যকলাপ কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ দাঁড়ানো থাকলে বসে যেতে হবে। বসা থাকলে শুয়ে যেতে হবে।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'তোমাদের কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়, সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ কমে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮২)

অর্থাৎ রাগের মুহূর্তে আমাদের বর্তমান গতিশীল অবস্থা বদল করে ক্রমান্বয়ে অধিকতর স্থিরাবস্থার দিকে যেতে হবে।

এভাবে অ্যাকশন কমিয়ে দিয়ে রিলাক্সেশনের মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রাগের সময় আমাদের শরীরের কিছু স্ট্রেস হরমোন নিসৃত হয়। রিলাক্সেশন করলে সেটাতে সামঞ্জস্যতা চলে আসে। সাধারণত তিনভাবে রিলাক্সেশন করা যায়। সহজটা হলো—শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রিলাক্স হওয়া। যে অবস্থায়ই আপনি থাকুন না কেন—এ পদ্ধতিতে চেষ্টা করতে পারেন। সেটা হলো—নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে পেটের দিকে নিয়ে ৪-৫ সেকেন্ড ধরে রেখে পরে দুই ঠোঁটের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করা। এভাবে লম্বা কয়েকটি দম নিলে রিলাক্সেশনের মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

চতুর্থ পদ্ধতি : অজু করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'রাগ আসে শয়তান থেকে। শয়তানকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। আগুনকে নেভাতে পারে কেবল পানিই। অতএব, তোমাদের কারও রাগ হলে সে যেন অজু করে নেয়।'
> (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৪, হাদিসটি জয়িফ)

নবিজির কথার সিকুয়েন্স দেখুন—

রাগ আসে শয়তান থেকে
⇩
শয়তান আগুনের তৈরি
⇩
আগুন নেভাতে পানি লাগে
⇩
রাগের আগুন নেভাতে অজু লাগে

অজুর অন্যতম একটি উপকারিতা হলো—অজু শরীর শীতল করে। অজু করলেই শরীরে একটা সজীব প্রশান্তি চলে আসে। তাই অজু রাগ কমাতে ও মানসিক প্রশান্তি আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও অজুর আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। যেমন—সাধারণত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আমরা অজু করি। এর মাধ্যমে শরীরে একটা পবিত্রতার অনুভূতি চলে আসে। আর এমন পবিত্র অবস্থায় রেগে থাকাটা কঠিন।

রাগ নিয়ন্ত্রণের পঞ্চম পদ্ধতি : ক্ষমা করা

ক্ষমা মহৎ গুণ। আমরা যদি বেশি বেশি ক্ষমা করার অভ্যাস করতে পারি, তাহলে খুব সহজেই আমরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। কারও প্রতি অন্তরে ক্ষোভ, হিংসা অথবা রাগ পুষে বড়ো করলে এটা নিজেরই ক্ষতি করে।

হিংসা আপনার নিজেকেই জ্বলে-পুড়ে ছারখার করে ফেলবে (It burns yourself inside)। নিজের সুখের জন্যই অন্যকে ক্ষমা করতে শিখুন এবং মনটাকে ফ্রেশ রাখুন। জীবনটাকে উপভোগ করুন। কারও প্রতি ক্ষোভ বা হিংসা হলে জ্বালা-পোড়ার কষ্টটা তার চেয়ে আপনারই বরং বেশি! কাউকে ক্ষমা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকটির আগেই আপনি নিজেই ভেতর থকে একটা মনোদৈহিক প্রশান্তি অনুভব করবেন! তাই, রাগ, ক্ষোভ ও হিংসাকে 'না' বলুন। মানুষকে ক্ষমা করুন। মনটাকে নির্ভার রাখুন।

কুরআন আমাদের জন্য সাইকোলজিক্যাল গাইডবুক। কুরআন আমাদের সঠিক জীবন-দর্শন শিক্ষা দেয়। কুরআন সব সময় উত্তম মানবীয় আচরণকে (Good Human Behavior) প্রোমোট করে। রেগে গেলে বিশ্বাসীদের কী ধরনের রিঅ্যাক্ট করা উচিত, সেটার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ-

'যখন তারা রেগে যায়, তখন (সাথে সাথে) তারা ক্ষমা করে ব্যাপারটা ছেড়ে দেয়।' (সূরা আশ-শুরা : ৩৭)

মানুষ ভুল করবে—এটাই স্বাভাবিক। কোনো মানুষই শতভাগ সঠিক নয়। তাই কারও ভুলের জন্য রেগে যাওয়াটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ না। রেগে গেলে কি ভুলটা ঠিক হয়ে যাবে? না। তাহলে ভাবুন, যা হওয়ার হয়ে গেছে; রাগ না করে ক্ষমা করে দিন। এতে করে পরবর্তী সময়ে আপনার নিজেরই ভালো লাগবে। ক্ষমা করতে শিখুন। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখলে আখেরে ক্ষতি আপনারই। নিজের এই একপেশে চিন্তায় ডুবে থাকলে ভালো কিছু ভাবার ক্ষমতাটাই না চলে যায়।

ক্ষমা করতে শিখুন। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে কখনো ভালো কিছু হয় না। যার ওপর আপনি রেগে আছেন, সে হয়তো আপনাকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়; অথচ আপনি সেই ব্যক্তিকে নিয়ে নিজের মনে রাগ পুষে রেখে নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন। তাই মনে রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ পুষে না রেখে মন থেকে ক্ষমা করে দিন;

এতে করে আপনি নিজেই শান্তি পাবেন। অন্যের প্রতি রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ হলো এমন এক বিষ—যা মানুষ নিজে পান করে, কিন্তু মনে করে, মারা যাবে প্রতিপক্ষ!

রাগ মানুষের প্রকৃতিগত একটা স্বভাব। এই স্বভাবের ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। রাগ অনেক সময় খারাপ ও মন্দ কাজ দমনে সহায়ক হয়, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। তবে এর বিপরীত দিকও আছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, রাগ ও ক্ষোভের এই বিপরীত দিকটাই আমাদের মাঝে বেশি দেখা যায়। রাগ মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধবুদ্ধি মেরে ফেলে; তাকে অনিয়ন্ত্রিত ও বল্গাহীন করে ছাড়ে। রাগ ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে; মানুষের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। এমনকী রাগের কারণে পরিবার ভেঙে যায়, ভাই-ভাইয়ের মাঝে সংঘাত তৈরি হয়। রাগ এক অদৃশ্য শত্রু, যেকোনো সময় আপনার বুকে ছুরিকাঘাত করতে পারে। তাই আসুন, রাগ নিয়ন্ত্রণে আরও কৌশলী হই। মনোদৈহিক প্রশান্তি লাভ করি। মনটাকে নির্ভার রাখি।

শাশ্বত জীবনবিধান

প্রত্যেক কাজই সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য সুষ্ঠু নিয়ম-পদ্ধতি থাকা অতীব জরুরি। সুষ্ঠু নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া যেকোনো প্রচেষ্টা বা কাজই বিশৃঙ্খল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা প্রকৃতির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখতে পাব—প্রকৃতির প্রত্যেক উপাদানই নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলে। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছপালা, নদী-নালাসহ আমরা যা কিছুই দেখি—সবই সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। এর মাঝে সামান্য হেরফের হলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। নিয়মের নিপুণ জালে আবদ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি উপাদান।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক অনুজীব ও প্রাণীকেও স্ব-স্ব জীবন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তারা রবের দেখানো জীবনাচরণ লঙ্ঘন করে না।

মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষের জীবন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। তাই মানুষকেও আল্লাহ তায়ালা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি দিয়েছেন। কিছু কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে—যেগুলো মানুষ মানতে বাধ্য। আবার কিছু কিছু নিয়ম আছে—যেগুলো মানা এবং না মানাটা আল্লাহ মানুষের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন, পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। জিন জাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি অলঙ্ঘনীয় করে দিয়েছেন, তা মানুষ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য। যেমন : আমাদের দেহের ভেতরকার কাজের পদ্ধতি; যে অঙ্গকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটা সেই কাজই করছে। এর মাঝে কোনো কারণে কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে আমরা অসুস্থ হয়ে যাই।

এগুলো ছাড়া বাকি জাগতিক নিয়মকানুনগুলো মানুষের বাছাই করার সুযোগ আছে। মানুষ চাইলে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত বিধান মানতে পারে, আবার নিজেদের তৈরি করা বিধানও মানতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে মানুষের জন্য সঠিক জীবনবিধান তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন পরিচালনার সুষ্ঠু নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক নবি ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবি-রাসূলগণ হলেন এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত পুরুষ। মানুষ কেবল তাঁর ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি দিয়েই সব সময় সত্যকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় না। তাই মহাসত্যের সন্ধান দিতে নবি-রাসূলগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

তাঁরা পথহারা মানুষকে দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা। আলোকিত করেছেন অজস্র অন্ধকার পথযাত্রীকে। সত্য ও কল্যাণের পথনির্দেশ এবং অন্যায় কাজে সাবধান করতে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছেই ওহির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

অনুপম চরিত্রের এ মহামানবগণই আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের উচিত তাঁদেরই মডেল বা আদর্শরূপে গ্রহণ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-

'তিনিই মহান সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল।' (সূরা জুমুআ : ০২)

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম ﷺ ছিলেন একজন নবি। আদম ﷺ থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবি-রাসূলই অভিন্ন তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। যুগে যুগে নবিদের সেই দাওয়াতই হলো 'ইসলাম'। নবিদের ভিন্ন ভিন্ন শরিয়াহ ছিল, কিন্তু তাঁদের দ্বীন ছিল এক ও অভিন্ন আর সেটা হচ্ছে—ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামই পৃথিবীর আদি ও একমাত্র ধর্ম। পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের বিভিন্ন আয়াত সাক্ষী দিচ্ছে—এ পৃথিবীর সকল নবি-রাসূল একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। সবার ধর্মের নাম ছিল ইসলাম। ইবরাহিম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'ইবরাহিম ইহুদি ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (সূরা আলে ইমরান : ৬৭)

আল্লাহ তায়ালার দরবারে ইউসুফ ﷺ-এর দুআ—

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ-

'হে আমার রব! ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।'
(সূরা ইউসুফ : ১০১)

রানি বিলকিসকে উদ্দেশ্য করে সোলায়মান ﷺ-এর আহ্বান—

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ-

'এই চিঠি সোলায়মানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমানুর রাহিমের নামে শুরু করা হয়েছে। (চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে)—"আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হও।"'
(সূরা নামল : ৩০-৩১)

উপরোল্লিখিত আয়াতে কারিমাগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সকল নবির ধর্মের নাম ছিল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ বার্তাবাহক ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ

এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো কুরআন। এই কুরআনে জীবন পরিচালনার জন্য সকল বিষয়ের মূলনীতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন নাজিল হওয়ার পর অপরাপর সকল ধর্মের কিতাব ও শরিয়াহ রহিত হয়ে যায়। কুরআনপূর্ব আসমানি কিতাবগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিল না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান নেই এবং সেগুলো পূর্ণাঙ্গও নয়। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদির ইসলাম এর ব্যতিক্রম—যা শাশ্বত ও কালজয়ী। তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে ইসলাম ধর্মকেই মনোনীত করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

'যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

'ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

এই আয়াতগুলোতে দুটি শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; 'আদ-দ্বীন' (اَلدِّيْنَ) ও 'আল ইসলাম' (اَلْاِسْلَامَ)। এই দুটি শব্দের অর্থও ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন

আরবি دِيْنٌ শব্দটি দ্বারা মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম, জীবন-পদ্ধতি, আইন প্রভৃতি বিষয়কে বোঝানো হয়। মানুষ যে পদ্ধতিতে নিজের জীবন পরিচালনা করে, তাকে 'দ্বীন' বলে। এই দ্বীন কী হবে, অর্থাৎ মানুষ কোন পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা করবে—তা আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই দ্বীনের নাম ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

'যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ-

'ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

এই দ্বীন কোনো নির্দিষ্ট কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সমগ্র মানবতার জন্য। এই বিধান পরিপূর্ণ। এতে কোনো সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন ও সুযোগ নেই। এতে রয়েছে এমন কিছু মৌলিক ও শাশ্বত নিয়ম-নীতি, যা মানবতাকে সর্বাবস্থায় পথনির্দেশনা দেবে; মানুষের চিন্তা-গবেষণা, চেষ্টা-সাধনা ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা : ০৩)

দিনটি ছিল জুমার দিন। রাসূল ﷺ আরাফার ময়দানে অবস্থানকালীন সময়ে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর এই আয়াতটি অবতীর্ণের পর বিশ্বনবি ﷺ ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

তিনি আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং দ্বীনের মধ্যে কখনো কমতিও হবে না এবং বৃদ্ধিরও প্রয়োজন পড়বে না। আর এজন্যই তিনি বিশ্বনবি ﷺ-এর মাধ্যমে নবি আগমনের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সুতরাং যে দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তার ভেতরে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার অধিকার কারও নেই। সেদিন বিদায় হজের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে কমপ্লিট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন; যা থেকে কিছু বাদ দেওয়ারও সুযোগ নেই, আবার নতুন করে কিছু ঢোকানোরও সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না। কেননা, সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।' (সূরা বাকারা : ২০৮)

আমাদের মাঝে অনেকেই আছে, যারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী যতটুকু মানা যায় ততটুকু মানে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে মানতে চায় না। অনেকে ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে মানলেও ইসলামের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। আবার অনেকে ইসলামি বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে এড়িয়ে যায়। এভাবে অনেকেই প্রান্তিকতামুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে মানতে চান না। তারা ইসলামের সামগ্রিক (Holistic & All Encompassing) আবেদনটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ইসলামকে আংশিক বা খণ্ডিতভাবে মানার কোনো সুযোগ আল্লাহ দেননি। মহান আল্লাহ বলেন—

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔

> 'তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান এনেছ এবং অন্য অংশের সাথে কুফরি করছ? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখিরাতে তাদের কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন।' (সূরা বাকারা : ৮৫)

ইসলামকে মানতে হবে পরিপূর্ণভাবে; কাটছাঁট করে নয়। এতেই আমাদের জন্য রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। ইসলামের বাইরে অন্য কোনো জীবন-পদ্ধতি মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়। বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখব, মানবজাতির সামনে চমক লাগানো যতগুলো মতবাদকে আনা হয়েছে, সবই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এগুলো রক্ত, বঞ্চনা ও বিভেদ ছাড়া মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি। সুতরাং ন্যায্য অধিকার, শান্তি ও কল্যাণ পেতে হলে আমাদের ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে; আঁকড়ে ধরতে হবে তাকে। উমর ﷺ বলতেন—

> 'আমরা তো এমন জাতি, যেই জাতিকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। ইসলাম ছাড়া কেউ যদি অন্য কোথাও সম্মান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করে ছাড়বেন।'
> (মুস্তাদরাকে হাকিম : ২১৪)

জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে পেয়ে আমরা গর্বিত। 'মুসলিম' পরিচয় আমাদের গর্বের নিদর্শন। ইসলামি জীবনবিধানের অনুসরণ আমাদের সার্থকতার দলিল!

ইসলামের বিধান সব দেশের, সব যুগের মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। এজন্য ইসলাম পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছে, মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে। এমনও হয়েছে যে, খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা মুসলিমরা জয় করার পর পুনরায় যখন খ্রিষ্টান সৈনিকরা সদ্য হাতছাড়া এলাকা আক্রমণ করে, তখন সাধারণ খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কারণ, তারা বুঝেছিল—ইসলাম তাদের যে অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিয়েছে, তা তাদের নিজ ধর্ম দিতে পারেনি।

বর্তমান বিশ্বেও দ্রুত প্রসারিত ধর্মের নাম ইসলাম। বিশ্ব মিডিয়ার ধারাবাহিক তথ্যসন্ত্রাস সত্ত্বেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে। মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও

ইউরোপ-আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খ্রিষ্টানরা তাদের গির্জা বিক্রি করে দিচ্ছে, আর মুসলিমরা সেগুলো কিনে নিয়ে মসজিদ বানাচ্ছে। কিন্তু কেন? কেন মানুষ যুগে যুগে ইসলাম গ্রহণ করতে পাগলপারা হয়েছে? কী আছে ইসলামে? কীসব গুণের কারণে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে?

আমরা দশটি পয়েন্টে এসব গুণ বা কারণ নিয়ে আলোচনা করব। এই গুণগুলোই ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন করেছে।

১. আর রব্বানিয়্যাহ—রবের দেওয়া ধর্ম

ইসলাম কোনো ব্যক্তি বিশেষের মনপ্রসূত ধর্ম নয়। খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ, ইসলাম, জৈনবাদ, কনফুসিয়াসিজম, হিন্দুত্ববাদ, নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ ইত্যাদিসহ পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত ধর্মের সংখ্যা প্রায় ৪৩০০টি। এ সমস্ত ধর্মের মধ্যে কেবল ইসলামই রবের পক্ষ থেকে মনোনীত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

> 'এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'
> (সূরা মায়েদা : ০৩)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে—তাহলে খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ এগুলো কী? তারাও তো দাবি করেন, তাদের নিজস্ব আসমানি কিতাব আছে। যাকে খ্রিষ্টানরা যীশুখ্রিষ্ট বলে, তাঁকে মুসলিমরা ঈসা ﷺ হিসেবে চেনে। ইহুদিরা যাকে মোজেজ বলে, মুসলিমরা তাঁকে মুসা ﷺ হিসেবে চেনেন। তারা যাকে আবরাহাম বলে, মুসলিমরা তাঁকেই ইবরাহিম ﷺ বলে। তারা বলে থাকে—খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম আবরাহামের ধর্ম। এটা ঠিক যে ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম—এই তিন ধর্মের মূলে আছেন ইবরাহিম ﷺ—এজন্য এ তিনটি ধর্মকে একসঙ্গে 'Abrahamic Faith' বলা হয়। কিন্তু আমরা আগেও বলেছি, আবরাহাম তথা ইবরাহিম ﷺ-এর ধর্ম কখনো ইহুদিবাদ বা খ্রিষ্টবাদ ছিল না; বরং ছিল ইসলাম—যেটাকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জামানায় আল্লাহ পূর্ণতা দিয়েছেন। ইবরাহিম ﷺ ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। পবিত্র কুরআনে বলা আছে—

> 'নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে ওই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা আনআম : ৭৯)

আর আল্লাহর পাঠানো তাওরাত, ইঞ্জিল বর্তমান পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব ইচ্ছামতো পরিবর্তন করেছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের আদি ও অকৃত্রিম কোনো গ্রন্থ (Scripture) তাদের হাতে নেই। তারা তাদের ধর্মে নিজেদের খেয়াল-খুশি এবং সুবিধামতো ব্যাপক নতুন জিনিস সংযোজন ও বিয়োজন করেছে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— কুরআন নাজিলের পর থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থের আইনানুগ কোনো বৈধতা (Validity) আর নেই; বরং আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগমনের পর গোটা বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের অনুসরণ এবং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালা অবধারিত ঘোষণা করেছেন।

রবের দেওয়া এ ধর্মকে কিছু মানুষ অস্বীকার করবে—এটা মহান আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। এজন্য যখন তিনি নবি-রাসূল পঠিয়েছেন, তখন আসমানি কিতাবও মুজিজাসহ পাঠিয়েছেন। যাতে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে, এ ব্যক্তি কোনো সাধারণ মানুষ নয়; বরং আল্লাহর বার্তাবাহক তথা নবি ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা একেক নবিকে একেক মুজিজা দান করেছেন। মুসা ﷺ-কে আশ্চর্যজনক লাঠি, দাউদ ﷺ-কে লোহা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, ঈসা ﷺ-কে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-কে দিয়েছিলেন অনেকগুলো মুজিজা, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো—মহাগ্রন্থ আল কুরআন; যা নাজিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত কেউ এর একটি হরফ বা হরকত বিকৃত কিংবা পরিবর্তন করতে পারেনি, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

এতেই প্রমাণিত হয়, ইসলাম মনগড়া কোনো ধর্ম বা মন-মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো মতবাদ নয়; বরং রবের দেওয়া, রবের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট একটি রব্বানি ধর্ম। এবং এটাই একমাত্র সত্য ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

'আল্লাহই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন— যাতে তিনি একে সকল প্রকার দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন; মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন।' (সূরা তাওবা : ৩৩)

২. আল ইনসায়্যাহ—মানবতার ধর্ম

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতাকে রক্ষার জন্যই ইসলাম কাজ করে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় যখন পৃথিবী অত্যাচারিত, অবাধ-পাপাচারে নিমজ্জিত, তখনই ইসলাম শান্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। আর ইসলাম নতুন ও পূর্ণাঙ্গরূপে এসেছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। তিনি ইসলামের এই শান্তির বাণী নিয়ে এসেছেন বলেই তাঁকে বলা হয় জগতের রহমত। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

'হে নবি! আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-

'পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা বাকারা : ২৯)

ইসলাম এসেছে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলাম কখনো ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর চাপাচাপি করেনি; বরং মহান আল্লাহ বলেন—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-

'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।' (সূরা বাকারা : ২৫৬)

ইসলাম মানুষকে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছে। মানুষ চাইলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, আবার চাইলে অন্য ধর্মও গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য দুনিয়াতে মানবাধিকারের কোনো তারতম্য হবে না। কতই না উত্তম এই দ্বীন!

আপনি মুসলিম হন কিংবা কাফির, মুমিন হন বা মুশরিক—ইসলাম আপনাকে বিবেচনা করে একজন সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে—

> 'একবার বিশ্বনবি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের সামনে দিয়ে একজন ব্যক্তির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিশ্বনবি ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে সাহাবিরাও দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবিরা বুঝতে পারলেন, লাশটি একজন ইহুদির। তাঁরা রাসূল ﷺ-কে বললেন—"এটা তো একটা ইহুদির লাশ (অর্থাৎ আপনি ইহুদি লাশের সম্মানার্থে দাঁড়ালেন!)" রাসূল ﷺ বললেন—"সে কি একজন মানুষ নয়?"' (সহিহ বুখারি : ১৩১২)

অন্য ধর্মের একজন লোকের লাশ দেখে তার সম্মানার্থে দাঁড়ালেন সর্বকালের সেরা মানব মুহাম্মাদ ﷺ; এটাই ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা! আর আমরা মুসলিম হয়ে অপর মুসলিম ভাইকে সম্মান দেখাতে চাই না। আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতে চাই না। আমরা আগে খুঁজি সে কোন দল করে? কোন পীরের মুরিদ? কোন জেলায় বাড়ি? এভাবে আমরা শুধু বিভাজনে ব্যস্ত থাকি।

নবম হিজরিতে নাজরান থেকে ৬০ জন খ্রিষ্টান প্রতিনিধির একটি দল রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় এসেছিল। যেহেতু তারা আহলে কিতাব ছিল, তাই প্রতিনিধি দলটিকে রাসূল ﷺ মসজিদে নববিতে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং তারা মসজিদে নববির ভেতর পূর্বদিকে মুখ করে (তাদের কিবলা অনুযায়ী) তাদের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছিল।

রাসূল ﷺ তাদের মানুষ হিসেবে সম্মান দেখিয়েছেন। খ্রিষ্টান হওয়ার কারণে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি বা কোনো ধরনের ঘৃণা কিংবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি। এটাই ইসলামের সুমহান শিক্ষা। কারণ, ইসলাম মানবতার ধর্ম।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমরা যখন বন্যার্ত কোনো এলাকায় ত্রাণ সহযোগিতা নিয়ে হাজির হই, তখন আমরা শুধু মুসলমানদেরই ত্রাণ দিই না; বরং মুসলিম-অমুসলিম, আস্তিক-নাস্তিক সবার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াই। কারণ, মানবতা যেখানে বিপন্ন, সেখানে মুসলিম-অমুসলিম কোনো বিভাজন নেই—ইসলাম আমাদের এটাই শেখায়।

৩. আশ-শুমুল—ব্যাপকতার ধর্ম

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। অন্যান্য মতবাদগুলোর মতো ইসলাম শুধুই একটি মতবাদ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, রান্নাঘর থেকে সংসদ ভবন, কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে মঙ্গলে মহাকাশযান প্রেরণ, পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই এই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ-

'আমি কিতাবে কোনো কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখিনি।'
(সূরা আনআম : ৩৮)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা যেমন : ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা—এ সবকিছুর ব্যাপারেই মৌলিক আলোকপাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

পূর্ববর্তীদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে কুরআন বলছে—

'তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছেনি? নুহের জাতির, আদ, সামুদ ও ইবরাহিমের জাতির, মাদইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিগুলো উলটে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর? তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিলেন।' (সূরা তাওবা : ৭০)

ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের মূলকথা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

'অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা, তারা মজলুম এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলেছিল—"আল্লাহ আমাদের রব।" যদি আল্লাহ লোকদের একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশি করে উচ্চারণ করা হয়, সেসব আশ্রম, গির্জা, ইবাদতখানা

ও মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হতো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।' (সূরা আল-হাজ্জ : ৩৯-৪০)

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো, যতক্ষণ না বিশৃঙ্খলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়, তাহলে জেনে রাখো—জালিমদের ছাড়া আর কারও ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।' (সূরা বাকারা : ১৯৩)

ইসলামে জিহাদ হলো মজলুমকে উদ্ধার করার মিশন। সমাজের সংস্কার, অন্যায়ের দমন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে গঠনমূলক প্রতিবাদ, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে সহায়তা প্রদান—এ রকম শত শত ইসলামসম্মত উপায়ে একজন মুসলিম জিহাদ করতে পারে। জিহাদ আর জঙ্গিবাদ এক নয়। জঙ্গিবাদ ইসলামে হারাম আর জিহাদ করা ফরজ।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন বর্ণনায় সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—

'তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে যাতে ধন-ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত না হয়।' (সূরা হাশর : ০৭)

জ্যোতির্বিদ্যা তথা গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'আমি তোমাদের কাছের আসমানকে সুবিশাল দ্বীপমালায় সজ্জিত করেছি।' (সূরা মুলক : ০৫)

'আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম হিসেবে।' (সূরা আনআম : ৯৭)

'যারা (নবির কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী একসাথে ছিল—তারপর আমি তাদের আলাদা করলাম?' (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

এভাবেই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশসমূহের সৃষ্টির মৌলিক বিবরণ রয়েছে। কুরআনে জীববিদ্যার কথাও নিগূঢ়ভাবে বর্ণিত রয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'(তোমাদের রব) জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক : ০২)

'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।' (সূরা তারিক : ৬-৭)

'তারপর আমি তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপকে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি।' (সূরা মুমিনুন : ১৩)

কুরআনে উদ্ভিদবিদ্যার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—কীভাবে মহান আল্লাহ শস্য উৎপাদন করেন, কীভাবে বিশাল বৃক্ষ তৈরি করেন। পবিত্র কুরআনে বলা আছে—

'এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং জয়তুন, খেজুর, আঙুরসহ নানাবিধ ফল জন্মান।' (সূরা নাহল : ১১)

Water cycle/ Hydrologic cycle সম্পর্কে কুরআন বলছে—

'তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন? তারপর তুমি দেখতে পাও—তার খোল থেকে বৃষ্টি-বিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত পাহাড়গুলোর বদৌলতে। শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎ চমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।' (সূরা নুর : ৪৩)

Zoology বা প্রাণিবিদ্যাসংক্রান্ত কুরআনিক আয়াত—

'আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই। অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ—যা পানকারীদের জন্য বড়োই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।' (সূরা নাহল : ৬৬)

'আর দেখ, তোমার রব মৌমাছিদের এ কথা ওহির মাধ্যমে বলে দিয়েছেন—তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চোষো এবং নিজের রবের তৈরি করা পথে চলতে থাকো। এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রঙের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য। অবশ্যই এর মধ্যেও একটি নিশানি রয়েছে তাদের জন্য—যারা চিন্তা-ভাবনা করে।' (সূরা নাহল : ৬৮-৬৯)

Biological aspects of mountains নিয়ে কুরআনের বক্তব্য—

'পাহাড়গুলোকে গেড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো।' (সূরা নাবা : ০৭)

'পাহাড়ের পাথরের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের শুভ্র, রক্তিম ও নিকষকালো রেখা।' (সূরা ফাতির : ২৭)

এ রকম অসংখ্য প্রাকৃতিক ইস্যু (Natural Phenomena) নিয়ে কুরআন আলোকপাত করেছে।

এমনিভাবে জীবন ও সমাজের প্রতিটি অঙ্গনকে টার্গেট করে করে ইসলাম আমাদের গাইডলাইন দিয়েছে। সেখান থেকে উদাহরণস্বরূপ কেবল দুই-একটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মানব প্রয়োজনীয় পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ইসলাম ধর্মে উল্লেখ আছে। সকল জীবন-সমস্যা সমাধানের মূলনীতি এই ধর্মে রয়েছে। তাই এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান—যা ব্যাপকভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

৪. আল উমুম—সর্বজনীন ধর্ম

ইসলাম পৃথিবীর বুকে মানুষের হিদায়াতের জন্যই এসেছে। তাই ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ কোনোরূপ কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া তৈরি করেননি। মানুষ যে বর্ণের, যে গোত্রের কিংবা দেশেরই হোক না কেন, ইসলামের চোখে সবাই সমান। যে কেউ চাইলেই ইসলামে প্রবেশ এবং বিশ্বাসী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো; যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে—যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।' (সূরা বাকারা : ২১)

এভাবেই সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াত, সূরা নিসার ০১ নং আয়াত, সূরা নিসার ১৭০ নং আয়াত, সূরা নিসার ১৭৪ নং আয়াত, সূরা আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ৫৭ নং আয়াতসহ কুরআনের বহু জায়গায় পৃথিবীর সকল মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ বক্তব্য প্রদান করেছেন—যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যভরে সহজভাবে এ শান্তির ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। কেউ যেন মনে না করে—এই ধর্মে আমার প্রবেশাধিকার নেই কিংবা প্রবেশাধিকার কঠিন।

যেমন—ইহুদি ধর্মে কেউ প্রবেশ করতে চাইলে তাকে জন্মসূত্রে ইহুদি হতে হয়, নয়তো সে কখনো ইহুদি হতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ চাইলেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

'The door of Islam is open for everyone. All are welcome to Islam.'

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'রব্বুল আলামিন' অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববাসীর রব। পবিত্র কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'জিকরুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশবাণী। বিশ্বনবি ﷺ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'রহমাতাল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। কোথাও বলেননি যে, এই কুরআন কিংবা ইসলাম কেবল মুমিনদের কিংবা মুত্তাকিদের জন্য; বরং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যই। তাই এটা বিশ্বজনীন ধর্ম।

৫. আত-তাইসির—সহজতার ধর্ম

ইসলাম একটি সহজ ধর্ম। Simplicity is the beauty of Islam; এর বিধিবিধানে কোনো কাঠিন্য নেই। কারণ, আল্লাহ নিজেই সহজ করাকে পছন্দ করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

- 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।' (সুরা বাকারা : ১৮৫)
- 'আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।' (সুরা বাকারা : ২৮৬)
- 'এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো জটিলতা বা সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।' (সুরা হাজ্জ : ৭৮)

যেমন : ইসলামে নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ। কিন্তু আপনার যদি দাঁড়াতে সমস্যা হয় অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তবে আপনার জন্য বসে পড়ার সুযোগ ইসলাম রেখেছে। যদি বসেও পড়তে না পারেন, তবে শুয়ে পড়তে পারবেন। তবুও আল্লাহ আপনার নামাজ কবুল করে নেবেন। আবার ধরুন, ইসলামে অজু করে নামাজ আদায় করা ফরজ, কিন্তু আপনার সংগ্রহে পানি নেই। সেক্ষেত্রে মাটি বা বালু দিয়ে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করলেও আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেবেন। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি বিধানেরই সমস্যা সাপেক্ষে এভাবে বিকল্প সমাধান রয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন—

> 'দ্বীনের বিধিবিধান অত্যন্ত সহজ-সরল। কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে, সে পরাজিত হবে। তাই সবার উচিত, সঠিকভাবে দৃঢ়তার সাথে ইসলামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা, বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলে ধীর-স্থিরভাবে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, আল্লাহর রহমত ও করুণার আশা পোষণ করা, সকাল-বিকেল ও শেষরাতে নফল ইবাদত দ্বারা অধিক নৈকট্য লাভ করা এবং উন্নতির পথে সাহায্য গ্রহণ করা।' (সহিহ বুখারি : ৩৫)

অন্য হাদিসে আনাস রা. হতে বর্ণিত—

> 'রাসুল ﷺ বলেন—তোমরা সহজপন্থা অবলম্বন করো, কঠিনপন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে দ্বীনের সুসংবাদ দাও, দ্বীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না।' (সহিহ বুখারি : ৬৯)

৬. দ্বীনুল ফিতরাত—স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম হলো প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। পৃথিবীর বুকে যত শিশু জন্মায়; হোক সে নারী কিংবা পুরুষ—প্রত্যেকেই দ্বীনি ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই মুসলিম হয়ে জন্মায়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে—

> 'কাজেই একনিষ্ঠভাবে নিজের চেহারা এ দ্বীনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করো। আল্লাহ মানুষকে যে ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছে, তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।' (সূরা রুম : ৩০)

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেটাই হলো 'ফিতরাত'। মানুষের প্রকৃতিতেই রয়েছে মহান ও শাশ্বত সত্তার সামনে নিজেকে উৎসর্গ করার সহজাত প্রেরণা। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যদি মানুষ সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়, তাহলে খুব সহজেই সে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে এবং ইসলামকে চিনতে ও মানতে তার বেগ পেতে হয় না। ফলে সে ইসলামকেই সঠিক ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

আর মহান আল্লাহ যে ফিতরাতের প্রতিষ্ঠিত করেন, তা হলো ইসলামি ফিতরাত। আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ বলেছেন—প্রত্যেক সন্তানই ইসলামি ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, নাসারা বা অগ্নিপূজক বানায়।' (সহিহ বুখারি : ১৩৫৮)

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, প্রতিটি শিশুই ইসলামি ভাবধারা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তাকে বিপথগামী করে।

৭. দ্বীনুল ইলম—জ্ঞানের ধর্ম

পৃথিবীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে জ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করতে হবে। দখলে রাখতে হবে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় জ্ঞানের রাজপথ। ইসলাম তাই জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা মূল্যায়ন করে। কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াতের প্রথম শব্দ হলো—'ইকরা' বা পড়ো। অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণের নির্দেশনা দিয়েই কুরআনের যাত্রা শুরু হয়েছে।

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'
(সূরা আলাক : ০১)

যারা জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করে অথবা সত্যকে জেনে গ্রহণ করে, ইসলাম তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন।' (সূরা মুজাদালাহ : ১১)

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন—

'আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানী নয়, তারা কি কখনো সমান হতে পারে?' (সূরা জুমার : ০৯)

হাদিসে উল্লেখ আছে—আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'
(ইবনে মাজাহ : ২২৪)

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয়, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় আছে বলে গণ্য হয়।' (সহিহ আত-তারগিব : ৮৮)

অন্য হাদিসে আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে—

'রাসূল ﷺ বলেছেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টি, এমনকী গর্তের পিঁপড়া ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত শিক্ষাগুরুদের জন্য দুআ ও মঙ্গল কামনা করে।'
(জামে আত-তিরমিজি : ২৬৮৫)

ইসলাম একটি জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম (Knowledge based religion)। এখানে ইজতিহাদ বা Critical Thinking-কে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম যেহেতু একটি নিখুঁত মতাদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই জ্ঞান ছাড়া এ আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার অনুসারী হওয়া যায় না। সহজ কথায় বলতে গেলে—ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যার অপরিহার্য দাবি হলো—

তাকে পর্যাপ্ত জানা, অতঃপর মানা। প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যিনি ইসলামকে জানেন ও মানেন। কর্মে ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ ঘোষণা করেছে। জ্ঞান মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করে, দূরদর্শিতা সৃষ্টি করে। তাই মূর্খতা বা অজ্ঞানতার স্থান ইসলামে নেই।

৮. দ্বীনুস-সালাম—শান্তির ধর্ম

ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি আরবি সালাম শব্দ থেকে, যার শাব্দিক অর্থ শান্তি। যে ধর্মের নামই শান্তি থেকে উৎপন্ন, সে ধর্ম কতটা শান্তিপ্রিয়—তা সহজেই অনুমেয়। ইসলাম সব সময় শান্তির বার্তা শোনায়, শান্তির বার্তা বহন করে, শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

> 'যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন এবং নিজ ইচ্ছায় তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।' (সূরা মায়েদা : ১৬)

পৃথিবীর মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলাম কখনো পছন্দ করে না; বরং কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইলে ইসলাম তাকে বাধা দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস : ৭৭)

> 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে তথা শান্তির ধর্মে প্রবেশ করো।' (সূরা বাকারা : ২০৮)

পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে কারও অধিকার নেই সেখানে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি করার। কুরআনে স্পষ্টভাবে নিষেধ আছে—

> 'দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।' (সূরা আ'রাফ : ৫৬)

রাসূল ﷺ যত রাজা-বাদশাহর কাছে দাওয়াতি চিঠি পাঠিয়েছেন, প্রতিটি চিঠিতেই লেখা থাকত—'সালামুন আলা মানিত্তাবাআল হুদা—যারা হিদায়াতের অনুসারী, তাদের প্রতি শান্তির বার্তা'। 'আসলিম, তাসলাম'—'ইসলাম কবুল করো,

শান্তিতে বা নিরাপদে থাকবে।' এভাবেই মদিনা থেকে শান্তির পয়গাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছানো হয়। সুতরাং সালামই এ ধর্মের পরিচয় ও নিদর্শন। শান্তিই এর আহ্বান ও পথ-পন্থা। ইসলাম সর্বতোভাবে শান্তিকে ধারণ এবং চূড়ান্ত শান্তির জন্যই মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে।

৯. আল ওয়াসাতিয়্যাহ—মধ্যমপন্থি ধর্ম

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) এবং বাস্তবধর্মী (Rational) জীবনব্যবস্থা। ইসলাম যেমন কঠোরতাকে অপছন্দ করে, তেমনিই শিথিলতাকেও অপছন্দ করে। বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ি—এ দুইয়ের মাঝখানে ইসলামের অবস্থান। ইসলাম পছন্দ করে মধ্যমপন্থাকে। এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। মুসলিম জাতিকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মধ্যমপন্থি উম্মত হিসেবে। ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল ওয়াসাতিয়্যাহ। আল ওয়াসাতিয়্যাহ-এর অর্থ হলো—মধ্যমপন্থা। 'Moderation' শব্দটি আল ওয়াসাতিয়্যাহ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেও 'Balanced Nature of Islam' বা ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি হলো এর যথাযথ ভাবার্থ। অর্থাৎ চিন্তায়, বিশ্বাসে, কাজে ও আচরণে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের নামই হলো—আল ওয়াসাতিয়্যাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-

'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি—যাতে করে তোমরা পুরো মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং যাতে রাসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।'
(সূরা বাকারা : ১৪৩)

'মধ্যমপন্থি উম্মত' অর্থাৎ সবকিছুর ঠিক মাঝখানে অবস্থান করা ও বিশেষ কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়া। এটাকেই এ আয়াতে উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ উম্মত তার সবকিছুতেই ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দেবে। কোনো ক্ষেত্রে প্রান্তিকতার পরিচয় দেবে না। বাড়াবাড়ি করবে না আবার শিথিলতাও দেখাবে না। এমনটা করলে সে নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে, অন্যদের মতো প্রান্তিক ও একরোখা সম্প্রদায়ে পরিণত হবে; ইহুদি, খ্রিষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছিল। উম্মাহ যাতে তার মধ্যমপন্থি বৈশিষ্ট্য না হারায়, তাই সকল কাজে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

বিশ্বনবি ﷺ ইরশাদ করেন—

'তোমরা আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, বাড়াবাড়ি করো না। সকাল-সন্ধ্যায় (ইবাদতের জন্য) বের হয়ে পড়ো এবং রাতের কিছু অংশেও। তোমরা অবশ্যই পরিমিতি রক্ষা করে চলবে। তাহলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।' (সহিহ বুখারি : ৬৪৬৩)

হাদিসে বলা আছে—

'আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, নবি ﷺ বললেন—তোমরা সহজ পথে থাকো এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।' (সহিহ বুখারি : ৩৯)

'আয়িশা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বললেন—তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যমপন্থায় নেক আমল করতে থাকো।' (সহিহ বুখারি : ৬০২০)

সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে তাঁর অনুগ্রহ ও উচ্চ মর্যাদার জন্য মনোনীত করা সত্ত্বেও তারা এই অনুগ্রহের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। ফলে, তাদের পরিবর্তে অধিক নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদিকে আল্লাহ তায়ালা মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন, ভূষিত করেন শ্রেষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর মর্যাদায়। অর্থাৎ, জাতি হিসেবে আমরা পুরো মুসলিম উম্মাহ হলাম মধ্যমপন্থি জাতি বা উম্মাহ। এটি এই উম্মাহর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অজ্ঞতাবশত অথবা অবহেলার কারণে আমাদের মাঝে ইসলামের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশেই অনুপস্থিত। মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত।

মধ্যমপন্থা মানুষকে সম্মান ও মূল্যায়ন করতে শেখায়, মানুষকে ভাবতে ও বাস্তবধর্মী চিন্তা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। মানুষকে জীবনসংগত ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলে। তাই ইসলাম জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মধ্যমপন্থাকে অবলম্বন করতে তাগিদ দেয়।

১০. আল উদুহ—স্পষ্টতার ধর্ম

ইসলামে অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই। ইসলামে যা কিছু আছে, সবই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ইসলামে অস্পষ্ট কোনো নিয়ম বা বিধান নেই। নেই কোনো গোঁজামিল। হিন্দুধর্মে দেখা যায়, তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ ধরতে পারবে না।

ইসলামে এমন গোপনীয়তা ও শ্রেণি-বিভাজন নেই। ইসলাম সবার জন্য; প্রত্যেকেই এর স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন। প্রত্যেকেই এর আলোতে আলোকিত হতে পারেন।

বিশ্বনবি ﷺ ইরশাদ করেন—

> 'তোমাদের জন্য আমি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল প্রমাণাদি রেখে গেলাম। এর পরও যদি কেউ বিপথগামী হয়, সে নিতান্তই দুর্ভাগা।'
> (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪৩)

ইসলামের দাওয়াত

ইসলাম এসেছে মানবজাতিকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য। এই হিদায়াত পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে। তাই যারা এই হিদায়াতের দিশা পেয়েছে, তাদের দায়িত্ব হলো অন্যের নিকটও তা পৌঁছে দেওয়া—যাতে সে-ও এই সত্য গ্রহণের সুযোগ পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আপনার নিকট আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন আপনাকে সেগুলো থেকে বিমুখ না করে। আপনি প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' (সূরা কাসাস : ৮৭)

> 'তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং নিজে নেক আমল করে। আর বলে, আমি অবশ্যই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'
> (সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৩৩)

দাওয়াতি কাজ মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কেউ ইসলামের একটি বাণী জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য।

> 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—তোমরা আমার নিকট হতে একটি বাণী হলেও পৌঁছে দাও।'
> (সহিহ বুখারি : ৩৪৬১)

আমরা কেন দাওয়াতি কাজ করব

আল্লাহ দুনিয়া পরিচালনার জন্য সরাসরি সবকিছু করেন না। এর জন্য তিনি একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন; দুনিয়াতে মানুষকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানুষই আল্লাহর হয়ে তাঁর বিধানগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে। এর মাধ্যমে সে নিজের মুক্তিও নিশ্চিত করবে, অন্যকেও মুক্তির পথ দেখাবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন—

'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।' (সূরা বাকারা : ৩০)

আমরাই সে প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের অনেকগুলো দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হলো—আল্লাহর বাণী প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

যুগে যুগে যত নবি-রাসূল এসেছেন, তাঁদের প্রধান কাজই ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। আর এই আহ্বানের মাধ্যমে আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দ, সভ্যতা ও বর্বরতার মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করে সত্য ও সুন্দরের মডেল মানুষের কাছে উপস্থাপন করা। আর সেই মডেলই হচ্ছে ইসলাম।

হিকমাহ তথা প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের সৌন্দর্যকে উত্তমরূপে উপস্থাপন করা, মানুষকে তা গ্রহণের জন্য আহ্বান করা এবং আখিরাতই যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য—তা মানুষকে বোঝানোই দাওয়াতের মূল কাজ। আমরা দুনিয়ায় ছিলাম না, এখন আছি আবার ভবিষ্যতে থাকব না। যখন ছিলাম না, তখন কী ছিলাম? কোথায় ছিলাম? এখন আছি, কেন আছি? আবার থাকব না, তাহলে কোথায় যাব? এরপরে কী হবে? আমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহিতা কি করা লাগবে না? কার কাছে জবাবদিহি করব? জবাবদিহিতা করতে না পারলে কি ভয়ানক শাস্তি হবে? এই বিষয়গুলো তুলে ধরে ইসলামের বীজ বুনে দেওয়াই হচ্ছে দাওয়াতের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই কাজগুলো যুগে যুগে নবি-রাসূলগণ করেছেন। এখন আর নবি-রাসূল আসবেন না। বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা দিয়েছেন।

'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম। ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা : ০৩)

তাই এই মহান কাজ এখন আমাদেরই করতে হবে এবং তা নিজেদের মুক্তির জন্যই।

দাওয়াতি কাজের সময় খেয়াল রাখুন

এক. আশাবাদী করুন, হতাশ করবেন না

আজকের এই নৈরাশ্যের পৃথিবীতে মুসলিমদের মনে আশার বীজ বুনতে হবে। আশা মানুষকে উজ্জীবিত করে, অন্যদিকে হতাশা মানুষকে নির্জীব করে। তাই ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যের কথা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের একটা দারুণ দাওয়াহ অ্যাপ্রোচ শিখিয়ে দিয়েছেন–

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا-

> 'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং (লোকদের) সুসংবাদ দাও, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না।' (সহিহ বুখারি : ৬১২৫)

আমরা অনেক সময় দ্বীনকে খুব কঠিন করে ফেলি। অবস্থাটা এমন, আল্লাহ তায়ালা ছাড় দিতে চাইলেও আমরা ছাড় দিতে চাই না। এতে দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী অথবা সদ্য দ্বীনে ফেরা ভাই-বোনেরা খুব বিপাকে পড়ে যান। অনেক সময় তারা নিরুৎসাহিত (Di-motivated) হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যান। তাই মানুষকে আশাবাদী করতে হবে, হতাশ করা যাবে না। পরিবর্তন ধীরে ধীরে করতে হয়। সহজ থেকে আস্তে আস্তে কঠিন নিয়মে যেতে মানুষের সুবিধা হয়। শুরুতেই বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিলে সেটা ধারণ করার ক্ষমতা অনেকেই রাখেন না।

দুই. সব সময় ভুলের দিকে ইঙ্গিত করবেন না

মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভুলের চেয়ে গুণের কথা বেশি বলুন। এতে সে ইসলামের কথা শুনতে আগ্রহী হবে। আর যত আগ্রহী হবে, ততই সে সত্য বাণী জানতে পারবে। আর জানতে জানতে আস্তে আস্তে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাবে। তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে (সরাসরি) ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ফোকাস করা থেকে বিরত থাকুন। রাসূল ﷺ নিজের দাওয়াতি আচরণে সরাসরি ত্রুটি ও ভুল ফোকাস করার শিক্ষা দেননি।

কাউকে সংশোধন করতে রাসূল ﷺ কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন, তা আমাদের জানতে হবে। তিনি কাউকে সংশোধন করতে চাইলে সাধারণত তার নাম উল্লেখ করতেন না; বরং তার ভুল বা মন্দ কাজটিকে তুলে ধরতেন। কারও মন্দ কোনো কাজ রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি ভরা মজলিশে বলে উঠতেন—'مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا' বা 'مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا'

অর্থাৎ 'তাদের কী হলো যে তারা এটা এটা করে' বা 'তাদের কী হলো যে তারা এটা এটা বলে।' এ কথা শুনে যেসব সাহাবি এমনটি করেছিলেন বা বলেছিলেন, তাঁরা সাবধান বা সংশোধন হয়ে যেতেন। যারা এমনটি করেননি বা বলেননি, তাঁদের জন্যও এটা একটা দাওয়াহ হয়ে যেত, সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর ও নির্মল ছিল প্রিয়নবির সংশোধন পদ্ধতি! রাসূল ﷺ-এর অনুপম সংশোধননীতিতে মুগ্ধ ছিলেন তাঁর সাহাবিরা।

কারও প্রতি আগ্রাসী হয়ে দাওয়াতি কাজ করতে যাবেন না; বরং কোমল ভাষায়, দরদমাখা মন নিয়ে কথা বলুন। কোমলভাষীকে মানুষ বেশি পছন্দ করে। রাসূল ﷺ নিজেও অত্যন্ত কোমলভাষী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ-

'(হে নবি!) এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়োই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

কারও প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে, দরদমাখা মন নিয়ে, হৃদয় থেকে যে আহ্বান করা হয়—সে আহ্বান মানুষের হৃদয়ে গিয়ে স্পর্শ করে। তাই আমাদের দাওয়াতি কাজে স্মার্ট প্রেজেন্টেশনটা খুব জরুরি। ইসলামের পজেটিভ প্রেজেন্টেশন সকল নেগেটিভিটিকে ম্লান করে দেবে, ইনশাআল্লাহ।

তিন. কমন মিল খুঁজে বের করুন

দাঈ ইলাল্লাহদের উচিত, ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের সাধারণ মিল খুঁজে বের করা। দাওয়াতে এমন কিছু আলাপ তুলুন, যা অন্যদের সাথেও মিলে যায়। এতে তাদের উদ্‌বিগ্নতা কমবে, আস্থা বাড়বে এবং দাঈকে কাছের মানুষ মনে করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

> 'হে নবি! আপনি ঐশী গ্রন্থের অনুসারী বা আহলে কিতাবদের বলুন—"আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে মিল আছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা না করি এবং তার সাথে কোনো শরিক বা অংশীদার স্থির না করি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা পরস্পর কাউকে যেন প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করি।" এরপর তারা যদি ফিরে যায়, তবে তাদের বলুন—"সাক্ষী থাকো যে আমরাই মুসলিম বা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"'
> (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

মিলের বিষয়গুলো সামনে রাখলে ঐক্যপ্রক্রিয়া সহজ হয়। আর অমিলের ব্যাপারগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তৈরি হয় বিভেদ আর সহিংসতা।

চার. নিজের আচরণ দিয়ে ম্যাসেজ পৌঁছানোর চেষ্টা করুন

উমর ফারুক ﵁ বলতেন—'তোমরা কোনো বাক্য ব্যয় না করে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাও।' তাঁর সাথিরা বলল—'কথা না বলে দাওয়াত দেবো কী করে?' তিনি বললেন—'তোমাদের আচরণ দিয়ে।'

তাই, একজন দাঈকে চলনে—বলনে, আচরণে সততা ও রুচিশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এটাই ফলপ্রসূ (Effective) দাওয়াহ হিসেবে কাজ করবে।

পাঁচ. কপটতা ও কৃত্রিমতা পরিহার করুন

দাওয়াতি চরিত্রে কোনো প্রকার কপটতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ সহজ ও সাবলীল হওয়ার চেষ্টা করুন। একজনকে এমন কাজ করতে নিষেধ করা যাবে না—যা আপনি নিজেই করেন। কাউকে বললেন সুদ খাওয়া যাবে না, কিন্তু গোপনে আপনি সুদের সাথে জড়িত। এই চরিত্রের মুখোশ একদিন উন্মোচিত হবেই। নিজে তাকওয়ার কাছাকাছি না থেকে অন্যকে তাকওয়ার নসিহা করবেন না। যে আমল আপনি করেন না, তা অন্যকে করতে বলবেন না।

ছয়. শারীরিক ভাষা

একজন দাঈর শারীরিক ভাষা ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হওয়া চাই। লোকে প্রথমত আপনার চোখের ভাষা বুঝতে চায়, দ্বিতীয় ধাপে আপনার জ্ঞানের গভীরতা মাপে।

চেহারা-সুরত নিয়ে পেরেশানির দরকার নেই। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকা চাই। যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, আপনাকে দেখে সে যেন ধারণা করে না বসে—আপনি অলস, অপরিচ্ছন্ন, উদাসীন। বলা হয়—First impressions are the most lasting.

সাত. অপমান করবেন না

কারও আদর্শিক অবস্থান নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন না। কোনো আদর্শের অনুসারীদের অপমান করবেন না। ইসলাম অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে। আমাদের দায়িত্ব ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া—কারও চিন্তাকে আক্রমণ করা নয়। আমরা কেবল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, রাব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

'হে নবি! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারো না, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যারা হিদায়াত গ্রহণ করে, তাদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।' (সূরা কাসাস : ৫৬)

আট. যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার গভীরে যাবেন না

একজন দাঈকে জ্ঞান-দুনিয়ার সব বিষয়ে এক্সপার্ট হতে হবে—এমন নয়। তবে জ্ঞান নেই, এমন বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করা যাবে না। উত্থিত প্রশ্নের জবাব দিতে প্রয়োজনে সময় নিন। কিন্তু গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেবল ততটুকু বলা উচিত, যতটুকুর যথার্থতা নিয়ে আপনি শতভাগ কনফিডেন্ট।

নয়. কমনসেন্স ব্যবহার করুন

ইসলামের প্রাথমিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহর অধিকাংশই 'কমনসেন্স'-এর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যায় কমনসেন্স ব্যবহার করুন, তাহলে অন্যকে খুব সহজেই আস্থায় আনা যায়। আমরা বুঝানোর চেষ্টা করব, কীভাবে ইসলাম চলমান সংকটে বাস্তবসম্মত সমাধান হাজির করার ক্ষমতা রাখে। আধুনিক সংকট মোকাবিলায় ইসলামের কার্যক্ষমতা সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারাটাই আমাদের সার্থকতা।

দশ. স্মার্ট হোন

যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নিতে হবে। প্রত্যেকের লেভেল জেনে কথা বলা উচিত। ব্যক্তিভেদে অ্যাপ্রোচ ভিন্ন হবে। যাকে যেভাবে দাওয়াত দিলে অথবা যে সোসাইটিতে যে আপ্রোচে দাওয়াত দিলে দাওয়াতি কাজ অধিক ফলপ্রসূ হবে, সেখানে সেই আপ্রোচে দাওয়াত দিন। Be smart, because you are the ambassador of Islam.

ইসলাম এক শাশ্বত জীবন বিধানের নাম—যা মানব-প্রকৃতির জন্য সর্বাধিক বেশি সামঞ্জস্যশীল। এই বিধান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ইসলামের বিধিবিধানগুলো রুচিসম্মত, স্বাস্থ্যসম্মত, যৌক্তিক ও পরিবেশবান্ধব। ইসলাম মানুষকে তার সৃষ্টিগত মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়; মুক্তির পথ বাতলে দেয়। আর দিকে দিকে ধ্বনিত করে মানবতার জয়ধ্বনি! তাই আমাদের উচিত পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে ধারণ করা এবং এর সুমহান বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া।

স্মার্ট প্যারেন্টিং

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ এক নিয়ামত; একই সঙ্গে দুনিয়ার সৌন্দর্যের প্রতীক। সন্তান জীবনকে সুশোভিত করে, হৃদয়কে করে প্রশান্ত। চাঞ্চল্যে মাতিয়ে রাখে পুরো বাড়ি! ভ্রমর ছাড়া যেমন ফুলবাগানের রূপ পূর্ণতা পায় না, তেমনি সন্তান ছাড়াও ঘরের সৌন্দর্য অপূর্ণই থেকে যায়। সন্তানের ছোটাছুটি, হাসি-কান্না, অনুযোগ-আবদার, রাগ-অভিমান—সবই পিতা-মাতার প্রফুল্লতার উৎস। এসব না থাকলে ঘর যেন শূন্য-হাহাকার, ধু-ধু মরুভূমি। জীবনের এই পরম নিয়ামতকে প্রত্যেক দম্পতিই অনুভব করেন। যার সন্তান নেই, তিনিই বোঝেন সন্তান না থাকার কী কষ্ট। স্বয়ং নবি-রাসূলগণও সন্তানহীনতার বিরহ থেকে মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন! মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম ﷺ বৃদ্ধ বয়সে এসে আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছেন—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

'হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।' (সূরা সফফাত : ১০০)

সাইয়্যিদুনা জাকারিয়া ﷺ বৃদ্ধ বয়সে কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে সন্তানহীনতার কষ্ট থেকে পানাহ চেয়েছেন—

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ-

'হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখবেন না। আপনি তো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।' (সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

সন্তান এমন সম্পদ, যা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও আমলনামা সচল রাখে। সন্তানের ভালো কাজের একটি অংশ পিতা-মাতা কবর থেকেই লাভ করেন। সন্তানকে যদি সুসন্তানরূপে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেই সন্তান পিতা-মাতার জন্য নিয়ামতস্বরূপ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা, নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রুপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৪)

আর যদি সন্তানকে ঠিকমতো গড়ে তোলা না যায়, তাহলে তা হবে পিতা-মাতার জন্য ফিতনাস্বরূপ। আল্লাহ কুরআনে বলেন—

> 'আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনাস্বরূপ।' (সূরা আনফাল : ২৮)

অনেকে সন্তানকে একটু বেশি সুখ দেওয়ার জন্য, একটু ভালো স্কুলে পড়াশোনা করানোর জন্য অবৈধ পথে পা বাড়ান। এমন পথ অবলম্বন করা হলে সেই সন্তান হবে পিতা-মাতার জন্য বিপদের কারণ। কিয়ামতের মাঠে এই সন্তানের জন্য পিতা-মাতা আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।'
> (সূরা আত-তাগাবুন : ১৪)

কুরআন সন্তানকে মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে : সৌন্দর্যের প্রতীক, ফিতনার উৎস এবং শত্রু। এই তিন ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা কোন ধরনের সন্তান চাই—তা নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। যদি সৌন্দর্যের প্রতীক সুসন্তান চাই, তবে এর জন্য পিতা-মাতাকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে; আরেকটু ঢেলে সাজাতে হবে নিজেকে।

গরুর পেট থেকে জন্ম নিলে গরু হয়, ছাগলের পেট থেকে জন্ম নিলে ছাগল হয়, কিন্তু মানুষের পেট থেকে জন্ম নিলেই 'মানুষ' হয় না। তাকে 'মানুষ' করতে হয় বা 'মানুষ' বানাতে হয়। স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে না তুললে তারা মানুষ হতে পারে না; হাত-পা-চোখওয়ালা এক অমানুষে পরিণত হয়। খালি চোখে আমরা যাদের দেখি, এরা সবাই মানুষ নয়; জনগণ।

কবি ফররুখ আহমদ বলেছিলেন—

'মানুষ খুঁজিয়া ফিরি জনতায়
মানুষ কই?'

প্রত্যেক বাবা-মা চায়, তাদের সন্তান মানুষের মতো মানুষ হোক। টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, ধর্ষক, অ্যাসিড নিক্ষেপকারী হোক—এটা কেউই চায় না। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু সন্তানকে গড়ে তোলার জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অমনোযোগী ও অলস। আমরা গরু, হাঁস-মুরগির বাচ্চা, মাছের পোনা ইত্যাদি পালন শিখি, কিন্তু সন্তান লালন-পালন শিখি না, এমনকী এ ব্যাপারে জানার ও সচেতন হওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করি না। তাই আদর্শ সন্তানও তৈরি হয় না।

উত্তম সন্তান লাভের জন্য পিতা-মাতার কিছু দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে, যেগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য। এগুলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হকও বলা যেতে পারে। স্মার্ট প্যারেন্টিং এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জন্মের পর থেকে সন্তানের অগ্রগতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তার শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহযোগিতা করা হয়। স্মার্ট প্যারেন্টিং পলিসিতে সন্তানের প্রতি নিয়মকানুন থাকলেও তাতে বাড়াবাড়ি নেই, স্বাধীনতা থাকলেও তা লাগামছাড়া নয়। সেখানে রয়েছে নৈতিকতার শিক্ষা এবং মানুষ হয়ে গড়ে উঠার দীক্ষা।

লুকমান হাকিম তাঁর সন্তানের প্রতি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ্য করার মাধ্যমে কুরআন মা-বাবাদের গাইডলাইন দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিজের কর্মের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন—কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করতে হয় এবং কীভাবে শিশুদের সঙ্গে আচার-আচরণ করতে হয়।

সন্তান প্রতিপালনে ইসলামি দিকনির্দেশনা

ভালো মায়ের ব্যবস্থা করুন

ভালো সন্তান লাভের প্রথম পদ্ধতি হলো ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা। বিয়ে করার সময় অবশ্যই মাথায় রাখবেন—যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছেন, তিনি হবেন আপনার সন্তানের মা। কারণ, একজন মা একই সঙ্গে প্রোডাকশন হাউজ এবং ট্রেনিং সেন্টার। মা যদি ভালো হয়, তাহলে সন্তানরাও ভালো হয়।

প্রবাদ আছে—

'বাপ ভালো তো বেটা ভালো, মা ভালো তো ঝি;
গাই ভালো তো বাছুর ভালো, দুধ ভালো তো ঘি।'

প্রতিটি মায়ের গর্ভ একেকটা খনি। এটা সাধারণ কোনো খনি নয়; তেলের খনি, গ্যাসের খনি, স্বর্ণের খনি, পেট্রোলিয়ামের খনির চেয়েও দামি খনি। কারণ, এই গর্ভগুলোই ধারণ করেছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সব ওলিদের, আল্লাহর নবিদের এবং সকল মহামানবদের। আবার এই নারীদের গর্ভেই বেড়ে উঠেছে পৃথিবীর তাবৎ সব জালিম, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, ধর্ষক, সন্ত্রাসী। এই পার্থক্যের কারণ কী? কারণ হলো—গর্ভধারিণীর ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণগত পার্থক্য।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তখন মায়ের হরমোন সন্তানের শরীরেও প্রবাহিত হয়। আমরা জানি, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ ও অনুভূতির জন্য শরীরে পৃথক পৃথক হরমোন প্রবাহিত হয়। হাসলে এক ধরনের হরমোন প্রবাহিত হয়, কাঁদলে আরেক ধরনের। একইভাবে ভালো চিন্তা করলে এক ধরনের, কূটনামি করলে আরেক ধরনের হরমোন প্রবাহিত হয়। মা যখন ভালো চিন্তা করেন, তখন তার শরীরে যে হরমোন প্রবাহিত হয়, তা সন্তানের শরীরেও প্রবেশ করে। ফলে সন্তান মায়ের উদরে থেকেই ভালো চিন্তা করতে শেখে। আবার মা যখন কূটনামি করেন, কারও গিবত করেন, মনে হিংসা লালন করেন, তখন সেই হরমোন সন্তানের শরীরেও প্রবাহিত হয়। ফলে সন্তান দুনিয়ায় আসার আগেই এসব বাজে গুণ শিখে যায়। এগুলো নিয়েই সে পৃথিবীতে আগমন করে। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় মায়েদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, কার্যক্রম—সবকিছুই তার গর্ভে থাকা সন্তানের ব্রেইনে সঞ্চারিত হয়।

গর্ভে আসার চার মাসের মধ্যেই সন্তানের মাঝে শোনার অনুভূতি জাগ্রত হয়। ফলে সে গর্ভে থেকেই শুনতে পায়। মা যা বলে, যা শোনে—সবই সে জঠর থেকে কান পেতে শোনে। মা যদি এই সময়টা কুরআন তিলাওয়াত করে বা শোনে, ভালো নসিহত শোনে, ভালো বই পড়ে, তাহলে সন্তানও মায়ের রেহেম থেকে এসব শুনে প্রভাবিত হতে পারে। সুতরাং মা যদি ভালো কাজ করেন, ভালো কথা বলেন, তাহলে সন্তানও তা আস্তে আস্তে শিখে নেয় এবং সৎ গুণাবলির অধিকারী হয়।

অন্যদিকে মা যখন বাজে কথা বলে, বাজে কাজ করে, অশ্লীল কিছু শোনে বা বলে, তখন বাচ্চাও মায়ের উদর থেকে এসব বদগুণ শিখে ফেলে।

তাই মায়েদের হতে হবে খুবই সতর্ক। যে চরিত্রের বাচ্চাকে কল্পনা করেন, সেই চরিত্রে আগে নিজেকে সাজান। তাহলে সন্তান আপনা থেকেই অর্ধেক চরিত্রবান হয়ে যাবে।

যারা এখনও বিয়ে করেননি, তাদের মনে রাখতে হবে—আপনাদের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসবে আপনার স্ত্রীর মাধ্যমেই। সুতরাং যখন বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজবেন, তখন শুধু স্ত্রীই খুঁজবেন না; পাশাপাশি আপনার অনাগত প্রজন্মের মাকেও খুঁজুন। কারণ, সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা শিক্ষকের চেয়েও বেশি।

ভালো বাবা হোন

ভালো সন্তান পাওয়ান জন্য ভালো বাবা হওয়া আবশ্যক। নিজে ভালো না হয়ে ভালো সন্তান আশা করা বোকামি। বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো আগে পালন করতে হবে, নিজেকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, তারপর সন্তানের থেকে উত্তম আচরণ আশা করতে হবে। অনেক বাবা আছেন—যারা সারা জীবন নিজে অপরাধের সাগরে হাবুডুবু খায়, কিন্তু সন্তানকে নিষ্কলুষ হিসেবে দেখার প্রত্যাশা করেন। এটা ইনসাফের প্রত্যাশা হতে পারে না।

> একবার উমর ফারুক ﷺ-এর কাছে এক বাবা এসে বিচার দিলেন—'আমিরুল মুমিনিন! ছেলে তো আমার কথা শোনে না, বেয়াদবি করে।'
>
> উমর ﷺ সন্তানকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার বাবার সাথে বেয়াদবি করো?'
>
> ছেলে বলল—'হে আমিরুল মুমিনিন! সব দায়-দায়িত্ব কি শুধু আমাদেরই? বাবা-মা'র কোনো দায়িত্ব নেই?'
>
> উমর ﷺ বললেন—'অবশ্যই আছে। বাবার তিনটি দায়িত্ব—
>
> - সন্তানের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করবে।
> - সন্তানের ভালো নাম রাখবে।
> - সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেবে।'
>
> এবার ছেলে বলল—'আমার বাবা এই তিনটির একটিও করেননি। আমার বাবা বিয়ে করেছেন এক নিগ্রো নারীকে; যিনি এক অগ্নি উপাসকের দাস ছিলেন।

তিনি আমার নাম রেখেছেন খুনফাসা (خُنْفَسَاءُ অর্থ–গোবরে পোকা। অন্য বর্ণনায়–চামচিকা)। আর কুরআনের একটি অক্ষরও তিনি আমাকে শেখাননি।'

উমর ﵁ এবার সেই বাবাকে বললেন–'সন্তানের প্রতি তুমি নিজের দায়িত্ব পালন করোনি, আর এসেছ তার বিরুদ্ধে বিচার দিতে!' (আবুল লাইস সমরখন্দি রচিত *তানবিহুল গাফিলিন*)

প্রতিটি শিশু বাবাকে হিরো মনে করে। বিশ্বাস করে–বাবা যা করে, তা-ই সঠিক। এজন্য তারা বাবাকে অন্ধ অনুকরণ করে। আপনি যদি মানুষের সাহায্য করেন, সময়মতো নামাজ পড়েন, মিথ্যা থেকে দূরে থাকেন, ভালো কাজে অনড় থাকেন, তাহলে বাচ্চাও আপনাকে দেখে শিখবে। আর আপনি যদি সিগারেট খান, অশ্লীল সিনেমা-গান দেখেন, মানুষকে গালি দেন, মোবাইলে মিথ্যা বলেন, ক্ষমতার অবৈধ ব্যবহার করেন, তাহলে বাচ্চাও আপনাকে দেখে এসব শিখবে।

কোন পরিস্থিতিতে আমরা কী করি, বাচ্চারা তা খুব মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করে। আপনার ড্রাইভার এক ঘণ্টা দেরি করে এলে আপনি যখন তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, তখন আপনার সন্তান এই খারাপ আচরণ শিখে নেয়। পরবর্তী জীবনে সে ঠিক এই আচরণই করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। কাজের বুয়া তরকারিতে একটু বেশি ঝাল দিলে আপনি যখন তার গোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল দেন, কাজের মেয়েটা একটা প্লেট ভেঙে ফেললে যখন তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন, বাসায় বসে ফোনে যখন বলেন–আপনি বাসায় নেই, তখন এগুলো আপনার কোমলমতি সন্তানের মন-মগজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা এগুলো দেখে প্রভাবিত হয়। সন্তান আপনাকে যেমন দেখে, তেমনই শেখে। তাই ভালো সন্তান পাওয়ার জন্য আগে ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করুন।

নেককার সন্তানের জন্য দুআ করুন

নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে উত্তম সন্তানের জন্য দুআও করতে হবে। আপনি চাইলেই ভালো সন্তান পাবেন না, যদি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেন। চক্ষু শীতলকারী সন্তান পেতে অবিরত দুআ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই দুআ আমাদের শিখিয়েছেন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔

'হে আমাদের রব! আমাদের এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা চক্ষু শীতলকারী হবে। আর আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।' (সূরা ফুরকান : ৭৪)

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন

ছেলে হোক মেয়ে হোক, প্রতিটি সন্তানই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। এই উপহার পাওয়ার পর পিতা-মাতার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। অনেকেই ছেলেসন্তান পছন্দ করে, কিন্তু মেয়েসন্তান করে না। ছেলে হলে মহাখুশি; পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাওয়ায়। কিন্তু মেয়ে হলে অখুশি, বেজার। খবরদার! এমনটা করবেন না। ছেলে হবে না মেয়ে হবে—তা আপনার হাতেও নেই, আপনার স্ত্রীর হাতেও নেই; এটা কেবলই আল্লাহর হাতে। এজন্য ছেলেমেয়ে যা হোক না কেন, মনে করতে হবে—এতেই আপনার জন্য কল্যাণ রয়েছে। তাই সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔

'(আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং সবকিছু করতে সক্ষম।' (সূরা শুরা : ৪৯-৫০)

যাদের ছেলে সন্তান আছে কিন্তু মেয়ে নেই, তারা মেয়ে সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারেন। আবার যাদের মেয়ে সন্তান আছে কিন্তু ছেলে নেই, তারা ছেলে সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারেন—এতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আল্লাহর দানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা যাবে না। ছেলে হোক মেয়ে হোক, আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

সন্তানের কানে আজান দিন

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক—সন্তান জন্মের পর তার কানে আজান দিন। জীবনযাত্রার শুরুতেই তার কানে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা শুনিয়ে দিন। কোনো বাচ্চা যখন সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শয়তান এসে বাচ্চাকে গুঁতো দেয়। আমরা যখন আজান দিই, তখন শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তানের কাজই হলো বনি আদমকে কুমন্ত্রণা দেওয়া। তাই নবজাতক সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শয়তান তার মিশন শুরু করে। শয়তান শয়তানের কাজ করুক। আমরা আমাদের কাজ করতে ভুলব না। সন্তান জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার কর্ণকুহরে মহান রব ও তাঁর প্রিয় হাবিবের নাম পৌঁছে দেবো। তাওহিদ ও রিসালাতের বাণী শুনেই সে এ ধরার বুকে নব জীবনের যাত্রা শুরু করবে।

> 'ফাতিমা ﵂-এর প্রথম সন্তান হাসান ﵁ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিশ্বনবি ﷺ নিজে গিয়ে কানের কাছে আজান দিয়েছিলেন।'
> (জামে আত-তিরমিজি : ১৫১৪)

আজান দেওয়ার জন্য মসজিদের ইমাম সাহেবের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। আজান তো আমরা সবাই পারি। সন্তান কোলে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন, এরপর তার ডান কানে আজান দিন। বাবা যদি উপস্থিত না থাকে। তাহলে যারা পাশে থাকবেন, তারাই আজান দেবেন। দাদা থাকলে নাতির কানে আজান দেবেন, চাচা থাকলে ভাতিজার কানে আজান দেবেন। আজানের জন্য কারও অপেক্ষা করার দরকার নেই।

তাহনিক করুন

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে দেবেন। খেজুর না পাওয়া গেলে মধু লাগিয়ে দেবেন। তবে খেজুর দিয়ে করাই উত্তম। খেজুরের মিষ্টতা নবজাতকের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তাহনিক হচ্ছে, খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখে আলতো করে ঘষে দেওয়া। আধুনিক মেডিকেল সাইন্সও এটাকে স্বাস্থ্যসম্মত বলেছে। 'হাইয়াতুল ইজাজিল ইলমি'-এর সদস্য ড. মুহাম্মাদ আলি আল-বার নিশ্চিত করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান নবজাতকের শরীর ও তার বেড়ে উঠার ওপর তাহনিকের উপকারিতা প্রমাণ করেছে। তাহনিকের কারণে নবজাতকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Natural immunity) তৈরি হয় এবং রক্ত সঞ্চালন (Blood circulation) সচল হয়।

আল্লাহর হাবিব ﷺ-এর কাছে কোনো বাচ্চা নিয়ে আসা হলে তিনি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে লাগিয়ে দিতেন। (সহিহ মুসলিম : ২১৪৭)

আয়িশা ﷺ-এর বড়ো বোন আসমা ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন তাঁর সন্তান জন্ম হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর। সন্তানকে নবিজির কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তাঁর মুখে থুথু দিলেন। আসমা ﷺ খুব গর্ব করে বলতেন—'আমার আবদুল্লাহর পেটে সর্বপ্রথম যে বস্তুটি গিয়েছিল, সেটা হলো নবিজির থুথু।' (সহিহ বুখারি : ৩৯০৯)

আকিকা দেওয়া

বাচ্চার বয়স সাত দিন হলে আকিকা করুন। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'প্রত্যেক সন্তান নিজের আকিকার সাথে আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে জবেহ দাও।' (সুনানে আন-নাসায়ি : ৪২২০)

অনেকেই আকিকা সপ্তম দিনে না দিয়ে কুরবানির জন্য রেখে দেন। ফিকহি মাসয়ালায় এটা জায়েজ আছে। তবে উত্তম হলো সপ্তম দিন সম্পন্ন করা। নবিজি হাসান ও হুসাইন ﷺ-এর আকিকা সপ্তম দিনে সম্পন্ন করেছিলেন এবং প্রত্যেকের জন্য দুটি করে ছাগল জবাই দিয়েছিলেন।
(সুনানে আন-নাসায়ি : ৪২১৯, হাকিম : ৪/২৬৪)

'ছেলে হলে দুটো ছাগল জবাই করবেন, মেয়ে হলে একটি ছাগল।'
(সুনানে আন-নাসায়ি : ৪২১২)

সুন্দর নাম রাখুন

আকিকার দিনে সন্তানের সুন্দর অর্থপূর্ণ একটি নাম রাখুন। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'সপ্তম দিনে আকিকা করতে হবে এবং নাম রাখতে হবে।'
> (সুনানে আন-নাসায়ি : ৪২২০)

নাম ব্যক্তির বাহ্যিক পরিচয় বহন করে। নাম দিয়েই মানুষ কাউকে প্রাথমিকভাবে বিচার করে। এই নাম যদি হয় সুন্দর ও অর্থপূর্ণ, তাহলে তা ব্যক্তির মান-শান-ইমেজ বাড়িয়ে দেয়। আর যদি নাম হয় বিদঘুটে অর্থের, তাহলে শুরুতেই সে অপমানকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। দুনিয়ার নাম ধরেই কিয়ামতের মাঠে মানুষকে ডাকা হবে। তাই নাম অর্থহীন ও হাস্যকর হলে হাশরের মাঠেও ফেরেশতা এবং কোটি কোটি মানুষের সামনে চরম বেইজ্জতির মধ্যে পড়তে হবে।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা সুন্দর নামকরণ করবে।'
> (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৪৮)

ছেলে বাচ্চাদের নাম রাখার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা উচিত আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান রাখা। কারণ, এই দুটি নাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নবিজি বলেন—

> 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৮৩৩)

এগুলো রাখা না হলে নবি-রাসূলদের সাথে অথবা সাহাবিদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা উচিত। যেমন : ইবরাহিম, ইউসুফ, ইসমাইল, জাকারিয়া, শুয়াইব, মুহাম্মাদ এবং আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, হামজা, খাব্বাব, খুবাইব, জায়েদ ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও যেকোনো ভালো অর্থপূর্ণ নাম রাখা যেতে পারে। মেয়ে বাচ্চাদের নাম রাখার ক্ষেত্রে ফাতিমা, মারইয়াম, খাদিজা, আয়িশা, হাফসা—প্রমুখ মহীয়সী নারীদের নামের পাশাপাশি যেকোনো ভালো অর্থপূর্ণ নাম পছন্দ করা যেতে পারে। কারণ, প্রতিটি নামেরই একটি প্রভাব আছে। ব্যক্তির নাম তার স্বভাব ও চরিত্রের ওপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নাম শুধু পরিচয়েরই বাহন নয়; বরং ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও রুচি-অভিরুচিরও আয়নাস্বরূপ। নাম যদি রাখা হয় সল্টু কিংবা বল্টু, তাহলে তার প্রভাব সল্টু-বল্টুর মতোই হবে। আর নাম যদি রাখে খালিদ, তাহলে তার প্রভাব খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর মতোই হবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার!

সন্তানের নাম কেবল আরবিতে রাখলেই যে সেটা ইসলামিক হয়ে যায়—এমনটা নয়। কুরআনের শব্দ হলেই নামটি ইসলামি হবে, তা-ও নয়। কারণ, কুরআনে অনেক কাফিরের নামও আছে। তাই নাম ইসলামিক হলো কি না, সেটা বুঝতে মৌলিকভাবে দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। এক. শিরকি অর্থ না থাকা, দুই. খারাপ অর্থবোধক না হওয়া। এ দুটি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে যেকোনো ভালো নাম—সেটা যে ভাষারই হোক না কেন, তাতে সমস্যা নেই। তবে ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে শিশুর নাম নির্বাচন করার ব্যাপারেই আমরা সব সময় অভিভাবকদের উৎসাহিত করে থাকি। সুন্দর নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোনো ভালো আলিমের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

চুল মুণ্ডন

সপ্তম দিনে বাচ্চার চুল কেটে দেবেন (সুনানে আন-নাসায়ি : ৪২২০)। তবে ডাক্তাররা স্পেশাল কোনো কারণে যদি হালাক তথা চুল কাটতে নিষেধ করেন, তখন ছেঁটে (Trimming) দেবেন। চুল মুণ্ডনের পর সেগুলো ওজন করে সমপরিমাণ রুপা দান করবেন।

ফাতিমা ﵂-এর ছেলে হাসান ﵁-এর জন্মের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কন্যাকে চুলের সমপরিমাণ রুপা দান করতে বলেন। (জামে আত-তিরমিজি : ১৫১৯)

দুই বছর মাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে

ভূমিষ্ঠের পর থেকে দুই বছর পর্যন্ত সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়ের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানে অনেক মা এই দায়িত্বের কথা ভুলে যান। তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে এই দায়িত্বকে পাশ কাটাতে চান। তারা চায় ডানো, সেরেলাক্স, নিডো ইত্যাদি খাওয়ানোর মাধ্যমে নিজেদের সৌন্দর্য ধরে রাখতে। এটা খুবই গর্হিত কাজ। আল্লাহ সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য মায়ের বুকের দুধের মধ্যে রেখেছেন, এটা শিশুর সমস্ত রোগের জন্য ভ্যাকসিনস্বরূপ। মা যদি এই খাদ্যভান্ডারের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এর চেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ আর হতে পারে না। আল্লাহ সন্তানকে মায়ের আনুগত্য করতে বলেছেন এই দুধের দোহাই দিয়েই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাঁকে গর্ভে ধারণ করে। দুই বছর পর্যন্ত তাকে দুধ পান করায়। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো। আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।' (সূরা লুকমান : ১৪)

> 'যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়, সেক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দুই বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে।' (সূরা বাকারা : ২৩৩)

তাই বিশেষ কোনো রোগ বা অসুবিধা না থাকলে মায়ের কর্তব্য হলো, সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানো। মায়ের দুধে অ্যান্টিবডি থাকে। এতে সন্তানের ব্রেইন ভালো থাকবে, সে শক্তিশালী হবে; তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, মুজাহিদ হয়ে দেশ, জাতি ও উম্মাহর জন্য কাজ করতে পারবে।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৬৮)

যে মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়, তাদের সঙ্গে সন্তানদের এক বিশেষ আত্মার বন্ধন তৈরি হয়। মায়েদেরও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এটা মায়েদের জরায়ু ও স্তন ক্যানসার রোধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে—যে সকল মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করান, তাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম থাকে। স্তন পান করানো মা ও শিশু উভয়ের জন্যই শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বেশ উপকারী। তাই কোনো রকম চিকিৎসাগত কারণ ছাড়া কোনো মা যেন সন্তানকে আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না করে।

সুন্নাতে খতনা

একটু বড়ো হলে ছেলেসন্তানকে সুন্নাতে খতনা করাতে হবে। এটা নবিদের সুন্নাহ। প্রত্যেক নবি খতনা করেছেন। ইবরাহিম ﷺ সুন্নাতে খতনা করেছেন আশি বছর বয়সে (সহিহ বুখারি : ৩৩৫৬)। আর এটা করা মানুষের জন্মগত স্বভাব বা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বনবি ﷺ বলেন, এ রকম ফিতরাত আছে পাঁচটি—

- খতনা করা
- নাভির নিচে ক্ষুর ব্যবহার করা
- বগলের পশম উপড়ে ফেলা
- নখ কাটা
- গোঁফ ছোটো করা। (সহিহ বুখারি : ৫৮৮৯)

ছেলের বয়স দশ-বারো বছর হওয়ার আগেই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদারদের মাধ্যমে তার খতনা করে দিন। খতনা করালে শিশুদের মূত্রপথের সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়। সুন্নাতে খতনার সুফল নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ সিডনির মেডিকেল সাইন্সের অধ্যাপক ড. ব্রায়ান মরিস চমৎকার একটি গবেষণা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, যেসব ছেলেদের খতনা (সারকামসিশন) করা হয়নি, তাদের কিডনি, মূত্রথলি ও মূত্রনালির ইনফেকশন অপেক্ষাকৃত চার থেকে দশগুণ বেশি হয়। তিনি মনে করেন, খতনার (সারকামসিশনের) মাধ্যমে অন্তত এক-চতুর্থাংশ মূত্রনালির ইনফেকশন হ্রাস করা যায়।

ইসলামি সংস্কৃতি শেখানো

বাচ্চাদের ছোটোকাল কাদামাটির মতো। কাদামাটিকে যেমন ইচ্ছেমতো ডিজাইন করা যায়, তেমনি ছোটো বাচ্চাদের আচরণও ইচ্ছামতো গঠন করা সম্ভব। এই বয়সে যদি তাদের সুন্দর আচরণ শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহলে পরিণত বয়সে আর সম্ভব হয় না। তাই শিশু বয়সেই ইসলামি তারবিয়া তথা ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সত্য কথা, আমানতদারিতা, মুরব্বিদের সম্মান, লজ্জাশীলতা, আল্লাহর ভয়, পরকালের জবাবদিহিতা, চুরি, অন্যের হক, পরনিন্দা, হিংসা, অহংকার, সততা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একটা স্বচ্ছ ধারণা তাদের কোমল হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। ওরা না বুঝে কোনো ভুল করে ফেললে যথাসময়ে ভুলগুলো আন্তরিকভাবে শুধরে দিতে হবে। এই সময়ে ছেলেমেয়েকে শেখাতে হবে—কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম; কোনটা উচিত, কোনটি অনুচিত; কীসে তার কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ; কোন পথে তার মুক্তি আর কোন পথে ধ্বংস। এই সময়টাতে ওদের ব্রেইনে একবার যা ইন্সটল করে দেওয়া হবে, সেটা সহজে আর ডিলেট হবে না।

ছোটো বাচ্চারা অনেক কিছুই বোঝে না। তারা খেলাচ্ছলে আরেকজনের গাছ থেকে ফল পেড়ে আনে। কোথাও পছন্দের কিছু দেখলে ব্যাগে করে নিয়ে আসে। কারণ, তারা তো বোঝে না; তারা মনে করে—'সবই আমার'। এই ক্ষেত্রে বাচ্চাকে কাছে ডেকে আদর করে শেখাবেন—'আব্বু/আম্মু! তুমি যে কাজটা করেছ, সেটা খুবই পচা কাজ। ভালো ছেলেরা কখনোই এসব করে না। আর তুমি তো অনেক ভালো।' এভাবে তাকে আদর দিয়ে উত্তম উপায়ে শেখাতে হবে।

খাওয়ার সময় কীভাবে খেতে হয়, তাকে শেখাবেন। উমর ইবনে আবু সালামা নামের এক বালক সাহাবি রাসূল ﷺ-এর কোলে বসে ছিলেন। যখন খাবার পরিবেশন করা হলো, তখন খাবার প্লেটে তাঁর হাত ছোটাছুটি করতে লাগল। অর্থাৎ এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু—এভাবে খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদর করে শিখিয়ে দিলেন—

> 'হে বৎস্য! "বিসমিল্লাহ" বলে ডান হাতে খাও এবং (প্লেটে) তোমার কোলের দিক থেকে খাও।'

রাসূল ﷺ-এর এই কথাটি তিনি আজীবন মেনে চলেছিলেন। তিনি বলেন—

'এরপর থেকে আমি সব সময় এই নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।'
(সহিহ বুখারি : ৫৩৭৬)

বাচ্চারা সাধারণত উলটোটা করতে পছন্দ করে। খেয়াল করলে দেখবেন, অনেক বাচ্চা ডান পায়ের জুতো বাম পায়ে পরে আর বাম পায়েরটা ডান পায়ে। ওদের ধরে ধরে শিখিয়ে দিতে হয়। এই সময়ে না শেখালে সব সময় উলটোটাই করে যাবে। আজীবন উলটো পথেই হাঁটবে। শিশুকাল থেকেই আল্লাহর ভয় বাচ্চার হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাচ্চাকে বোঝাতে হবে—কেউ যেটা দেখে না, সেটা আল্লাহ দেখেন; কেউ যেটা শোনে না, সেটা আল্লাহ শোনেন। এসব কথা যদি বাচ্চাকে বোঝাতে পারেন, তাহলে এই ছেলে কখনো অন্ধকার পথে পা বাড়াবে না। জীবনে দুর্নীতিবাজ হবে না। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করবে না। জীবনে এই ছেলে কখনো ইভটিজিং করবে না, কোনো মেয়ের মুখে অ্যাসিড ছুড়বে না, ধর্ষণ করবে না।

তাই তাদের হৃদয়ে শক্ত করে মহান আল্লাহ তায়ালার ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। তরুণ গীতিকার বিলাল হুসাইন নুরী চমৎকার করে লিখেছেন—

'যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়
তারা কভু পথ ভলে যায় না।
আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায়
কারো কাছে কোনো কিছু চায় না।'

বাচ্চাকে ভালোমতো হালাল-হারাম শেখাতে হবে। একবার ইমাম হাসান ﷺ সাদাকার খেজুরের স্তূপ থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবিজি এটা দেখে বললেন—

'থু মারো, থু মারো। তুমি কি জানো না, আমরা সাদাকা খাই না?'
(সহিহ বুখারি : ৩০৭২)

বিশ্বনবি ﷺ প্রিয় নাতিকে একটি খেজুর গলা দিয়ে নামাতে দেয়নি। কারণ, ওই খেজুরটা তাঁর জন্য 'হালাল' ছিল না। এভাবে আমরা বাচ্চাদের ছোটোবেলা থেকেই হালাল-হারাম শেখাতে পারি—যা তাদের আজীবনের জন্য পাথেয় হবে।

জবাবদিহিতা শেখান

বাচ্চাদের জবাবদিহিতার ভয় শেখাবেন—'যা-ই করো না কেন, কিয়ামতে কিন্তু এর হিসাব তোমাকে দিতেই হবে।' যে নবির সুপারিশে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব, সে নবি নিজের মেয়েকে বলছেন—

> 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, কিন্তু আল্লাহর নিকট আমি তোমার কোনোই উপকারে আসব না।' (সহিহ বুখারি : ৪৭৭১)

যে নবি সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যে নবিকে আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতের সুযোগ দেবেন, সে-ই নবি তাঁর মেয়েকে জবাবদিহিতা শেখাচ্ছেন—'নিজের আমল দিয়ে, নিজের কাজ দিয়ে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হও।' তাহলে আমাদের কী ধরনের জবাবদিহিতা শেখানো উচিত?

নিজেকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করুন

আমরা অনেকেই নিজে ভালো না হয়ে আশা করি, আমার সন্তানটি ভালো হবে—এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি সারাদিন সিগারেট টানেন আর ছেলেকে শেখাচ্ছেন—ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর! কোনো কাজ হবে না। আপনি মা, আপনি সারাদিন ভারতীয় সিরিয়াল নিয়ে পড়ে থাকবেন আর চাইবেন, আপনার মেয়ে নামাজি হোক, হিজাব পড়ুক—এটা সম্ভব না।

আদর্শ ছেলেমেয়ে পেতে হলে আদর্শ বাবা-মা হতে হবে। কারণ, ছেলেমেয়েরা উপদেশ শুনতে চায় না; তারা চায় ফলো করতে। বাচ্চারা দেখে দেখে শেখে। আপনি যখন নামাজ পড়বেন, দেখবেন—আপনার বাচ্চাটিও এসে নামাজে দাঁড়াচ্ছে। আপনার মতো করে নামাজ পড়ার চেষ্টা করছে বা অঙ্গভঙ্গি করছে। কারণ, একটি ছোট্ট ছেলের চোখে জীবনের প্রথম নায়ক তার বাবা। একটি ছোট্ট মেয়ের চোখে জীবনের প্রথম নায়িকা তার মা। তারা তাদের বাবা-মাকেই অনুসরণ করে। একজন পুলিশের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন—'বাবা, বড়ো হয়ে তুমি কি হতে চাও?' দেখবেন, সে বলবে—'আমি পুলিশ হতে চাই।' ইমাম সাহেবের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে দেখবেন, উত্তরে বলবে—'আমি ইমাম হতে চাই।'

একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল—'বাচ্চাদের কীভাবে স্মার্টফোনের আসক্তি থেকে বিরত রাখা যায়?' আমি এক বাক্যে উত্তর দিয়েছিলাম—'মা-বাবা যদি অতিমাত্রায় স্মার্টফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে, তবেই এটা সম্ভব।'

বাচ্চারা দেখে বাবা ঘরে এলেই ফেসবুকিং করে, মা ইউটিউবে কী যেন দেখে, সবাই মাথা নিচু করে কী যেন করে। এসব দেখে তাদেরও মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, সুযোগ পেলে এভাবে মোবাইল টিপবে। সে যদি দেখত বাবা একটি বই নিয়ে পড়ছেন, মা একটি বই নিয়ে পড়ছেন, তাহলে সে-ও একটি বই নিয়ে পাতা উলটাত।

সন্তানদের সাথে সময় কাটান

ছেলেমেয়েদের পেছনে টাকা ব্যয় করার চেয়ে তাদের সাথে সময় কাটানো বেশি জরুরি (Spending time with children is more important than spending money for them)। অনেক পরিবার এতটাই ব্যস্ত যে, বাবাও চাকরি করে, মা-ও চাকরি করে। সন্তানকে ঘুমিয়ে রেখে কাজে যায়, আবার বাসায় ফিরে দেখে তারা ঘুমোচ্ছে। সপ্তাহে শুধু ছুটির দিনটি ছাড়া সন্তান তার মা-বাবার সঙ্গই পায় না। একজন সন্তানের জন্য এর চেয়ে বড়ো অপ্রাপ্তি আর কিছুই হতে পারে না।

অনেক চাকরিজীবী মা-বাবা কাজের মেয়ের কাছে সন্তানকে রেখে যান। সে সারাদিন কাজের মেয়েটির সাথেই থাকে। কাজের মেয়েই তাকে দেখভাল করে, গোসল করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। ফলে সন্তান মায়ের চেয়ে কাজের মেয়েকেই বেশি আপন মনে করে। সে কাজের মেয়ের আচরণ নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকে। কারণ, ছোটোরা যার কাছ থেকে যা দেখে, সেটাই সে আত্মস্থ করে ফেলে। তাই ছেলেমেয়েকে যার তত্ত্বাবধানে বড়ো করবেন, সে তার আচরণ ও চিন্তা নিয়েই বড়ো হবে।

বাচ্চাকে যদি সময়ই না দেন, তাহলে আপনার প্রতি বাচ্চার দরদ জন্মাবে কীভাবে? বড়ো হয়ে তারা তো বুঝতেই পারবে না—মা-বাবা থাকলে কী, আর না থাকলেই কী! তাদের কাছে দুটোই সমান। কারণ, তারা কখানোই গভীরভাবে বাবা-মায়ের সংস্পর্শ পায়নি। ছেলেমেয়েদের সময় দিন, তাদের সাথে কথা বলুন, গল্প শোনান। প্রয়োজনে খেলুন। এতে আপনার সাথে তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে, গাঢ় হবে, স্মৃতির তালিকা লম্বা হবে। বাচ্চাকে কোলে নিন, আদর করুন, ভালোবাসুন, চুমু দিন।

হাসান ﷺ ছিলেন নবিজির আদরের নাতি। একদিন সবার সামনে নবিজি হাসান ﷺ-কে চুমু দিলেন। আরবে এটা ছিল খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। তারা মনে করত—পুরুষদের কাজ যুদ্ধ করা, বাণিজ্য করা, রুক্ষ মেজাজের হওয়া।

বাচ্চাদের চুমু দেওয়া, আদর করার মতো খুচরা কাজ তাদের সাজে না। আর স্বয়ং নবিজি কিনা বাচ্চাকে চুমু দিচ্ছেন? তা-ও আবার সবার সামনে!

আকরা ইবনে হারিস ﷺ নামের এক সাহাবি দৃশ্যটি দেখে দারুণ বিস্মিত হলেন। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। বাচ্চাকে চুমু দেওয়া যেন তাঁর কাছে দুর্বলতা বলে মনে হলো। তিনি বললেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারও তো দশটা ছেলে আছে। কই, আমি তো কোনোদিন কাউকে চুমু দিইনি!'

তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ-

'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।' (সহিহ বুখারি : ৫৯৯৭)

অর্থাৎ তুমি তোমার সন্তানকে চুমু দাও না, আদর-সোহাগ করো না, তাহলে তুমি কীভাবে আশা করো—বুড়ো হলে তোমার সেই সন্তান তোমাকে আদর করবে? সন্তানকে তুমি দয়া দেখাও না, সেই সন্তান কীভাবে মানুষজনের সাথে দয়া দেখাবে, মানুষজনকে ভালোবাসবে? এমনটা আশা করা অযৌক্তিক। যে অন্যের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না। তাই সন্তানকে আদর করুন। তাদের সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটান। তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। নিজের বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করে হলেও বাচ্চাদের সময় দেওয়া উচিত, তাদের আদর করা উচিত।

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ তাঁর ছোটো ছোটো চাচাতো ভাইদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করাতেন। বলতেন—"দেখি তো, কে দৌড়ে এসে আমাকে আগে ধরতে পারে!" এ কথা শোনা মাত্র সবাই দৌড়ে এসে রাসূল ﷺ-এর কোলে ও বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তখন তিনি সবাইকে জড়িয়ে ধরতেন, আদর করতেন এবং চুমু দিতেন।' (মুসনাদ আহমাদ : ১৭৩৯)

রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন ﷺ-এর সাথেও খেলাধুলা করতেন। তাঁরা দুজন মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ-এর কাঁধে চড়ত। এমনকী মাঝে মাঝে সালাত অবস্থায়ও তাঁরা দুজন নানাভাইয়ের কাঁধে চড়ে বসত। সুবহানাল্লাহ! (সুনানে নাসায়ি : ১০৯৪)

মা-বাবা ও সন্তানদের মাঝে দূরত্ব থাকা উচিত নয়। সন্তানের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। বেশি বেশি তাদের কাজকে অ্যাপ্রিশিয়েট করুন। উৎসাহ দিন এবং সাহস জোগান। যেকোনো বিষয়ে তারা যেন সবার আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ (Comfort Feel) করে। তাদের এই বলে আশ্বস্ত করুন—'আমরা তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। যেকোনো সমস্যায় আগে আমাদের মাঝে শেয়ার করো। এতে কখনো তোমাদের ক্ষতি হবে না।'

বাচ্চাদের মতামতকে গুরুত্ব দিন

আমরা অনেকেই বাচ্চার অভিমতকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখি। মনে করি, তার কথা আবার শোনার কী আছে? এমনটা করা উচিত না। কারণ, এতে সন্তান নিজেকে খুবই অচ্ছুত ভাবে। মনে করে, তার কোনো দাম নেই। আত্মসম্মানহীন অনুভূতি নিয়ে সে বড়ো হয়। ফলে তার চিন্তার রাজ্য প্রসারিত হতে পারে না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে পারে না। অন্যদিকে তার কথা শুনলে, মতামত পেশের সুযোগ দিলে, তারা নিজেদেরকে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে বিবেচনা করে। তারা নতুন নতুন চিন্তা করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। এতে তাদের চিন্তার রাজ্য প্রসারিত হয়, তারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়; সর্বোপরি একজন চিন্তাশীল, সৃজনশীল ও মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তাই পারিবারিক বৈঠকগুলোতে তাদেরও রাখুন। তাদের মতামত নিন। কখনো কখনো বাচ্চাদের মাথা থেকেও অনেক আইডিয়া চলে আসে।

বাচ্চারা কী বলতে চায়, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অনেকেই আছেন—বাচ্চা ডাকছে—'আব্বু...আব্বু' আর তিনি মোবাইলের স্ক্রিনে ব্যস্ত। অথচ তার উচিত ছিল বাচ্চা কী বলতে চায়, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া। বাচ্চা ডাকলে তার দিকে ঘুরে বসুন। মুখোমুখি হয়ে শুনুন—সে কী বলতে চায়। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার থেকে মতামত চান; প্রয়োজনে গ্রহণ করবেন না, কিন্তু শুনতে তো দোষ নেই! আল্লাহর নবিরাও বাচ্চাদের সাথে পরামর্শ করতেন। সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম ﷺ স্বপ্নে দেখলেন, তিনি ইসমাইল ﷺ-কে জবাই করছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সন্তানকে বললেন—

> 'হে আমার প্রিয় ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে জবাই করছি। তোমার কী অভিমত?'

খেয়াল করে দেখুন, বাবা সন্তানের মতামত চাচ্ছেন। স্বপ্ন দেখার সাথে সাথেই গলায় ছুরি চালাননি। উত্তরে ইসমাইল ﷺ বলেন—

> 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' (সূরা আস-সাফফাত : ১০২)

একজন নবি হওয়া সত্ত্বেও ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করার আগে সন্তানের মতামত নিয়েছেন, সেখানে আমরা কেন সন্তানের মতামতকে খাটো চোখে দেখব?

বদদুআ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন

কখনো বাচ্চাদের বদদুআ দেবেন না। সন্তান যত দুষ্টু হোক, বদের হাড্ডি হোক, বদদুআ দেওয়া যাবে না। আমরা রাগের চোটে মারাত্মক এই ভুলটা করে বসি। মনে রাখতে হবে—বুলেট মিস হতে পারে, কিন্তু বাবা-মায়ের দুআ মিস হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—'তিন ব্যক্তির দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়।

- মজলুমের দুআ
- মুসাফিরের দুআ
- সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৬২)

বাবা-মায়ের রাগের মাথায় বলা কথাটাও আল্লাহ কবুল করে নিতে পারেন। এজন্য বিশ্বনবি ﷺ বাবা-মাকে সন্তানের জন্য বদদুআ করতে নিষেধ করেছেন। (সহিহ মুসলিম : ৩০১৪)

সন্তানের জন্য একটি ভালো দুআ ঠিক করে নেবেন। রাগ উঠলে ওই ভালো দুআটি বারবার করবেন। এত রাগও মিটল, সন্তানও বদদুআ থেকে বেঁচে গেল।

শাইখ আদিল আল কালবানি লন্ডনের এক কনফারেন্সে পবিত্র কাবা শরিফে ইমাম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর জীবনের একটি চমৎকার কাহিনি বর্ণনা করেন। কালো বর্ণের মানুষ শাইখ আদিল আল কালবানি পারস্য উপসাগরীয় এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। মসজিদুল হারামে নামাজের ইমামতি করা অসাধারণ সম্মানের, আর এই কাজ শুধু আরব ভূখণ্ডের আরবদের জন্যই নির্ধারিত। তিনি বলেন—'আমার মায়ের দুআ আমাকে কাবার ইমাম বানিয়েছে।'

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শাইখ কালবানি বলেন—

> 'ছোটোবেলায় আমি ছিলাম খুব দুষ্টু প্রকৃতির। দুষ্টুমি করে প্রায়শই মাকে রাগাতাম। কিন্তু আমার মা ছিলেন খুবই দ্বীনদার একজন মহিলা। তিনি জানতেন, আল্লাহর কাছে দুআর কী শক্তি। আন্তরিকভাবে করা দুআ কখনো বিফলে যায় না। তিনি দুআ করাটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। আমার ওপর মা যখনই রেগে যেতেন, তখনই বলতেন—"আল্লাহ যেন তোমাকে পথ দেখান এবং তোমাকে কাবার ইমাম বানান!" আল্লাহ আমার মায়ের দুআ কবুল করেছেন এবং আমি আজ কাবার ইমাম। (অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন) যখন আপনার সন্তান দুষ্টুমি করবে অথবা খারাপ আচরণ করবে, তখন তাকে গালমন্দ করবেন না। এতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। রাগান্বিত অবস্থায় আপনাদের ভাষা সংবরণ করুন। আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো দুআ করার অভ্যাস তৈরি করুন। এমনকী যখন আপনি অনেক রেগে যান, তখনও তার জন্য দুআ করুন।'

ইবাদত প্র্যাকটিস করান

সন্তানরা কিছুটা বুঝতে শেখার পর থেকেই সন্তানদের নামাজের শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাকে সাথে করে নামাজে নিয়ে যাওয়া উচিত। একটু বড়ো হওয়ার পার আস্তে আস্তে নামাজের নিয়মকানুন শেখানো, কুরআন শেখানো, দুআ, অজুর নিয়ম, গোসল, জরুরি মাসয়ালা-মাসায়েল ইত্যাদি শেখানো বাবা-মায়ের কর্তব্য। সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে নামাজের জন্য জোর দিন। দশ বছর হলে শাসন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাজের নির্দেশ দাও, দশ বছর হলে নামাজের জন্য প্রয়োজনে মৃদু প্রহার করো।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৫)

অনেকেই ছেলেমেয়েকে চার ওয়াক্ত নামাজ পড়ায়, কিন্তু ফজরের সময় ডাকে না। ভাবে—আদরের ছেলে আরেকটু ঘুমাক! আচ্ছা, আপনার ঘরে আগুন লাগলে তখনও কি বলবেন—'ছেলেটা আরেকটু ঘুমাক, আরামে ঘুমাচ্ছে?' নাকি তড়িঘড়ি করে ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন? এই দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য যদি ছেলেমেয়েকে ঘুম থেকে ডেকে উঠাতে পারেন, তাহলে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ফজরের ওয়াক্তে ডেকে উঠাতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন; আর পারতে আপনাকে হবেই।

রমজান মাসে বাচ্চাদের রোজা রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করুন। অনেক বাচ্চা রোজা রাখতে চায়, কিন্তু বাবা-মা রাখতে দেন না। এটা ঠিক না। একদিন, দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চা মারা যাবে না; বরং তাকে ট্রেনিং দিন, কষ্টকর ইবাদতগুলোতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলুন। তার স্পিরিটটাকে কাজে লাগান।

ডিসেম্বরে যখন স্কুল ছুটি দেবে, তখন ঘরের সবাইকে নিয়ে রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ুন। আপনি থাকবেন ইমাম, পেছনে আপনার ছেলে, তার পেছনে আপনার স্ত্রী ও মেয়ে। এভাবে পরিবারে জান্নাতি একটি আমেজ গড়ে তুলুন।

ছেলেমেয়েকে ভালো নামে ডাকুন

প্রত্যেক নবিই সন্তানদের সুন্দর নামে ডাকতেন। তাঁরা ডাকতেন 'ইয়া বুনাইয়্যা' বলে। এটার অর্থ হলো—'হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান!' ফাতিমা ﵂ যখন বিশ্বনবির ঘরে আসতেন, তখন নবিজি বলতে— 'আমার আদরের কন্যাকে মোবারকবাদ!' (সহিহ বুখারি : ৩৬২৩)

ফাতিমা ﵂-এর ছেলে হাসান ﵁-কে নবিজি খুঁজতেন এভাবে—'আমার পিচ্চি কলিজার টুকরোটা কোথায় রে...' (সহিহ মুসলিম : ২৪২১)

সুতরাং সন্তানদের আদর করে মিষ্টি নামে ডাকুন। বাচ্চাদের সুন্দর ও আদুরে নামে ডাকা রাসূলের সুন্নাহ।

বাচ্চাকে আগে সালাম দিন

ঘরে ঢুকেই সালাম দিন। স্ত্রী স্বামীকে সালাম দেবে, স্বামীও স্ত্রীকে সালাম দেবে। বাবা সন্তানকে সালাম দেবে, সন্তানও বাবাকে সালাম দেবে। ছোটোরা বড়োদের আর বড়োরা ছোটোদের। এভাবে ঘরে সালামের প্রতিযোগিতা শুরু করলে বাচ্চারা আপনাতেই সালাম প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। অনেকে অভিযোগ আর আক্ষেপের সুরে বলে থাকেন—'ঘরে শান্তি নেই।' খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের ঘরে সালামের প্রচলন নেই। সালাম শব্দের অর্থ শান্তি। তো শান্তির বাণী ঘরে না ঢোকালে শান্তি আসবে কী করে? আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের সালামের মাধ্যমে অভিবাদন করো। এ কল্যাণের দুআ আল্লাহর কাছ থেকে নির্ধারিত, বড়োই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন; আশা করা যায় তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।' (সূরা আন-নুর : ৬১)

বিশ্বনবি ﷺ-কে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন—'ইসলামে কোন কাজ উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন—'তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দেবে এবং যাকে চেনো আর যাকে চেনো না—সবাইকে সালাম দেবে।' (সহিহ বুখারি : ৬২৩৬)

সালামের মাধ্যমে বাচ্চারা শিষ্টাচারের প্রথম পর্বটা শিখে যায়। তারা মানুষের সাথে মিশতে শেখে এবং ভালো ছেলে বলে স্বীকৃতি পায়।

বাচ্চাদের উপহার দিন

ভালো কাজের জন্য বাচ্চাকে মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো উপহার দিন, এতে তারা উৎসাহী হবে। বাচ্চাকে বলুন—'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে তোমাকে এটা দেবো, রমজানে রোজা রাখলে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।'

বাচ্চাদের বড়ো বড়ো মসজিদে বেড়াতে নিয়ে যান। পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে মসজিদ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়—যে একটানা চল্লিশ দিন ফজরের নামাজ মসজিদে এসে পড়বে, তাকে একটি বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হবে। এতে করে বাচ্চারা নামাজের প্রতি আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের কয়েকটি মসজিদেও এমন চমৎকার উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। মসজিদে বাচ্চা গেলে কেউ রেগে যাবেন না। কারণ, মসজিদে বাচ্চারা যাওয়া অর্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নামাজি হওয়া। তুরস্কের মসজিদে লেখা থাকে—'তারাবিহর নামাজের সময় মসজিদের পেছন থেকে যদি বাচ্চাদের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা না যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে আশঙ্কায় থাকুন।'

যদি বাচ্চারা আওয়াজ করে, তাহলে বোঝা গেল—আপনাদের সন্তান-সন্ততি-নাতিরা মসজিদে এসেছে। আর যদি মসজিদে বাচ্চাদের কোনো আওয়াজ না থাকে বা তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া না যায়, তাহলে বোঝা যাবে—নতুন প্রজন্ম নামাজে গাফেল। ভবিষ্যতে তাদের টেনেও মসজিদে নিয়ে আসা যাবে না।

সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান

আপনার সন্তানকে স্কুলে অথবা মাদরাসায় পাঠান। অশিক্ষা, কুশিক্ষার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের যথাসম্ভব সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চাপ যেন এতটা বেড়ে না যায়—যা বহন করা শিশুদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। এতে তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি এমন অনেক ছেলেকে দেখেছি, তার ওজনের চেয়ে পিঠের ব্যাগের ওজন বেশি! প্রতিদিন প্রাইভেট টিউটর, বৃত্তি কোচিং, গাদা গাদা হোমওয়ার্ক আমাদের কোমলমতি শিশুদের নাজেহাল করে দিচ্ছে। ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত চাপ ওদের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা নষ্ট করছে।

মনে রাখবেন, জোর করে বিদ্যা চাপিয়ে দেওয়ার নাম শিক্ষা নয়; শিক্ষা হলো আপনার সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ। আমাদের দেশে যেকোনো উপলক্ষ্যে মাদরাসা কিংবা স্কুলগুলোতে বাৎসরিক ছুটি দিলে স্বভাবতই শিক্ষার্থীরা খুব খুশি হয়, কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে—যেখানে স্কুল বন্ধ দিলে শিশুরা কান্না করে। কারণ, তারা বাসার চেয়ে স্কুলকে বেশি ইনজয় করে। ছুটির দিনগুলোতে তারা তাদের সুন্দর ক্লাসরুম, ক্লাসমেট এবং প্রিয় শিক্ষকদের খুব মিস করে।

মনে আনন্দ নিয়ে বাচ্চারা যেটা শেখে, সেটাই দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে। আমাদের সোনামণিরা মনের আনন্দে, হেসে-খেলে যেন সব শিখতে পারে, সেটার প্রতি আমাদের সবার লক্ষ রাখা উচিত। আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে ওরা যা শিখবে, সেটাই হলো আসল শিক্ষা।

সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিতের জন্য ভালো শিক্ষক বাছাই করুন, ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করুন। লজ্জাজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশের অনেক স্কুল-মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন করা হয়। শারীরিক নির্যাতনের মতো ঘটনাও ঘটে। আপনার সন্তানের সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, চারিত্রিক শুভ্রতা আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়ম শেখান

সন্তানকে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়ম শেখান। আমরা ছোটোবেলায় পড়তাম—

> 'Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise—যে আগে ঘুমায় এবং আগে ঘুম থেকে উঠে, সে স্বাস্থ্যবান, বিত্তশালী ও বুদ্ধিমান হয়।'

এখন ছেলেমেয়ে রাতে ঘুমায় দেরি করে, উঠেও দেরি করে। ফজরের নামাজ পড়ে না, মক্তবেও যায় না—এর কারণ কী? এর কারণ হলো—বাবা-মায়েরাও দেরিতে ঘুমায়, দেরিতে ওঠে। এগুলো খুবই বদভ্যাস, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিজেরা শোধরানোর পাশাপাশি সন্তানকেও এই ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

বাচ্চাকে শেখান—কীভাবে দাঁত ব্রাশ ও মিসওয়াক করতে হয়, কীভাবে স্যানিটেশন, হাইজিন মেইনটেইন করতে হয়, কীভাবে টয়লেট করতে হয়, টয়লেট শেষে কীভাবে হাত ধুতে হয়—সবকিছু।

মেয়ে যখন প্রথম কৈশোরে পা দেয়, তখন তাদের বয়ঃসন্ধিকালের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিন। এক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা বেশি। মেয়েরা এসব জানে না, বোঝে না। অনেকে ভয় পেয়ে যায়; কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। লাজুকতার কারণে কাউকে বলতেও পারে না। ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভোগে। এই অবস্থায় পৌঁছার আগেই মায়েদের উচিত—মেয়েকে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো এবং পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রাথমিক বিষয়াদি শিখিয়ে দেওয়া। যে মেয়েটার প্রথমবার পিরিয়ড হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের করণীয় সম্পর্কে সে নির্ভরযোগ্য কোনো ইনফরমেশন পায় না। ইনফরমেশন থেকে আরও বেশি যেটা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মেন্টাল সাপোর্ট। অর্থাৎ কাছের কেউ সযত্নে তাকে বোঝাবে—এটা কেন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, কীভাবে তুমি এটা মেইন্টেইন করবে, কেন এটা তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি, এটা কোনো অভিশাপ না ইত্যাদি। এই জিনিসগুলো যথাযথভাবে তাদের সাথে অনেক সময় শেয়ার করা হয় না।

আমাদের দেশে এগুলো নিয়ে অনেক অনেক কুসংস্কার আছে। নানি-খালারা এমন এমন কথা বলে—যাতে মেয়েরা আরও বেশি সমস্যায় পড়ে যায়। এই জামা পরা যাবে না, এই কালার পরা যাবে না, এটা ধরা যাবে না, ওটা ধরা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব থেকে আপনার মেয়েকে রক্ষা করতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে—এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। পরিবারের কাছের সম্পর্কের নারী আত্মীয়ারা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ব্ল্যাক ম্যাজিক, জাদু-টোনা, অশরীরী যেকোনো জিনিসের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে কিছু কমন রুকইয়াহ (সুন্নাহসম্মত ঝাড়ফুঁক) শেখান, যাতে সে নিজের ঝাড়ফুঁক নিজেই করতে পারে। তাদের সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসি শেখান।

বিছানা আলাদা করুন

সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তার বিছানা আলাদা করে দিন। এটা বিশ্বনবি ﷺ-এর নির্দেশ (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৫)। মেয়ের বয়স দশ বছর হলে সে আর বাবার সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে পারবে না। ছেলের বয়স দশ বছর হলে সে মায়ের সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে পারবে না। এই সময় তাদের একটু প্রাইভেসি দিন, কিন্তু লাগাম ছেড়ে দেবেন না। বাবা-মা হিসেবে সব সময় তাদের মনিটরিং করুন। আপনার সন্তান কার সাথে মেশে, কোথায় যায়, কোন ওয়েবসাইটে ঢোকে—এগুলো নজরদারি করুন। সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য এটা খুবই জরুরি।

সাঁতার ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদি শেখান

রাস্তায় পড়ে গেলে কীভাবে উঠতে হয়, তা বাবা-মা হাতে ধরে শেখায়। কিন্তু পানিতে পড়ে গেলে কীভাবে জীবন রক্ষা করবে, সেই পদ্ধতি অনেকেই শেখান না। অথচ জীবনের নিরাপত্তার জন্য সাঁতার খুবই জরুরি একটি বিষয়। শুধু সাঁতার নয়, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু বাচ্চাকে শেখানো উচিত। ছেলেমেয়েকে বিশেষভাবে যে কাজগুলো শেখাবেন—

- সাঁতার।
- রান্না। হোস্টেলে, মেসে গেলে অথবা প্রবাস-জীবনে এই বিদ্যা তাদের অনেক কাজে লাগবে।
- সাইকেল, মোটরসাইকেল, গাড়ি চালানো।
- ভাষাগত দক্ষতা অর্জন। মাতৃভাষা, আরবি ভাষা, ইংরেজি ভাষাসহ আরও যতগুলো পারা যায়।
- আত্মরক্ষার কৌশল।

উমর ফারুক ﷺ আবু উবাইদা ﷺ-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি সন্তানদের দুটো জিনিস শেখানোর নির্দেশ দেন—

- সাঁতার কাটা।
- তির চালানো। (মুসনাদে আহমাদ : ৩২৩)

সন্তানদের 'ননির পুতুল' করে গড়ে তোলা উচিত না। এতে তাদের বরং ক্ষতিই হয়। জীবন-সংগ্রামে প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে টিকে থাকতে হয়—সেটা শিক্ষা দিন। তাদের অতি বিলাসী বানাবেন না; কষ্ট-সহিষ্ণু করে গড়ে তুলুন। এতে তারা জীবনঝড়ে ভেঙে পড়বে না; বরং কোমর সোজা করে দাঁড়াতে শিখবে!

সময়মতো বিয়ে দিন

সন্তানকে সময়মতো বিয়ে দিয়ে দিন। এতে তাদের চরিত্রের হেফাজত করা সহজ হয়। তারা ক্যারিয়ারের প্রতি মনোযোগী হয় এবং খামখেয়ালি ভাব ছেড়ে দেয়। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। বিয়ের সম্পর্ক যৌবনের সাথে, ক্যারিয়ারের সাথে নয়। ক্যারিয়ার গড়ার জন্য পড়ে রয়েছে সারা জীবন। যৌবন আল্লাহর দেওয়া এমন এক অমূল্য নিয়ামত, যেটা নবায়নযোগ্য নয়। তাই যৌবনের শুরুতেই ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করুন এবং হালাল পন্থায় যৌবনকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিন।

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতোই বিয়েও একটি মৌলিক অধিকার (Basic Need)। এটি একটি সহজাত বিষয়—যেটাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশে একটি ছেলে অথবা মেয়ে গড়ে ১৫-১৬ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ যৌন সক্ষমতা (Sexual Ability) লাভ করে। কিন্তু তারা বিয়ে করে আরও দশ-পনেরো বছর পর। এই লম্বা সময় ধরে যৌন-ক্ষুধা নিবারণের কোনো বৈধ সুযোগ কি তাদের হাতে রয়েছে? না, নেই। উপরন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলেই আসে সামাজিক যত নিয়মকানুনের দোহাই। একটি মুসলিম সমাজে এটা অপ্রত্যাশিত, অমানবিক এবং সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। সন্তানের খাদ্য, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসা ইত্যাদি চাহিদা মেটাতে অভিভাবকগণ যতটা সজাগ ও সিরিয়াস, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বৈধভাবে যৌন চাহিদা মেটানোর বন্দোবস্ত করাতে তারা ঠিক ততটাই উদাসীন। নানান অজুহাত, বাহানা আর সামাজিকতার দোহাই দিয়ে বিয়েকে দিনকে দিন জটিল থেকে আরও জটিলতর করা হচ্ছে।

মৌলিক এই চাহিদা মেটানোর বৈধ উপায় যেহেতু রুদ্ধ, তাই অবৈধ উপায়গুলো সেই স্থান দখল করে নেবে—এটাই তো স্বাভাবিক। ফলে হারাম রিলেশনশিপ, পর্নোগ্রাফি উপভোগ এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাও আজ দেশের প্রাত্যহিক খবরে (রুটিন নিউজে) পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এই ধ্বংস আর অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে অভিভাবকদের আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আমাদের অবহেলায় আদরের সন্তানরা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমরা কোনোভাবেই এর দায় এড়াতে পারব না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছে, তাদের বিয়ে করিয়ে দাও। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্য, তাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করো। যদি তারা গরিব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানিতে তাদের ধনী করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বড়োই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা নুর : ৩২)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণিত নবিজি যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন—

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং চরিত্রকে হেফাজত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।' (সহিহ বুখারি : ৫০৬৬)

ন্যায়সংগত মিরাস বণ্টন

ছেলেমেয়েদের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। ছেলেকে যদি দেন দুই লাখ, মেয়ে পাবে এক লাখ। ছেলে যদি পায় দুটো গাড়ি, মেয়ে পাবে একটি। এটাই হলো আল্লাহর আইন। অনেক বাবা আছেন, যারা মেয়েকে বলেন—'মা রে! তোর ভাইরে সব দিয়ে দিলাম, আর তোর জন্য দুআ করে দিলাম!' এটা মহা অন্যায়! দুআ তো আপনি ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই করবেন, কিন্তু সম্পদ বণ্টনে মেয়েকে ঠকাতে পারেন না। অনেক বাবা-মা আছেন—যারা ছেলেদের বেশি যত্ন করেন, তাদের জন্য বেশি খরচ করেন আর মেয়েকে বঞ্চিত করেন। এমনটা করা যাবে না; ন্যায়বিচার করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ছেলেদের অংশ দুজন মেয়ের সমান।' (সূরা নিসা : ১১)

রাসূল ﷺ বলেন—

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের মধ্যে ন্যায্যতা বজায় রাখো।' (সহিহ বুখারি : ২৫৮৭)

অনেকের মনে হতে পারে, মেয়েকে ছেলের অর্ধেক কেন? এটা তো বৈষম্য! আসলে এটা বৈষম্য নয়; বরং এটাই ইনসাফ। মূলত ইসলাম ছেলেকে দুই লাখ দিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব, স্ত্রীর মোহরানা। আর মেয়েকে এক লাখ দিয়ে ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে; উপরন্তু তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে অন্যের ওপর। তার সমস্ত খরচ দেবে স্বামী, ভাই, বাবা। সে বিয়েতে স্বামীর থেকে মোহরানাও পাচ্ছে। তাই ছেলে দুই লাখ টাকা পেলেও মাস শেষে দেখা যায়, সবার ভরণ-পোষণ মিটিয়ে তার তেমন কোনো ব্যালেন্স থাকছে না। অন্যদিকে মেয়ে এক লাখ টাকা পেলেও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না থাকায় তার খরচ হয়নি এক টাকাও; পুরো টাকাটাই সঞ্চয় হিসেবে রয়ে গেছে। সুতরাং হিসাব করলে দেখা যায়, জিতটা বরং ছেলের নয়; মেয়েরই হয়েছে।

সূরা লুকমানের শিক্ষা

লুকমান হাকিম ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানকে কিছু চমৎকার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশমালা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য ছিল যে, মহান আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কুরআনুল কারিমে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য এই উপদেশমালা তিলাওয়াতের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি নসিহতের আদর্শ করে রেখেছেন। প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত, তাদের সন্তানদের এই উপদেশগুলো প্রদান করা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

> 'আমি লুকমানকে প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান দান করেছিলাম, আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজেরই কল্যাণ করে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে (তার জানা উচিত) আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও সদা প্রশংসিত। স্মরণ করো, যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল—"হে আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক অতি বড়ো জুলুম (মহাপাপ)।" এবং (আল্লাহ বলেন) আমি তো সবাইকে তার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। আর তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে লাগে পুরো দুই বছর। অতএব, আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। কারণ, আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

(মা-বাবাকে সম্মান করো) যেহেতু তুমি জানো আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তাই তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে কাউকে শরিক করার ব্যাপারে চাপ দেয় (আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজ করতে বলে), তাহলে কখনো তাঁদের সে কথা মানবে না। তবে এরপরও তাঁদের সাথে সব সময় সুন্দর ব্যবহার করবে। যারা বিশুদ্ধচিত্তে আমার পথে চলে, শুধু তাঁদেরই অনুসরণ করবে। তোমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর দুনিয়াতে তোমরা কেমন কাজ করছিলে, তখন তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।

(লুকমান বলল) "হে আমার প্রিয় সন্তান! সরিষার দানা পরিমাণ কোনো কিছুও যদি পাথরের ভেতরে, জমিনের নিচে বা নভোমণ্ডলের কোথাও (লুকিয়ে রাখা) থাকে, তবে আল্লাহ তা-ও হাজির করবেন। আল্লাহ তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। হে আমার প্রিয় সন্তান! নামাজ কায়েম করো। অন্যকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করো এবং অসৎকর্মে নিরুৎসাহিত করো। আর তোমার ওপর আপতিত বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করো। এটাই প্রত্যয়ী মানুষের কাজ। কখনো অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা করো না, মাটিতে গর্বভরে পা ফেলো না। উদ্ধত, অহংকারীকে নিশ্চয়ই আল্লাহ অপছন্দ করেন। (হে আমার প্রিয় সন্তান!) চালচলনে সুশীল হও। মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলো। (কখনো কণ্ঠস্বরকে গাধার স্বরের মতো কর্কশ করো না) নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে কর্কশ।"
(সূরা লুকমান : ১২-১৯)

সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত এবং আমানত। তারা যেমনিভাবে দুনিয়ার সৌন্দর্য, চক্ষু শীতলকারী, ঠিক তেমনিভাবে মাতা-পিতার জন্য ফিতনা বা পরীক্ষাও বটে। সন্তান সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন একটি চ্যালেঞ্জ, তবে এর জন্য আল্লাহ অনেক পুরস্কারও রেখেছেন। সেই পিতা-মাতা সত্যিই ভাগ্যবান, যাদের আল্লাহ তায়ালা নেককার সন্তান দান করেছেন। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত, দেশপ্রেমিক ও আল্লাহ-সচেতন করে গড়ে তুলতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করার তাওফিক দান করুন।

মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস

মুসলিমদের ঐক্যের সূতিকাগার মসজিদ। এখানে কোনো শ্রেণিবিভেদ নেই; নেই কোনো হিংসা-বিদ্বেষ। মসজিদে নামাজ আদায়কালে ধনী-গরিব, বড়ো-ছোটো, উঁচু-নীচু, মালিক-শ্রমিক, ভদ্র-অভদ্র—সকলে একই কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ার কল্যাণে মুসলমানদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। হিন্দুদের মন্দির, খ্রিষ্টানদের গির্জা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা, ইহুদিদের সিনাগগ ও শিখদের গুরুদুয়ারার মতো মসজিদ গতানুগতিক কোনো উপাসনাগৃহ নয়; বরং এটা মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। মসজিদ হলো ভালো কাজে জনমত তৈরির কারখানা। আপনি যদি সিরাত পড়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন—মসজিদে নববি ছিল সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস। রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্মিত 'মসজিদে নববি' শুধু যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় এবং জুমার জামাত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল তা-ই নয়; আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি জাগতিক সমস্যা সমাধানেও এ মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

রাসূল ﷺ-এর সময় মসজিদে নববি ব্যবহৃত হতো প্রধান বিচারালয়, সংসদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক কার্যালয় হিসেবে। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এলে রাসূল ﷺ মসজিদেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালাতেন, রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতেন।

এই মসজিদে নববিতেই বিচারকার্য সম্পন্ন হতো, বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনে রায় দেওয়া হতো, যুদ্ধের ফয়সালা করা হতো, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, বেকার কর্মক্ষম লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হতো। কুরআনুল কারিমের কোনো আয়াত নাজিল হলে এই মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ তা পাঠ করে শোনাতেন এবং নিয়োজিত ওহি লেখকগণ তা লিপিবদ্ধ করতেন। এখানেই কুরআনের ব্যাখ্যা দান, ইসলামি শরিয়াহর বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করা হতো। মসজিদই ছিল আশ্রয়হীন মুসলমানদের (আহলে সুফফার) প্রথম আশ্রয় ও আবাসস্থল এবং সকল কাজ সম্পাদনের কেন্দ্র। নবিজির এই কাজের ধারাবাহিকতা খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও অব্যাহত ছিল। তাই শুধু ধর্মীয় উপাসনা কেন্দ্র না হয়ে মসজিদ হওয়া উচিত জনকল্যাণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিয়ে-শাদিসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজের প্রাণকেন্দ্র, মুসলিম সমাজের কমিউনিটি সেন্টার।

আমাদের দেশে শিশু-কিশোর ও যুবকদের জন্য মসজিদের কোনো কর্মসূচি না থাকায় তারা মসজিদমুখী হচ্ছে না। সমাজে কিশোর অপরাধ এবং যুবকদের অনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার মাত্রাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। অথচ বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে মসজিদ থেকে ওদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে অবদান রাখা যেতে পারে।

বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়, নোটিস বোর্ড টাঙানো কিংবা সুন্দর করে দেয়ালে লেখা—'মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম।' আমি বুঝি না, এ কথা তারা কীসের ভিত্তিতে লিখেন? মসজিদে যদি দুনিয়াবি কথা বলা হারাম হয়, তাহলে রাসূল ﷺও যে বিভিন্ন দুনিয়াবি বিষয়ে মসজিদে কথা বলেছেন, তার কী হবে? নবিজিও কি নিষিদ্ধ কাজ করেছেন? নাউজুবিল্লাহ!

রাসূল ﷺ জুমার খুতবা চলাকালীন কথা বলতে নিষেধ করেছেন, নামাজ চলাকালীনও কথা বলা নিষিদ্ধ। এ রকম দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে মসজিদে দুনিয়াবি কথা না বলার কোনো ভিত্তিই নেই। যে কথা মসজিদে হারাম, তা মসজিদের বাইরেও হারাম। মসজিদের পবিত্রতা ও ভাব-গাম্ভীর্য নষ্ট হয় না—এমন যেকোনো কথা কিংবা আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। রাসূল ﷺ এবং সাহাবিদের যুগে তো তা-ই হতো। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন এবং মসজিদের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। বাইরের মানুষটাকে মসজিদে মেলাতে পারি না, আবার মসজিদের মানুষটাকে বাইরে মেলাতে পারি না। ধরুন, সমাজের একজন অসৎ মানুষকে মসজিদের মধ্যে দেখলে

মনেই হবে না যে সে অসৎ। আবার এই মানুষটাই যখন মসজিদের বাইরে অপকর্মে লিপ্ত, তখন তাকে কোনোভাবেই মনে হবে না—সে নামাজি, সিজদা দেয় আল্লাহকে।

মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা নিষেধ সম্পর্কিত সব হাদিস জাল, বানোয়াট ও মিথ্যা (আল আসরার, পৃ. ২২৭; আল মাসনু, পৃ. ১৪৭; আল ফাওয়াইদ, খ. ১, পৃ. ৪৪)। বরং সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়—মসজিদে কেবল ক্রয়-বিক্রয় করা, হারানো-পলাতক কিছু খোঁজ করা বা চিৎকার করা নিষেধ। তবে দুনিয়াবি প্রয়োজনীয় কথা বলা, কবিতা আবৃত্তি করা, এমনকী মৃদু হাসাহাসি করাও নিষেধ নয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববি (রহ.) বলেন—

> 'মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি বিষয় ও বৈধ কথাবার্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা জায়েজ; যদিও তাতে হাসি আসুক না কেন।' (আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ২/১৭৭)

জাবির ﷺ বর্ণনা করেন—

> 'রাসূল ﷺ যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন, সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। তার সামনেই সাহাবিরা জাগতিক কথা বলতেন, জাহেলি যুগের আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন ও হাসতেন। আর এসব শুনে রাসূল ﷺ শুধু মুচকি হাসতেন।' (মুসলিম : ২৩২২)

পারিবারিক ও সামাজিক যত সমস্যা, তার সমাধানকল্পে মসজিদেই কথা বলা উচিত। সামাজিক কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি রোধে প্রতিটি মিম্বার থেকে আওয়াজ আসা উচিত। শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষরা যেমন মসজিদে সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে সমাধান নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, আমাদের মসজিদগুলোকেও এ রকম সমস্যা (Problem Solving Centre) রূপ দেওয়া উচিত।

সমাজে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ শব্দের উৎপত্তি আরবি শব্দ 'سجد' শব্দমূল থেকে, যার আভিধানিক অর্থ—শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করা, অর্থাৎ সিজদাহ করা। اسم المكان বা স্থানবাচক শব্দ হিসেবে مسجد শব্দটির অর্থ হয় 'অবনত হওয়ার স্থান'।

এ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা জারকাশি (রহ.) উল্লেখ করেছেন—'যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় করা হয়, আর সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সিজদা—যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম, এ কারণেই এই স্থানকে মসজিদ বলা হয়।' (জারকাশি, ইলামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ, পৃ. ২৮)

মুসলিমরা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলেই সেটি মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। আর যেসব মসজিদে নিয়মিত নামাজের সাথে সাথে জুমার নামাজ আদায় এবং অন্যান্য ইসলামিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, সেগুলো জামে মসজিদ (مسجد جامع) নামে অভিহিত। মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়া ঈমানদারের আলামত। আর মসজিদকে ঘৃণা করা মুনাফিকের আলামত। ঈমানদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো—মসজিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

মসজিদ সবার। মসজিদে কোনো দলাদলি নেই, বিভেদ নেই। ভিআইপি মসজিদ, সামরিক মসজিদ, শ্রমিক মসজিদ, হানাফি মসজিদ, আহলে হাদিস মসজিদ ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নেই। মসজিদে সবার পরিচয় এক। সবাই আল্লাহর গোলাম আর আল্লাহর ঘরে সবাই সমান।

আল্লাহর হাবিব ﷺ কোথাও গেলে প্রথমেই সেখানে একটি মসজিদ বানাতেন। মদিনায় হিজরত করার পথে তিনি যখন কুবায় পৌছালেন, তখন সেখানে নির্মাণ করলেন 'মসজিদে কুবা'। বিশ্বনবি ﷺ প্রতি শনিবার ওই মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতেন (সহিহ বুখারি : ১১৯৩)। মদিনায় পৌছার কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে নির্মাণ করলেন মসজিদে নববি।

মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব

মুমিনের মন সব সময় মসজিদে ঝুলে থাকবে, মসজিদকে ঘিরেই তার সমস্ত কাজ আবর্তিত হবে। এটাই মুমিনের মসজিদ আবাদ। যারা মসজিদকে আবাদ করতে পারে, তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

> 'একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আত-তাওবা : ১৮)

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'যখন তোমরা কোনো মানুষকে দেখবে সে মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ছে, তখন তোমরা তার ঈমানের স্বীকৃতি দাও। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন—"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে—যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত আদায় করে..."' (সুনানে তিরমিজি : ২৬১৭)

দুনিয়াতে যারা মসজিদ আবাদ করেন, আখিরাতে আল্লাহ তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ ততবার তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রাখেন।' (সহিহ বুখারি : ৬৬২)

মসজিদ আবাদ করার মাধ্যম

এখন প্রশ্ন হলো—মসজিদকে আবাদ করব কীভাবে? মসজিদকে আবাদ করার কিছু মাধ্যম রয়েছে, যেগুলো সম্পাদন করলে মসজিদ আবাদকারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়।

মসজিদ নির্মাণ : মসজিদ আবাদ করার প্রথম মাধ্যম হলো মসজিদ নির্মাণ করা। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর বানান।' (সহিহ বুখারি : ৪৫০)

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'মুমিনদের যে সমস্ত আমলের এবং নেক কাজের ধারা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হলো—

১. সেই ইলম (জ্ঞান); যা সে শিক্ষা দান করেছে বা প্রসার করে গেছে, ২. রেখে যাওয়া নেক সন্তান, ৩. রেখে যাওয়া কুরআনের কপি, ৪. তার নির্মাণকৃত মসজিদ, ৫. তার নির্মাণ করে যাওয়া মুসাফিরখানা, ৬. তার স্থাপন করে যাওয়া নলকূপ এবং ৭. ওই সাদাকা—যা বেঁচে থাকতে সে দান করে গেছে।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪)

তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই মসজিদ নির্মিত হতে হবে। সুনাম, সুখ্যাতি ও অসুস্থ সামাজিক প্রতিযোগিতার কারণে মসজিদ নির্মাণ উচিত নয়। লোক দেখানো মানসিকতা বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। নিজের আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ অথবা বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এতে কোনো পুণ্য হাসিল হবে না।

জামাতে নামাজ আদায় : মসজিদ আবাদ করার দ্বিতীয় মাধ্যম হলো—মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবারা কখনো ফরজ নামাজ একাকী আদায় করতেন না। কিংবা সফরে সর্বাবস্থায় তাঁরা জামাতে নামাজ আদায় করতেন। মসজিদে নববিতে জুমার নামাজের যেমন দৃশ্য, ফজর নামাজেও প্রায় একই দৃশ্য দেখা যেত। কিন্তু আমাদের সমাজে ঠিক তার উলটো। জুমার দিন একটু দেরি হলে পাঁচতলা মসজিদের ছাদেও জায়গা পাওয়া যায় না। আর ওই একই দিনের ফজরের নামাজে দুই কাতারও অপূর্ণ থাকে। আফসোস! আমাদের মসজিদগুলো পাকা, কিন্তু মুসল্লি কাঁচা। নবির মসজিদ ছিল কাঁচা, তবে মুসল্লিরা ছিলেন পাকা। বিশ্বনবি বলেন—

'জামাতে নামাজের ফজিলত ঘরে নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশগুণ বেশি।' (সহিহ বুখারি : ৬৪৫)

মসজিদের প্রতি আকর্ষণ : মসজিদ আবাদের তৃতীয় মাধ্যম হলো—মসজিদের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি করা। হৃদয়টা যেন সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। আল্লাহর হাবিব ﷺ বলেন—

'সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দেবেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।' (সেই দিন সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে। সূর্যের তাপে মগজগুলো নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে টপটপ করে পড়তে থাকবে।

> সবাই পাগল হয়ে ছুটতে থাকবে, কোনো ছায়া থাকবে না আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া)। এই আরশের ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষ আশ্রয় পাবে। তাদের মধ্যে একশ্রেণি হলো, যাদের হৃদয়টা সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে।' (সহিহ বুখারি : ৬৬০)

হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকার মানে হচ্ছে—সব সময় মনটা মসজিদে পড়ে থাকা। এ রকম অনেকে আছেন—যারা জোহর পড়ে টেনশন করে, আসরটা কোথায় পড়ব? আসর শেষে আবার ভাবতে থাকে, মাগরিবের সময় যেখানে থাকব, তার আশেপাশে মসজিদ থাকবে তো? মাগরিবের পর আবারও হিসাব মেলানো যে, এশাটা হয়ে গেলে আজকের নামাজের পর্বটা সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হলো! ঠিক এ রকম একটা পেরেশানি মন খুব দরকার। এমন মানুষই সেই ভয়াবহ দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবেন।

মসজিদ পরিষ্কার করা : মসজিদ আবাদের চতুর্থ মাধ্যম হলো—মসজিদ পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি। যারা মসজিদ ক্লিন করে বা ঝাড়ু দেয়, আল্লাহ তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করে দেন। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম ﷺ-কে আল্লাহ বাইতুল্লাহ ঝাড়ু দিতে বলেছিলেন—

> 'আমার ঘরকে পাক-সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীদের জন্য।' (সূরা হজ : ২৬)

মসজিদে ইতিকাফ করা : عمران المساجد বা মসজিদ আবাদের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে ইতিকাফ। (الاعتكاف) ইতিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ—কোনো স্থানে অবস্থান করা, স্থির থাকা বা আবদ্ধ হয়ে থাকা। ইসলামি পরিভাষায় রমজান মাসের শেষ দশকে বা বছরের অন্য কোনো সময়ে জাগতিক কাজকর্ম ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দা একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তায়ালার জিকির, তাসবিহ-তাহলিল ও ইবাদতে মশগুল থাকার সৌভাগ্য অর্জন করে। রমজানুল মোবারকে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, রমজান মাসে পবিত্র কদরের রাত রয়েছে। বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, রমজানের শেষ দশকের যেকোনো একটি বিজোড় রাতে কদর হতে পারে। তাই ইতিকাফে যারা থাকবে, তাদের কদরের বরকত মিস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদানি যুগে শুধু এক বছর ছাড়া বাকি জীবন রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করেছেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ওই বছর রমজানে তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। (সহিহ বুখারি : ২০৪০)

মসজিদের আদব

মসজিদ মুসলিমদের সবচেয়ে সম্মানিত স্থান। আমরা মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলে থাকি। এই ঘরে মহান আল্লাহর স্মরণে বান্দা মাটিতে কপাল ঠেকায়। বান্দার সাথে আল্লাহর নিবিড় কথোপকথন হয়। তাই মসজিদে প্রবেশের ও অবস্থানের কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই আদবগুলো রক্ষা করা।

অজু অবস্থায় প্রবেশ : অজু অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা আদবের অংশ। আল্লাহর হাবিব ﷺ বলেন—

> 'তোমাদের কেউ যদি ভালো করে অজু করে কেবল নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতটা কদম রাখে, প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন এবং তার একেকটি গুনাহ মাফ করেন।' (সহিহ বুখারি : ৪৭৭)

ভালো জামা পরিধান : মসজিদে প্রবেশের আগে সবচেয়ে ভালো জামাটি পরিধান করা উত্তম। অনেকে নামাজ পড়ার জন্য একটি পুরাতন বা ছেঁড়া জামা রাখে; হাত উঠালে সবকিছু দেখা যায়! গ্রামাঞ্চলে তো অনেকেই গামছা গায়ে জড়িয়ে মসজিদে যায়। আর বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরে। এ কেমন দৈন্যতা! মসজিদে যাচ্ছেন, এর অর্থ হলো—আপনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণে যদি কোনো প্রোগ্রামে উপস্থিত হোন, তখন আপনার পোশাক নিশ্চয়ই পুরাতন বা অপরিচ্ছন্ন কিংবা ছিঁড়াফাঁড়া হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা তো রাজাধিরাজ, মহা ক্ষমতাধর, মহাবিশ্বের মহান অধিপতি! তাঁর সামনে কেমন কাপড় পরিধান করে হাজিরা দেওয়া উচিত? কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা উচিত? নিজেই একটু ভেবে দেখুন তো।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরা উচিত এবং নিজিকে সব সময় গুছিয়ে, পরিপাটি অবস্থায় মসজিদে যাওয়া উচিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

> 'হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করো।' (সূরা আ'রাফ ৭ : ৩১)

ডান পা দিয়ে প্রবেশ : মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা দিয়ে ঢুকতে হয়। আর বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হতে হয়। ঢোকার সময় দুআ পড়তে হয়—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

'হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।'
(সহিহ মুসলিম : ১৫৩৭)

আবার মসজিদ থেকে যখন বের হব, তখন বাম পা দিয়ে বের হব। আর দুআ পড়ব—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে ফাদল চাই।'

ফাদল মানে হলো রিজিক। এই দুআ দুটি থেকে বোঝা গেল, মসজিদের ভেতরে পাওয়া যায় রহমত, আর বাইরে পাওয়া যায় রিজিক। তাই রিজিকের অন্বেষণে নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আল্লাহর জমিনে বিচরণ করতে হবে। যার যার কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করতে হবে। তবেই তিনি হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। সারাদিন মসজিদে বসে থাকলে কি রিজিকের দেখা মিলবে? না, কখনোই না। পরিশ্রম না করে শুধু মসজিদে বসে আল্লাহ-বিল্লাহ করলে রিজিকের দেখা মিলবে না। তাই, নামাজের সময় মসজিদে থাকতে হবে, কাজের সময় কাজ করতে হবে। এটাই হলো ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। নামাজের সময় নামাজ, কাজের সময় কাজ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

'নামাজ শেষ হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করবে।' (সূরা জুমুআহ ৬২ : ১০)

নামাজ শেষ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা চলে যাবে স্কুলে, চেয়ারম্যান চলে যাবে ইউনিয়ন পরিষদে, সিএনজিওয়ালা চলে যাবে সিএনজি নিয়ে রিজিক অন্বেষণে। আবার আজান হলে ছুটে আসবে আল্লাহর ঘরে।

দুই রাকাত সালাত আদায় : মসজিদে ঢুকেই দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নাহ। এটাকে 'দুখুলুল মসজিদ' বা 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বলে। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।' (সহিহ বুখারি : ৪৪৪)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন : মসজিদকে সাধ্যমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সুগন্ধি লাগানো গুরুত্বপূর্ণ আদব। আম্মাজান আয়িশা ﵂ বর্ণনা করেন—

'বিশ্বনবি মসজিদ পরিচ্ছন্ন এবং সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'
(সুনানে আবু দাউদ : ৪৫৫)

এজন্য কোনো মসজিদ অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারবে না। কারণ, এটা আল্লাহর ঘর। আল্লাহর বান্দারা এখানে এসে আল্লাহর ইবাদত করে। এ ঘরের শান-মান দুনিয়ার যেকোনো স্থাপনার চেয়ে আলাদা।

অনাড়ম্বর : মসজিদের আরেকটা আদব হলো—মসজিদকে অতিমাত্রায় চাকচিক্য বা ডিজাইন না করা। এত বাহারি নকশা ও চাকচিক্য করা যাবে না—যাতে বোঝাই না যায়, এটা মসজিদ নাকি শপিংমল। বিশেষ করে মসজিদের সামনের দেয়ালে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কিছু রাখা উচিত নয়। এটা মুসল্লিদের চোখের সামনে থাকে; তাই এই দেয়ালকে এতটা জাঁকজমক ও চাকচিক্যময় করা যাবে না—যাতে মুসল্লিদের মনোযোগ এর সৌন্দর্যে আটকে যায়, নামাজে মনোযোগ নষ্ট হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন—

> 'তোমরা অচিরেই মসজিদসমূহকে এমনভাবে সুসজ্জিত ও কারুকার্যময় করবে, যেরূপ ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তাদের উপাসনালয় সুসজ্জিত করে।'
> (সুনানে আবু দাউদ : ৪৪৮)

> উমর ﷺ বলেন—'খবরদার! মসজিদকে লাল বা হলুদ রঙের বানিয়ে লোকদের নামাজের সময় ফিতনায় ফেলো না।'
> (বুখারি, ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার : ১/৬৪২)

সবার জন্য উন্মুক্ত : মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই আল্লাহর ঘর আল্লাহর সব শ্রেণির বান্দার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে তারা নির্বিঘ্নে ইবাদত করবে। মসজিদে আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনি কাজ করতে বাধা দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِي خَرَابِهَا-

> 'যে আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিরান করতে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে...'
> (সূরা বাকারা : ১১৪)

কবরের ওপর মসজিদ না বানানো : কবরের ওপর মসজিদ বানানো আদবের খেলাফ তো বটেই; বরং নিষিদ্ধ। অথচ বাংলাদেশে এটা যেন খুবই প্রসিদ্ধ একটা ব্যাপার। আমাদের দেশে অনেক মসজিদ কবরকেন্দ্রিক। ছোট্ট একটি মসজিদ,

আর তার পাশে বিশাল বড়ো এক কবর। তার ওপরে আবার বিশাল সাইনবোর্ড—'অমুক বাবার কবর'। এই মসজিদগুলোর অধিকাংশেই শরিয়াহবিরোধী কাজ হয়ে থাকে। এগুলো সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কোনো ওলি-আউলিয়া বা নবি-রাসূলের কবরকে কেন্দ্র করে যারা মসজিদ বানায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের লানত দিয়েছেন।

তিনি বলেন—

> 'ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত! তারা তাদের নবিগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।' (সহিহ বুখারি : ৩৪৫৩)

আগে হবে মসজিদ, পরে কবরস্থান। যেমন মসজিদে নববি হয়েছে আগে, পরে হয়েছে বিশ্বনবির কবর। তা ছাড়া বিশ্বনবির কবর মসজিদে নববির সাথে লাগোয়া হওয়ার কারণ হচ্ছে, এটা ছিল আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর ঘর। এ ঘরেই বিশ্বনবির ইন্তেকাল হয়েছিল। আর নবিরা যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দিতে হয়।

শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদের গল্প

ইসলামে তিনটি মসজিদের মর্যাদা সবচাইতে বেশি। হাদিসে অন্যান্য মসজিদের ওপর এই তিনটি মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি মসজিদ ঐতিহাসিকভাবে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে আছে। নবি-রাসূলদের পদধূলি ধন্য এই তিনটি মসজিদে সালাত আদায়ের বাসনা প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে। মসজিদ তিনটি হলো—মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি এবং মসজিদে আকসা। দুটিতে মুসলমানদের অবারিত যাওয়ার সুযোগ থাকলেও একটি রয়েছে দখলদার ইহুদিদের অধীনে। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—'বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে এই তিনটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। আর সেগুলো হলো : মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববি) এবং মসজিদুল আকসা।' (সহিহ বুখারি : ১১৮৯)

এই হাদিসের মানে এটা নয়, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মসজিদই ভিজিট করা যাবে না। স্থাপত্যশৈলী (Architectural Design) অবলোকন কিংবা সৌন্দর্য উপভোগ করতে পৃথিবীর যেকোনো মসজিদে যাওয়া যাবে, নামাজ পড়া যাবে, কিন্তু অধিক পুণ্য লাভের আশায় এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ জায়েজ নেই। এই হাদিসে জ্ঞানার্জনের জন্য সফর,

উপার্জনের জন্য সফর, চিকিৎসার জন্য অথবা নিছক পর্যটনের উদ্দেশ্যে সফরকে নিষেধ করা হয়নি। এখানে বোঝানো হয়েছে—মর্যাদার বিবেচনায় পৃথিবীর সমস্ত মসজিদ সমান, তবে এই তিনটি মসজিদ ব্যতিক্রম। সুতরাং অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্য সফর করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রামের কোনো মসজিদ থেকে অধিক সওয়াব মনে করে বাইতুল মোকাররমে আসা যাবে না। কারণ, বাইতুল মোকাররম ও চট্টগ্রামের মসজিদ মর্যাদার দিক থেকে একই। কিন্তু মদিনা থেকে অধিক সওয়াবের জন্য মক্কায় সফর করা যাবে।

মসজিদুল হারাম

মসজিদুল হারাম পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদ—যা পবিত্র কাবাকে ঘিরে অবস্থিত। কাবাকে বলা হয় বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর। এটাই পৃথিবীর প্রথম ঘর। হজ ও উমরাহকারীগণ এই ঘরকে ঘিরে তাওয়াফ করে থাকেন। এই ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়েই পৃথিবীর ২০০ কোটি মুসলিম নামাজ পড়ে। এই মসজিদ থেকেই রাসূল ﷺ-এর ইসরা সংঘটিত হয়েছিল। এই মসজিদ আঙিনায় রয়েছে মাকামে ইবরাহিম এবং জমজমের কূপ। পাশেই কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাফা-মারওয়া পাহাড়। যারা এই মসজিদের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ। এ পবিত্র মসজিদ গোটা মানবসভ্যতার মিলনকেন্দ্র।

> 'মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ পরলে ১ লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।' (মুসনাদ আহমাদ : ১৬১১৭)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

> 'নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদতগৃহটি নির্মিত হয়, সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল।' (সূরা আলে ইমরান : ৯৬)
>
> 'আর যেখান থেকেই তুমি চলো না কেন, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, সে দিকেই মুখ করে নামাজ পড়ো।' (সূরা বাকারা : ১৫০)

'পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন—যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান। আসলে তিনিই সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।' (সূরা বনি ইসরাইল : ১)

'আবু জর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজিকে প্রশ্ন করেছিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন—মসজিদুল হারাম। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—এরপর কোনটি? নবিজি ﷺ বললেন—মসজিদুল আকসা। আবু জর ﷺ এবার জিজ্ঞেস করলেন—উভয়টি নির্মাণের মাঝে ব্যবধান ছিল কত বছর? তিনি বললেন—চল্লিশ (বছর)। এরপর তিনি আরও বললেন—যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নেবে। সেটাই তোমার জন্য কল্যাণকর।' (সহিহ বুখারি : ৩৩৬৬)

তবে কে প্রথম এই মসজিদ তৈরি করেছেন, তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। কোনো কোনো তাফসিরকারকদের মতে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা সর্বপ্রথম বর্তমান কাবা ঘরের স্থানে একটি ঘর তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে আদম ﷺ ইবাদতের জন্য সেখানে আবার নতুন করে ঘরটি তৈরি করেন। কালের বিবর্তনে এই ঘর ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা নতুন করে ইবরাহিম ﷺ-কে এখানে ইবাদতের জন্য ঘর তৈরির নির্দেশ দেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে এর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদুল হারাম বিশাল আয়তন নিয়ে অবস্থিত, যেখানে প্রায় ১০ লাখ লোক একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারে।

মসজিদে নববি

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিজ হাতেগড়া মদিনার অন্যতম স্থাপনা 'মসজিদে নববি'। বিশ্বনবি যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন এ শহরটির নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। নবিজির আগমনের পরপরই ইয়াসরিব নামটি পরিবর্তন করে 'মদিনা' রাখা হয়। এটি বর্তমানে 'মদিনায়ে মুনাওয়ারা' হিসেবে পরিচিত। মসজিদে নববির অবস্থান মদিনা শহরের কেন্দ্রস্থলে। গুরুত্বের দিক দিয়ে দেখলে মসজিদুল হারামের পরপরই এই মসজিদের স্থান। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হওয়ার কারণে হজ ও উমরাহকারীগণ হজের আগে বা পরে মদিনায় অবস্থান করেন।

হিজরতের আগে মদিনায় কোনো মসজিদ ছিল না—যেখানে সাহাবিরা একসঙ্গে নামাজ আদায় করবেন। নতুন হিজরতকারীদের মধ্যে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদের চাহিদা দেখা দিলে নবিজি নিজেই এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য বনু নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল নামক দুই যুবক থেকে জমি ক্রয় করে নবিজি নিজেই সাহাবিদের নিয়ে এ মসজিদের নির্মাণকাজে অংশ নিয়েছিলেন। বিশ্বনবি ﷺ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অংশগ্রহণে ঐতিহাসিক এই মসজিদ গড়ে ওঠে। মসজিদে নববিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল ইতিহাসের প্রথম মুসলিম সমাজ ও কল্যাণরাষ্ট্র।

> 'মসজিদে নববিতে এক রাকাত নামাজ পড়লে এক হাজার রাকাত নামাজ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।' (সহিহ মুসলিম : ১৩৯৫)

মসজিদের ভেতরেই ছোটো রওজা, কিন্তু বিশেষ একটি অংশ রয়েছে রিয়াজুল জান্নাত নামে। এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রওজা মোবারক থেকে তাঁর মিম্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জায়গাটি বেহেশতের বাগান নামেও পরিচিত। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমার ঘর (আয়িশা ﷺ-এর ঘর) ও মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটুকুকে (রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ) জান্নাতের উদ্যানসমূহের অন্যতম একটি উদ্যান।' (সহিহ মুসলিম : ১৩৯১)

খুব সাদামাটা করে আল্লাহর রাসূল এই মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। ছাদ তৈরি করা হয় খেজুর পাতার আস্তরণ দিয়ে। আর খেজুর গাছের খুঁটি দিয়ে ছাদের কাঠামো ধরে রাখা হয়। মসজিদে নববির ফ্লোর ছিল বালি আর মাটির। বৃষ্টি হলে ফ্লোর কর্দমাক্ত হয়ে যেত। মসজিদে মোট তিনটি দরজা ছিল। দক্ষিণে বাবে রহমত, পশ্চিম দিকে বাবে জিবরিল এবং পূর্বদিকে বাব আন-নিসা।

এ মসজিদ শুধু নামাজ পড়ার জন্যই ছিল না; বরং এটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলমানরা ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষালাভ করত। সাহাবিদের দ্বীন শেখানো থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ বিশ্বনবি মসজিদে নববিতে বসেই আঞ্জাম দিতেন। সাহাবিরা এখানেই তাঁর কাছে কুরআন শিখতেন। আবার এর প্রাঙ্গণে চলত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিসভা। আক্ষরিক অর্থেই এ মসজিদ ছিল জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। মদিনার সোনালি সমাজ বিনির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল এই পবিত্র মসজিদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত মসজিদে নববিই ছিল ইসলামি খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই গোটা মুসলিম বিশ্ব পরিচালিত হতো।

এ মসজিদেরই একপাশে সবুজ রঙের গম্বুজের নিচে শুয়ে আছেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাঁর কবর মোবারকের সাথেই রয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর এবং দ্বিতীয় খলিফা উমর ﷺ-এর কবর। মসজিদে নববির পাশেই বাকি কবরস্থান। এখানে ফাতিমা ও উসমান ﷺ এবং নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণসহ অগণিত সাহাবায়ে কেরামের কবর রয়েছে। এর একপাশে নতুন নতুন কবর হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এখানে শুধু একটি পাথরের খণ্ড দিয়ে চিহ্নিত করা আছে একেকটি কবর।

এই মসজিদটিও বহুবার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। খায়বারের যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরিতে মসজিদে নববি কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথম খলিফা আবু বকর ﷺ-এর শাসনামলে মসজিদের আকার অপরিবর্তিত থাকলেও দ্বিতীয় খলিফা উমর ﷺ মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এরপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় যুগেও করা হয় নানা সংস্কার। সৌদি আরব প্রতিষ্ঠার পরও মসজিদের বেশ কয়েক দফা সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। মসজিদটিতে বর্তমানে প্রায় সাত লাখ মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন।

বর্তমান মসজিদে নববি আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন। বিশাল আয়তন, অপরূপ কারুকার্য, উন্নত কার্পেট, আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যেকোনো লোককেই মুগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। মসজিদে নববির খোলা প্রাঙ্গণের অন্যতম সেরা আকর্ষণ হলো বিশাল অটোমেটিক ছাতা। শক্ত স্তম্ভের শীর্ষভাগে ছাতাগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে—যখন বন্ধ থাকবে, তখন স্তম্ভের একটি অংশই মনে হয়। রোদ উঠার সাথে সাথে প্রতিদিন সকালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধীরে ধীরে ছাতাগুলো খুলে যায়। সে এক চোখ ধাঁধানো দৃশ্য! সব মিলে মসজিদে নববির পরিবেশটা খুব স্নিগ্ধ, হিমেল আর ছিমছাম। মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই যেন প্রাণটা শীতল হয়ে যায়।

মসজিদুল আকসা

মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ—যেটি জেরুজালেমের পুরোনো শহরে অবস্থিত। এটা মুসলমানদের কাছে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বা 'আল আকসা' মসজিদ নামে পরিচিত। ইসলামি স্থাপনার প্রাচীন এই নমুনাটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি—তিন ধর্মাবলম্বীদের কাছেই সমানভাবে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। ঈসা ﷺ ও মারইয়াম ﷺ-এর সাথে প্রাচীনতম ইবাদতগৃহ বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকসার সম্পর্ক সুনিবিড়ভাবে জড়িত।

মুসলমানদের কাছে আল আকসা মসজিদ নামে পরিচিত স্থাপনাটি ইহুদিদের কাছে 'টেম্পল মাউন্ট' নামে পরিচিত। আল আকসা হচ্ছে ইসলামের প্রথম কিবলা এবং মক্কা ও মদিনার পর তৃতীয় পবিত্র স্থান। মসজিদুল আকসায় এক রাকাত নামাজ আদায় করলে ২৫০, অন্য বর্ণনায় ৫০০ রাকাতের সাওয়াব পাওয়া যায়। শেষ জামানার ঘটনাবলির কারণেও এ এলাকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলেই দাজ্জাল ও ঈসা ﷺ-এর আগমন ঘটবে।

বিশ্বনবি ﷺ মিরাজের রাতে মসজিদুল হারাম থেকে আল আকসা মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যাত্রা করেন। বিশ্বনবি ﷺ মিরাজ গমনের প্রাক্কালে এই মসজিদে সকল নবি-রাসূলের ইমামতি করে নামাজ আদায় করেন। এতে তিনি 'ইমামুল আম্বিয়া' অর্থাৎ সকল নবির ইমাম এবং 'সায়্যিদুল মুরসালিন' তথা সব রাসূলের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। এ এলাকাটি অসংখ্য নবি—রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত। এর আশপাশে অনেক নবি-রাসূলের কবর রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি ওহি অবতরণের স্থল, ইসলামের কেন্দ্র, ইসলামি সংস্কৃতির চারণভূমি এবং ইসলাম প্রচারের লালনক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। আল আকসা মসজিদের গুরুত্বের আরও একটি বড়ো কারণ হলো—রাসূল ﷺ-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে টানা ১৪ বছর পর্যন্ত আকসা মসজিদই ছিল মুসলিমদের কিবলা। মক্কায় যখন রাসূল ﷺ নামাজ পড়তেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে দাঁড়ালেও কাবাকে তিনি সামনে রাখতেন। হিজরতের ১৬/১৭ মাস পর মহান আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার দিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়।

বিশুদ্ধ মতানুসারে—সর্বপ্রথম আদম ﷺ মসজিদুল আকসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইমাম কুরতুবির মতে, এই মসজিদটি প্রথম নির্মাণ করেন আদম ﷺ-এর কোনো এক সন্তান। ইবনে হাজার আল আসকালানি (রহ.) নুহ ﷺ-এর সন্তান সাম-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে এই মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন ইবরাহিম ﷺ-এর সন্তান নবি ইসহাক ﷺ এবং পরিপূর্ণ করেছিলেন নবি সোলায়মান ﷺ। বনি ইসরাইলের ধার্মিক লোকজন এই বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসায় আল্লাহ তায়ালার উপাসনায় মগ্ন থাকত।

ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর আমলে জেরুজালেম বিজয় হলে বর্তমান মসজিদের স্থানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারিত হয়। ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন।

পরবর্তী সময় খলিফা আল মাহদি মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরেকবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতিমীয় খলিফা আলি আজ-জাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন, যা অদ্যাবধি টিকে আছে।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করার পর মসজিদুল আকসাকে একটি প্রাসাদ এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুব্বাতুস-সাখরাকে গির্জা হিসেবে ব্যবহার করত। মুসলিম বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম পুনরায় জয় করার পর মসজিদ হিসেবে পুনরায় ব্যবহার শুরু হয়। আইয়ুবি, মামলুকি, উসমানি, সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল ও জর্ডানের তত্ত্বাবধানে এর নানাবিধ সংস্কার করা হয়। বর্তমানে পুরোনো শহরটি ইজরাইলিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইসলামের তৃতীয় বৃহত্তম ঐতিহাসিক এ মসজিদটির ওপর চলছে জায়োনিস্ট ইহুদিদের আগ্রাসন। অবৈধভাবে গড়ে উঠা রাষ্ট্র ইজরাইল ১৯৬৭ সালে মসজিদুল আকসা জবরদখল করে নেয়। এরপর থেকে সেখানকার মুসলিম জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জায়োনবাদী ইজরাইল একের পর এক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা জবরদখল করে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে।

বর্তমানে এ মসজিদে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। ইজরাইলের মুসলিম বাসিন্দা এবং পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ ও নামাজ আদায় করতে পারে। আবার অনেক সময় তাদের বাধা দেওয়ারও ঘটনা ঘটে। এই বিধিনিষেধের মাত্রা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়। কখনো শুধু জুমার নামাজের সময় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। গাজার অধিবাসীদের জন্য বিধিনিষেধ অনেক বেশি কঠোর। আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আবারও আমাদের কুদস বিজয়ের তাওফিক দেন এবং মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধার করার হিম্মত নসিব করেন।

মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে করণীয়

সত্যিকারার্থে আপনি যদি একটি নামাজি সমাজ কিংবা নামাজি প্রজন্ম দেখতে চান, তাহলে শিশু ও তরুণদের মসজিদমুখী করতে হবে। যে প্রজন্ম অভ্যাসগতভাবেই মসজিদমুখী, সে প্রজন্ম স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণকামী হয়। অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম যদি মসজিদ না চেনে, তাহলে তারা বিকল্প জায়গা খুঁজে নেবে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। কিশোর গ্যাং, মাদকাসক্তি ও ধর্ষণ বিস্তার তার চাক্ষুষ প্রমাণ। তাই সুন্দর ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

তরুণদের মসজিদমুখী করার জন্য ছোটো বয়স থেকেই তাদের মসজিদে নিয়ে আসতে হবে। মসজিদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে মসজিদের আদবগুলো শেখাতে হবে। মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো পুরস্কার হিসেবে চকলেট-চিপস দেওয়া যেতে পারে। বাচ্চারা যেহেতু নতুন জামা পরতে ভালোবাসে, তাই মসজিদে আসার জন্য তাদের নতুন জামা কিনে দেওয়া যেতে পারে অথবা অপেক্ষাকৃত ভালো জামাটি পরানো যেতে পারে—এতে তাদের আগ্রহ প্রবল হবে।

বাচ্চারা সাধারণত একটু দুষ্টু স্বভাবের হয়। তারা সুযোগ পেলেই হাসি, কান্না, ছোটাছুটি, হইহুল্লোর ইত্যাদি করতে ভালোবাসে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তারা এর ভালো-মন্দ প্রভাব বুঝতে পারে না। তারা যদি বুঝত, তাহলে দুষ্টুমি করত না। বাচ্চা থাকতে আপনিও এমন করেছেন। আর এ রকম দুষ্টুমি খুনশুটি বাচ্চাদেরই মানায়। বড়োরা এমনটা করলে মানাবেও না; বরং মানুষ তাদের পাগল বলবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের একটু সজাগ হতে হবে। মসজিদে যাতে তারা এসব না করে, এজন্য বাড়িতেই তাদের বোঝাতে হবে। নিয়মিত বোঝালে তারা একসময় মসজিদের পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

অভিভাবকদের উচিত সন্তানকে পাশে নিয়ে নামাজে দাঁড়ানো। এতে তারা দুষ্টুমি করার সুযোগ পায় না। আর পেছনের কাতারে পাঠিয়ে দিলে তারা আরও বেশি করে দুষ্টুমি করার সুযোগ পায়। মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে গল্পোচ্ছলে তাদের মসজিদের আদব-কায়দা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিখিয়ে দিতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে—এটা আমাদের ইবাদতগৃহ, এটা পবিত্র জায়গা। এখানে দুষ্টুমি করতে হয় না। এখানে নীরবে সুন্দর পরিবেশে, ভদ্রভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতে হয়। এভাবে বুঝিয়ে বললে ধীরে ধীরে মসজিদের আদব সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে।

নিজের সন্তান ছাড়াও মসজিদে আরও যেসব শিশু আসে, তাদের আদর করতে হবে, প্রসংশা করতে হবে। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন, উৎসাহ দিন, সুযোগ থাকলে তাদের নিয়ে গল্প করুন, নবি-রাসূলদের গল্প শোনান। কখনো কখনো তাদের চকলেট, কলম, বই, ফলমূল উপহার দিন। এতে তারা আনন্দিত হবে, মসজিদকে উপভোগ করতে শিখবে, মসজিদকে নিজের মনে করবে এবং মসজিদে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

মনে রাখবেন, বড়োদের নামাজি বানানো খুব কঠিন, কিন্তু ছোটোদের মসজিদমুখী করা খুবই সহজ। তাই দাওয়াতি কাজের একটা বড়ো সময় ছোটোদের পেছনেই ব্যয় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও শিশুদের মসজিদে নিয়ে আসতেন

এবং তাদের দুষ্টুমি সহ্য করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর প্রিয় নাতি ইমাম হাসান ও হুসাইন ﷺ তাঁর কাঁধে চড়ে বসতেন। ফলে তিনি সিজদা থেকে উঠতে পারতেন না, দীর্ঘ সময় ধরে সিজদায় থাকতে হতো তাঁকে। তবুও তিনি নাতিদের সঙ্গে রাগ বা খারাপ আচরণ করতেন না। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৯৭০)

আবু কাতাদাহ ﷺ বর্ণনা করেন—

> 'রাসূল ﷺ তাঁর নাতনি উমামাহ ﷺ-কে কাঁধে করে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। রাসূল ﷺ ইমামতির জন্য নামাজের স্থানে দাঁড়ালে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, অথচ সে (উমামাহ ﷺ) তাঁর স্থানে তথা রাসূল ﷺ-এর কাঁধেই আছে। রাসূল ﷺ নামাজের তাকবির দিলেন, আমরাও তাকবির দিলাম। রাসূল ﷺ রুকু করার সময় তাঁকে পাশে নামিয়ে রেখে রুকু ও সিজদা করলেন। সিজদা শেষে আবার দাঁড়ানোর সময় তাঁকে আগের স্থানে উঠিয়ে নিতেন। এভাবে নামাজের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাকাতেই তিনি এমনটি করেছেন।' (সুনানে আবু দাউদ : ৯১৮)

এ ছাড়াও নবিজির খুতবা দেওয়ার সময় কলিজার টুকরা দৌহিত্র হাসান-হুসাইন এলে তিনি খুতবা বন্ধ রেখে তাঁদের জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। কোলে তুলে নিতেন এবং চুম্বন করতেন। আর বলতেন—'খুতবা শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তাই খুতবা দেওয়া বন্ধ করেই এদের কাছে চলে এসেছি।' (সুনানে আবু দাউদ : ১১০৯)

সুবহানাল্লাহ! রাসূল ﷺ ছোটো বাচ্চাদের কাঁধে নিয়ে নামাজ পড়তে পারেন, জুমার খুতবা থামিয়ে নাতিদের কোলে তুলে নিতে মিম্বার থেকে নেমে আসতে পারেন। আর আমরা মসজিদে বাচ্চাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। মসজিদে বাচ্চা দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি।

বাচ্চারা দুষ্টুমি করবে—এটাই স্বাভাবিক। আবার অনেকে বলে থাকেন, এখনকার বাচ্চারা একটু বেশিই দুষ্টু। হ্যাঁ, এটিও ঠিক; কিন্তু তাই বলে তো আপনি বাচ্চাকে ধমক দিলে হিতে বিপরীত হবে। কেননা, যে একবার ধমক খাবে, সে পরবর্তী সময়ে মসজিদে আসতে ভয় পাবে। বাচ্চাদের যদি মসজিদ থেকে দূরে রাখেন, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে মুসল্লিই থাকবে না—এই ব্যাপারটি কি কখনো চিন্তা করেছেন? ধমকের শিকার হলে হয়তো বাচ্চারা ভাবতে পারে, মসজিদে গিয়ে ধমক খাওয়ার চাইতে বাসায় বসে ভিডিও গেমস খেলাই ভালো।

যে সমাজের মসজিদগুলো শিশু-কিশোরদের পদচারণায় মুখর থাকে, সেই সমাজে মুসল্লির অভাব হয় না। আমরা যদি মসজিদে অধিক পরিমাণে কিশোর, তরুণ-যুবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে রাতারাতি এ সমাজ বদলে যাবে। মাদকসেবী কমে যাবে, ধর্ষণ, ইভটিজিং বন্ধ হবে, নতুন করে আর কোনো কিশোর গ্যাং গড়ে উঠবে না। আমরা পাব মসজিদমুখী এক আলোকিত তরুণ প্রজন্ম।

আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে মসজিদ যেমন হওয়া উচিত

মসজিদ ইসলামি সমাজব্যবস্থার নিউক্লিয়াস। ইসলামি সমাজ মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। মসজিদকে ঘিরেই মুসলিমদের যাবতীয় কাজ আবর্তিত হওয়া উচিত। মসজিদ শুধু ইবাদতখানা নয়; আলোকিত মানুষ তৈরির কারখানাও। মুসলিম উম্মাহর আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল। মসজিদে যেমন আত্মার খোরাক মেলে, তেমনি এখানে জাগতিক সমস্যার সমাধানও মিলবে। মসজিদ হবে আলোকিত সমাজ গঠনের কেন্দ্র। তবে এর জন্য চাই প্রতিটি শহর, উপশহর, উপজেলা এবং গ্রাম-গঞ্জে আদর্শ মসজিদ স্থাপন, যোগ্য ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগ এবং উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা। একটি প্রাণবন্ত মসজিদের অবকাঠামো ও একটি আদর্শ মসজিদ কেমন হওয়া উচিত, তার একটি রূপরেখা নিচে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বৃহৎ পরিসরে মসজিদের কাঠামো নির্মাণ

মসজিদের আয়তন বৃহৎ পরিসরে হওয়া উচিত। প্রশস্ত ও বড়ো এরিয়া নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, যেন তা সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং মসজিদকে কেন্দ্র করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদন, শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়। মসজিদ কেবল ইবাদতের জায়গাই হবে না; বরং ইবাদতকারীদের যোগ্যতর করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য কাউন্সিলিং, শিশুদের সুস্থ বিনোদনের জন্য সেরা স্থান এবং মানুষের নির্ভরতা ও আস্থার প্রতীক বলে স্বীকৃত হবে। এ সমস্ত কাজের জন্য মসজিদের আয়তন বড়ো পরিসরে হওয়া আবশ্যক। মসজিদের অবকাঠামো এমন হওয়া উচিত—যাতে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও সেখানে পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরি, গবেষণাগার, ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য ক্লাসরুম, মসজিদ প্রাঙ্গণে শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, খেলার সমগ্রী, বসার ও শরীরচর্চার জন্য সুব্যবস্থা,

সামাজিক বিচার-আচারের জন্য আলাদা কনফারেন্স রুম ইত্যাদি থাকে। আনুষঙ্গিক আরও যেসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, তা হলো—

- পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যবস্থা থাকা; যাতে যারা গাড়ি নিয়ে আসবেন তাদের কোনো বেগ পেতে না হয়।
- মনোরম ওয়াশ এরিয়া থাকা; যাতে আল্লাহর বান্দারা অজু সেরে সুন্দর টাওয়ালে হাত-মুখ মুছে নিতে পারে।
- মসজিদের বাইরে ফুলের বাগান থাকা (Eco Friendly Mosque), পরিবেশবান্ধব মসজিদ হওয়া।
- এয়ারকন্ডিশন, সিসি ক্যামেরা, উন্নত কার্পেট, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম, জুতা রাখার নিরাপদ বাক্স, সুতরা, রেহাল, টিসুর বক্স, টাওয়াল, আতরের ছোটো বোতল, পরিষ্কার লুঙ্গি ও মেয়েদের জন্য বড়ো হিজাব।
- মসজিদ চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা এবং সিকিউরিটি গার্ড নিশ্চিত করা।
- মসজিদ ম্যানেজমেন্ট অফিস তৈরি করা; যেখান থেকে মসজিদের সকল অ্যাক্টিভিটি অপারেট করা হবে।

যোগ্য ইমাম নিয়োগ

মসজিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ইমাম সাহেব। একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে তিনিই হবেন মূল কারিগর। এজন্য তাঁকে হতে হবে খুবই চৌকশ, দক্ষ, জ্ঞানী ও অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী। সমাজে কী চলছে, কী সমস্যা বিরাজ করছে, তা ত্বরিত গতিতে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণই হবে ইমাম সাহেবের অন্যতম প্রধান কাজ। তিনি হবেন সকল শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও রোলমডেল। সব শ্রেণির মানুষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। দ্বীনি সমস্যা, মানসিক সমস্যা, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, বার্ধক্যকালীন সমস্যা, মাদকাশক্তি, ক্যারিয়ারবিষয়ক দিকনির্দেশনা, উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তিনি একজন যোগ্য পরামর্শক ও সংগঠক হিসেবে কাজ করবেন। এই সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যে ধরনের মেধা, মনন, যোগ্যতা, কর্মস্পৃহা, সৃজনীশক্তি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দরকার, তার সমস্ত কিছুতেই ইমাম সাহেবকে বলীয়ান হতে হবে।

যে ইমাম এগুলো করতে পারেন না, তিনি কীভাবে ইমাম হতে পারেন? নামাজ তো অনেকেই পড়াতে পারেন, তাহলে আলাদা করে আর ইমাম রাখার প্রয়োজন কী? মূলত ইমাম তিনিই হবেন—যিনি সঠিক পথ চেনেন, সে পথে এগোতে পারেন এবং অন্যকে পথ দেখাতে পারেন (Who knows the way, who goes the way, who shows the way and then he's Imam)।

একজন যোগ্য ইমাম হওয়ার জন্য শরয়ি যোগ্যতার পাশাপাশি আরও যেসব প্রয়োজনীয় গুণ থাকা আবশ্যক, তা হলো—

ক. **ঐক্য বজায় রাখার ক্ষমতা :** একজন ইমামের অন্যতম প্রধান কাজ হলো—সমাজে ঐক্য বজায় রাখা। একটি সমাজে অনেক মত, মাজহাব ও দলের লোক থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চিন্তা ও বিশ্লেষণ থাকে। ঈমান ও আমলের দিক থেকেও থাকে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ইমাম সাহেবের কাজ হলো—সবার মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি ধরে রাখা। ভিন্ন মতকে উড়িয়ে না দিয়ে সম্মান এবং পরস্পরের মধ্যে মিলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। বিভিন্ন মতের মুসলিমদের মধ্যে তাওহিদের ভিত্তিতে সমঝোতা করার চেষ্টা করা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই ইসলামের মৌলিক প্রাণসত্তার সাথে আপস করে কৃত্রিম সমঝোতা কাঙ্ক্ষিত নয়।

খ. **নিজেকে আপডেট রাখা :** একজন ইমাম সমসাময়িক বিষয়ে অনেক বেশি আপডেট থাকবেন। তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের হালচাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংকট নিয়ে গবেষণা করবেন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে সমস্যার কারণ ও উত্তরণের পথ উদ্‌ঘাটন করবেন। অতঃপর এই বিষয়ে জুমার খুতবায় প্রাণবন্ত আলোচনা এবং জনগণকে সচেতন করবেন। সর্বোপরি তিনি সংকট মোকাবিলায় জনগণকে দায়িত্বশীল হতে শেখাবেন। এতে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেবেন।

গ. **ভাষার দক্ষতা :** একজন ইমাম ভাষা ও বাগ্মিতায় হবেন পারদর্শী। তিনি মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজি ভাষায়ও দক্ষ (Expert) হবেন। এগুলোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ভাষাও দখলে রাখতে পারেন। শুদ্ধ উচ্চারণ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল উপস্থাপন, সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপযুক্ত ও পরিশীলিত শব্দচয়ন এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী হবেন। তিনি হবেন যেকোনো বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনে দক্ষ। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ইমামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

তারা ইমামকে আইকন হিসেবে গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। ফলে ইমামগণ সাধারণ মানুষের সামনে দ্বীনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের বেশি বেশি সুযোগ পাবেন।

ঘ. **সাবলীল উপস্থাপনার সক্ষমতা :** উপস্থাপনা একটি শিল্প। কোনো বিষয়ে যেনতেন দায়সারা উপস্থাপনা করা হলে বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য সুন্দর ও সাবলীল উপস্থাপন খুবই জরুরি। মুসল্লিদের মন-মেজাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বলতে পারলে তাদের শেখানো, বোঝানো এবং প্রভাবিত করা সম্ভব হবে। শ্রোতামণ্ডলী যে ভাষায়, যে পদ্ধতিতে বুঝবে, সেভাবেই কথা বলতে হবে। ইমাম সাহেব যদি শহরের মসজিদগুলোতে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন, তাহলে তা আবেদন হারাতে বাধ্য। আবার খুব গ্রামীণ পরিবেশে আপনি যদি আরবি ও ইংরেজি দিয়ে কথা বলেন, তাহলে সেটিও আবেদন হারাবে। রাসূল ﷺ-এর উপস্থাপনাভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন কাফির-মুশরিক সবাই মিলে তাঁর কথা শুনত। তিনি বলতেন অল্প, কিন্তু তাঁর কথামালার আবেদন ছিল অনেক বেশি—যা উপস্থিত শ্রোতাদের বিমোহিত করত।

ঙ. **আস্থাবান হওয়া :** ইমাম সাহেবকে অবশ্যই আস্থাবান হতে হবে। তাঁকে এমন যোগ্য ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে—যাতে সর্বসাধারণ তাদের সাথে কথা বলতে, তাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতে এবং সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ করতে উৎসাহী হয়। ইউরোপ-আমেরিকার অনেক মসজিদে ইমামদের সাথে কনসাল্টেশন টাইম মেইনটেইন করতে হয়। ওই নির্ধারিত সময়ে তিনি লোকজনের সমস্যার কথা শোনেন এবং ইসলামের আলোকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমাদের সমাজে অনেক সহজ-সরল মানুষ থাকে, তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য যার-তার কাছে ধরনা দেয়। কিছু বাজে লোক এই সুযোগে তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। ইমাম সাহেব যদি আস্থার প্রতীক এবং যোগ্যতর হন, তাহলে সকল শ্রেণির মানুষ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে এবং প্রতারণা থেকে নিস্তার পাবে। সমাজে ভালো মানুষের যখন প্রভাব বাড়ে, তখন প্রতারকদের দৌরাত্ম্য কমে যায়।

চ. **অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া :** ইমাম সাহেবকে কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, লেনদেন, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা,

চিন্তা-গবেষণা ও প্রোডাক্টিভিটিতে হতে হবে রোলমডেল। মানুষ যেন তাঁকে দেখে সকল ক্ষেত্রেই প্রেরণা নিতে পারে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি নিজেকে দাওয়াতি চরিত্রের উপমা হিসেবে উপস্থাপন করবেন। কারণ, মানুষ কথার চেয়ে কাজকেই বেশি অনুসরণ করে।

ছ. **নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা :** সমাজের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়া এবং সমস্যার সমাধানের জন্য ইমাম সাহেবকে অবশ্যই নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের নেতৃত্ব যদি ইমাম সাহেবের মতো ভালো মানুষরা দিতে পারেন, তাহলে সেই সমাজ পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগবে না। ইমাম সাহেব যেমন নামাজের নেতৃত্ব দেবেন, তেমনি সমাজের উন্নয়ন এবং ভালো কাজের নেতৃত্বও দেবেন।

জ. **গবেষক হওয়া :** জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে ইমাম সাহেবদের অবশ্যই ভালো গবেষক হতে হবে। গভীর জ্ঞান ছাড়া জাহেলিয়াতকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের পাশাপাশি কনভেনশনাল জ্ঞানেও ইমাম সাহেবদের সমানভাবে পারদর্শী হতে হবে। ইমাম সাহেবগণ যখন ভালো চিন্তক ও গবেষক হবেন, তখন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁরা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

পাঠাগার

আলোকিত সমাজ গঠনের প্রথম শর্ত হলো জ্ঞানার্জন করা। নিবিড় অধ্যয়ন ছাড়া জ্ঞানর্জন সম্ভব না। জ্ঞানকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক চৌহদ্দির মধ্যে আবধ্য করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যয়ন। লাইব্রেরি বা পাঠাগার এমন একটি জায়গা, যেখানে মানুষ নিজের ইচ্ছায় পড়ে। কেউ কাউকে জোর করে না। যে জাতি নিজের গরজে পড়তে শেখে, সে জাতির উন্নতি অত্যাসন্ন। আমাদের চারপাশে কত বইয়ের ছড়াছড়ি, কিন্তু অধিকাংশ মসজিদেই কোনো লাইব্রেরি বা বই পড়ার ব্যবস্থা নেই। একটি আদর্শ মসজিদে অবশ্যই পাঠাগার থাকতে হবে, যেন মানুষ নামাজের আগে-পরে সুযোগ পেলেই সেখানে বসে পড়াশোনা করতে পারে। পাঠাগারে থাকবে ইসলামের মৌলিক গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই। বাচ্চাদের ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের উপযোগী বইও সেখানে থাকতে হবে, যেন সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ এখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

শিক্ষা কার্যক্রম

শিশুদের, তরুণদের ও বয়স্কদের কুরআন-হাদিস ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মসজিদে নিয়মিত, অনিয়মিত, মর্নিং শিফট ও সান্ধ্যকালীন শিক্ষা কার্যক্রম থাকতে হবে, যেন সমাজের প্রতিটি প্রজন্ম মসজিদ থেকেই দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে মসজিদকেন্দ্রিক পার্টটাইম তাহফিজ সেন্টার রয়েছে, যেখানে সকাল-বিকাল দুই শিফটে হিফজুল কুরআনের ব্যবস্থা রাখা হয়। স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে লম্বা সময় নিয়ে পার্টটাইম হিফজ করতে পারে। ফুলটাইম হিফজের পাশাপাশি এ দেশে মসজিদকেন্দ্রিক পার্টটাইম তাহফিজ সেন্টারেরও খুব দরকার। যারা পুরো কুরআন হিফজ করতে পারবে না, তারা পাঁচ পারা, দশ পারা কিংবা পনেরো পারা হিফজ করবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। আরব বিশ্বে এই সুন্দর প্রচলনটি রয়েছে। অর্থাৎ তারা প্রায় সবাই কুরআনের কিছু না কিছু হিফজ করে থাকে। যাদের মেধা ভালো, তারা পুরো কুরআন আর অন্যান্যরা তাদের সাধ্যমতো।

গবেষণাগার

মসজিদের তত্ত্বাবধানে একটি সমৃদ্ধ গবেষণাগার (Research Centre) থাকবে। সেখানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং বিভিন্ন যুগের ও বিভাগের মূল্যবান গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকবে। ইমাম সাহেবের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা আগ্রহী পেশাজীবীরাও ইসলাম ও সমাজসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করবে। মসজিদের পক্ষ থেকে স্বল্প পরিসরে গবেষণা অনুদান (Research Grant) মঞ্জুর করা হবে। এর মাধ্যমে সমাজে গবেষণার চর্চা ও প্রবণতা বাড়বে।

শিশু চত্বর

মসজিদের শিশুদের জন্য (Kids Zone) নামে আলাদা জায়গা থাকবে। সেখানে থাকবে তাদের উপযোগী খেলনা, বই, বিনোদন সামগ্রী ইত্যাদি। শিশুরা যেন বাইরে কোথাও ঘোরাঘুরির চাইতে মসজিদকে বেশি প্রাধান্য দেয়, এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বড়ো বড়ো শপিং সেন্টারগুলোতে দেখবেন, শিশুদের জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করা থাকে। বাবা-মা তাদের বাচ্চাকে সেখানে রেখে শপিং করে। আর শিশুরাও তাদের জন্য উপযোগী জায়গা পেয়ে বারবার সেখানেই যেতে চায়। মসজিদে আলাদা শিশুচত্বর থাকলে ছোটোবেলা থেকেই শিশুরা মসজিদমুখী হবে।

মেয়েদের নামাজের স্থান

বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় নারীদেরও বিভিন্ন পেশাগত কারণে, শিক্ষার্জনসহ চিকিৎসা ও নানাবিধ প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যেতে হয়। কিন্তু তাদের জন্য বাংলাদেশে খুব কম মসজিদই পাওয়া যাবে—যেখানে মহিলাদের আলাদা নামাজের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে নারীদের মসজিদে অনেকটা অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছে। আরববিশ্বসহ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে 'Women's Prayer Hall', মুসল্লা লিস-সাইয়্যিদাত (مصلى للسيدات) নামে মসজিদে নারীদের নামাজ আদায়ের আলাদা জায়গা থাকে। যদিও নারীদের জন্য ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম, কিন্তু ঘরের বাইরে গেলে যখন নামাজের সময় হয়, তখন তারা কোথায় নামাজ পড়বে? অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী একসাথে বাইরে কোথাও বেরিয়েছে। নামাজের সময় হলে দেখতে পাই, হাজবেন্ড মসজিদে যাচ্ছে আর স্ত্রী গাড়িতে কিংবা মসজিদের সামনে বসে আছে। কারণ, মসজিদে নারীদের অজু করার স্থান, ওয়াশরুম এবং নামাজ আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে তাদের নামাজ কাজা হচ্ছে; যা বাসায় ফিরে আদায় করতে হচ্ছে। তাই প্রতিটি মসজিদে নারীদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত; যেখানে তাদের জন্য থাকবে আলাদা প্রবেশপথ, ওয়াশরুম। অর্থাৎ পুরুষদের সাথে কোনো প্রকার কানেকশন থাকবে না।

কমিউনিটি সেন্টার

মসজিদ এরিয়ায় থাকবে একটি কমিউনিটি সেন্টার। যেখানে ওই সমাজের সকল বিবাহ, আকিকা ও দাওয়াতের আয়োজন হবে। আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে কী হয়? আমরা দেখি, মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দি গানের তালে আমাদের তরুণ-তরুণীরা নাচানাচি করে। যদি কোনো মসজিদ এলাকায় এমন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অন্তত ফ্রি মিক্সিংয়ের এমন পাপ থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়া যাবে।

কনফারেন্স রুম

সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ, মীমাংসা, শালিশ ও বৈঠক করার জন্য মসজিদ এরিয়ায় একটি কনফারেন্স রুম থাকবে। এটি সমাজের একটি সংসদ হিসেবে কাজ করবে।

কর্জে হাসানা ফান্ড

সুদের কালো থাবা থেকে রক্ষার জন্য প্রতিটি সমাজ ও সার্কেলে কর্জে হাসানা ফান্ড গঠন আবশ্যক। প্রয়োজন সাধারণত নসিহা মানে না। অনেক মানুষ বাধ্য হয়েই সুদের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। মাত্র দুই-তিন হাজার টাকা ঋণের জন্য তারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে—যা চক্রাকারে বেড়ে ত্রিশ হাজার, চল্লিশ হাজার টাকায় গিয়ে ঠেকে। অথচ এই দুই-চার হাজার টাকা যদি তারা বিনা সুদে ঋণ হিসেবে পেত, তাহলে তাদের সুদের জালে পা ফেলতে হতো না। সুদকে প্রতিহত করার জন্য সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে কর্জে হাসানা ফান্ড গঠন করতে হবে—যেখান থেকে মানুষকে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হবে।

প্রতিটি মসজিদের অধীনে যদি একটি করে কর্জে হাসানা ফান্ড গঠন করা যায়, তাহলে ক্ষুদ্র ঋণের নামে সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো যেসব সুদভিত্তিক এনজিও ছড়িয়ে পড়েছে, তারা আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

শুধু ঢাকা শহরেই প্রায় ৬০০০টি মসজিদ রয়েছে। প্রতিটি মসজিদে যদি এক লাখ করে টাকার কর্জে হাসানা ফান্ড গঠন করে, তাহলে ৬০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন সম্ভব। এভাবে সারা বাংলাদেশে যত মসজিদ রয়েছে, সবগুলোয় যদি ফান্ড গঠন করা যায়, তাহলে কত শত কোটি টাকার ফান্ড গঠন সম্ভব—চিন্তা করতে পারেন? কর্জে হাসানা ফান্ডের টাকা যাতে ঋণ খেলাপি না হয়, সেজন্য মসজিদ ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিকিৎসাকেন্দ্র

সমাজের মানুষদের জরুরি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি ছোটো হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র থাকতে হবে—যেখান থেকে মানুষকে সাধারণ চিকিৎসা দেওয়া হবে।

ফ্রি বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা

প্রতিটি মসজিদে; বিশেষত শহর ও শহরতলির মসজিদগুলোতে মুসল্লি ও পথচারীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটা অনেক বড়ো একটি সেবা।

রমজানে একসাথে ইফতার করার আয়োজন

রমজান মাসে একসঙ্গে ইফতার করার মধ্যে এক অন্যরকম আনন্দ অনুভূত হয়। সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়াতে মসজিদকেন্দ্রিক ইফতারের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে একে অন্যকে আপ্যায়নের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হবে এবং সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় হবে। তা ছাড়া রোজাদারদের ইফতার করানোতে অনেক সওয়াব নিহিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। ওই রোজাদারের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়ার সে লাভ করবে। তবে এতে রোজাদারের সওয়াব কম করা হবে না।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অনেকেরই রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—'পানি মিশ্রিত এক কাপ দুধ বা একটি খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যদি কেউ কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, তাতেও মহান আল্লাহ তাকে সেই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তিসহ আহার করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউজে কাওসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন—যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হবে না।"'
> (ইবনে খুজাইমাহ : ১৮৮৭)

দাওয়াহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য প্রতিটি মসজিদে একটি দাওয়াহ সেন্টার থাকতে হবে। সবাই সুযোগ-সুবিধামতো এই দাওয়াতি অভিযানে অংশগ্রহণ করবে।

বখে যাওয়া ও হতাশাগ্রস্ত তরুণদের মোটিভেশনের জন্য একটি দক্ষ টিম থাকবে, যারা এদের প্রয়োজনীয় মোটিভেশন দেবে এবং সঠিক পথে আহ্বান করবে। সমাজের অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা এই দাওয়াহ কেন্দ্রের অন্যতম রুটিন ওয়ার্ক হবে।

মসজিদকেন্দ্রিক নানামুখী কার্যক্রম

প্রতিটি মসজিদেই সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন—

- সাপ্তাহিক প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- মাসিক ধারাবাহিক তাফসির প্রোগ্রাম ও দারসুল হাদিস প্রোগ্রাম।
- মসজিদের উদ্যোগে যুবকদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম (খেলাধুলা, শিক্ষাসফর, লিডারশিপ ক্যাম্প, ইতিকাফ)।
- নারীদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
- শিশুদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
- জাকাত, কুরবানির গোশত বিতরণ, জরুরি ত্রাণ তহবিল, মেডিকেল ক্যাম্প, বিবাহ প্রকল্প, পথশিশু প্রকল্প, খাদ্য প্রকল্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি ।
- বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান (সিরাত প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, নাশিদ প্রতিযোগিতা, তিলাওয়াত, তাহফিজ, কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান; যেমনটা হাসান বিন সাবিত ﷺ-এর নেতৃত্ব মসজিদে নববিতে অনুষ্ঠিত হতো)।
- মসজিদের নিজস্ব প্রকাশনা থাকতে পারে, যেখান থেকে বিভিন্ন বুকলেট, ক্যালেন্ডার, ব্রুশিয়ার ছাপানো হবে।
- বাৎসরিক সম্মেলন বা তাফসির মাহফিল ইত্যাদি।

মসজিদ ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন ও ইমানের ইস্পাতকঠিন দুর্গ। এ দুর্গ একদিকে যেমন মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাতিঘর, তেমনি ইবাদত-বন্দেগির মিহরাব এবং তাওহিদের বাণী প্রচারের কেন্দ্র। মসজিদ হলো সেই বিদ্যালয়, যেখান থেকে গড়ে উঠেছিল এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম। মসজিদই ছিল সেকালে জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিমরা সোনালি সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে। চৌদ্দশত বছরের দীর্ঘ স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসে চোখ বোলালেই দেখা যায়, মুসলিম সভ্যতার সেরা স্থাপত্যগুলো নির্মিত হয়েছিল মসজিদকে ঘিরেই। মসজিদেই ছিল আলিম, বিদ্বান, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সেনাপতি, বিচারক, আইনজীবীসহ রাষ্ট্রনায়ক তৈরির কারখানা। মসজিদই ছিল সেরা বিদ্যাপীঠ।

এখান থেকেই নির্মিত হতো যোগ্য নাগরিক। মসজিদ ছিল মুসলিম চেতনার বাতিঘর। মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের কাবা খ্যাত মিশরের জামে আল আজহার, মরক্কোর জামে আল কারাওয়িনও গড়ে উঠেছিল মসজিদকে কেন্দ্র করে।

মসজিদকেন্দ্রিক যে চেতনা, তা থেকে সুকৌশলে আমাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা আমরা নিজেরাই মসজিদ থকে দূরে সরে গেছি। এজন্য আমাদের মগজগুলো হয়েছে শয়তানের আড্ডাখানা। আমরা হারিয়েছি আমাদের স্বর্ণালি অতীত, যশ, খ্যাতি, মান-সম্মান; এমনকী স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচার অধিকারও! বিনিময়ে বরণ করেছি অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দীনতা-হীনতা, হিংসা, বিভেদ, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল। যদি এই পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দুমড়ে-মুচড়ে আবার সেই আলোকিত সমাজের স্বপ্ন দেখতে চাই, তাহলে মসজিদকেই আমাদের কেন্দ্র বানাতে হবে, সেখানেই ফিরে যেতে হবে। কারণ, সেখানে রয়েছে রহমত, বরকত ও ঐক্যের যাবতীয় উপাদান। আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে মসজিদকেই বানাতে হবে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন। মসজিদ হোক মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস বা সেন্টার পয়েন্ট।

ঐশী বরকতের চাবি

জান্নাতে যেতে কে না চায়?

আমরা দুনিয়ার জীবনে যা-ই করি না কেন, জান্নাত-জাহান্নামের প্রশ্নে সবাই একমত; কেউই জাহান্নামে যেতে চাই না। আল্লাহ তায়ালাও চান না আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হই; বরং তিনি চান, প্রত্যেকেই জান্নাতের অধিবাসী হোক। তাই তিনি জান্নাতের পথকে সহজ করেছেন এবং যেসব বিষয় জান্নাতের অন্তরায়, সেগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

জান্নাতে যাওয়ার প্রধান অন্তরায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—হারাম রিজিক বা অবৈধ উপার্জন। অবৈধ উপার্জন দিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করলে তা জান্নাতের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ বিশ্বনবি থেকে বর্ণনা করেন—

> 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বায়হাকি : ৫৫২০)

হালাল পৌঁছে দেয় জান্নাতে আর হারাম জাহান্নামে। হারামের সাথে জান্নাতের কোনো সম্পর্ক নেই। জান্নাতের সম্পর্ক কেবল হালালের সাথে। সুতরাং পরকালীন শান্তি পেতে হলে দুনিয়ায় আমাদের হালালের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে।

অথচ আমরা কতই না বোকা! দুনিয়ার অনিশ্চিত জীবনের কথিত সুখের জন্য অবলীলায় জান্নাতের সীমাহীন সুখকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি, আর হারাম উপার্জন দিয়ে চিরতরে বন্ধ করে দিচ্ছি জান্নাতের প্রশস্ত পথ! আমরা যদি সত্যিই সুখ পেতে চাই, তাহলে হালাল-হারামের প্রশ্নে থাকতে হবে আপসহীন। প্রতিজ্ঞা করতে হবে—প্রয়োজনে অভুক্ত থাকব, কিন্তু কিছুতেই হারাম ভক্ষণ করব না। এই সংকল্পই আমাদের সামনে জান্নাতের পথকে সুগম করে দেবে। অন্যদিকে, ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় একটি ভুল সিদ্ধান্তই আমাদের জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করতে পারে।

অনেকেই ভাবেন, অবৈধ উপার্জন ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করা যায় না, প্রয়োজনীয় রিজিকের ব্যবস্থা করা যায় না; অথচ হারাম উপার্জনই বরং জীবনের ছন্দ নষ্ট করে, বিভিন্ন বালা-মুসিবতে জীবন বিষিয়ে তোলে। আমরা যদি হারাম ত্যাগ করার সৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পরিশ্রম চালিয়ে যাই, তাহলে তিনি আমাদের বিশুদ্ধ নিয়্যাত ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা দেখে রিজিক ঢেলে দেবেন; ঠিক পাখির মতো করে। পাখি সকালে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শূন্য পেট নিয়ে রিজিক অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, আর সন্ধ্যায় ফেরে ভরা পেট নিয়ে।

একটু চিন্তা করুন তো, পাখির এই রিজিকের ব্যবস্থা কে করে? নিশ্চয় আল্লাহ। পাখি শুধু আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে পরিশ্রমে নেমে পড়ে, বাকি কাজটা আল্লাহ নিজ বরকতেই করে দেন। আমরাও যদি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে পরিশ্রম চালিয়ে যেতে পারি, তবে আল্লাহ আমাদেরও উত্তম রিজিক দান করবেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

'এবং তাকে এমন স্থান থেকে তিনি রিজিক দান করবেন, যা সে ধারণাও করে না। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তার কাজ পূরণ করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।' (সূরা তালাক : ০৩)

হালাল উপার্জন পরিমাণে অল্প হলেও আল্লাহ তাতে বারাকাহ দান করেন। আর হারাম উপার্জন দেখতে বেশি মনে হলেও দিনশেষে তা শুধু ক্ষতিই বয়ে আনে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে।

ধরুন, এক লোক অবৈধ পথে মাসে এক লাখ টাকা উপার্জন করে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্রতিমাসে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতেই তার চলে যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। স্ত্রীর ক্যানসারের চিকিৎসা, ছেলের ইয়াবা খরচ, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি হিসাব চুকিয়ে মাস শেষে দেখা যায়, তার উলটো হাজার বিশেক টাকা ঋণ!

আরেকজন রিকশাওয়ালা; হালাল পথে যার মাসিক উপার্জন পনেরো হাজার টাকা। খরচ বলতে তার বাড়ি ভাড়া দুই হাজার টাকা, ছেলেমেয়ের পড়ালেখা বাবদ এক হাজার, খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে দশ হাজার এবং চিকিৎসা বাবদ এক হাজার। মাস শেষে দেখা যায়, তার কাছে আরও এক হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে!

প্রথমজন এক লাখ টাকা উপার্জন করেও মাস শেষে বিশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা বহন করছে, আর দ্বিতীয়জন পনেরো হাজার টাকা উপার্জন করেই মাস শেষে এক হাজার টাকা সঞ্চয় করছে। এই পার্থক্যের বড়ো কারণ হলো হালাল উপার্জন। হালালে বারাকাহ আছে, যেটা হারামে নেই।

এ তো গেল টাকার হিসাবের কথা। যদি সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তির দিক থেকে তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে আকাশ-পাতাল ফারাক! হারাম উপার্জনকারীদের পরিবারে না থাকে সুখ, না থাকে মানসিক প্রশান্তি। থাকে না রাতের আরামদায়ক ঘুম! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের পরিবারে কেউ না কেউ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। ছেলে হয়তো মাদকাসক্ত, মেয়ে বেয়ারা, স্ত্রী পরকীয়ায় মত্ত, নিজের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। এই ধরনের নানান সুখবিনাশী সমস্যায় জর্জরিত থাকে তাদের সংসার! সুখপাখি যেন তাদের আশপাশ দিয়েও চলে না।

অন্যদিকে হালাল উপার্জনকারী রিকশাওয়ালার বাড়িতে সম্পদের প্রাচুর্য চোখে না পড়লেও সেখানে দেখা মেলে স্বর্গীয় সুখের উজ্জ্বল সোনালি আভা। দিনশেষে বাড়িতে ফিরতেই বউ তাকে সোহাগ ভরে গামছা এগিয়ে দেয়। ভাত বেড়ে প্রস্তুত করে দেয়। পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে, সংসারের হাল-হাকিকত বোঝে এবং অল্পতে তুষ্ট থাকে। হালাল উপার্জনকারীদের মধ্যে থাকে না তেমন কোনো কঠিন রোগ-বালাই। সাধারণত থাকে না ডায়াবেটিস-উচ্চ রক্তচাপের মতো রিজিকপ্রতিবন্ধক রোগও। তারা সকাল হলে কাজে বেরিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করে। এভাবে প্রশান্তির ঘুম আর বর্ণিল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পদার্পণ করে একটি নতুন ভোরে। এমন সুখ হারাম উপার্জনকারীরা কল্পনাও করতে পারে না। এটাই বরকতপূর্ণ ও বরকতহীন উপার্জনের মূল পার্থক্য।

আর যারা হারাম খায়, তাদের চিন্তা-চেতনা হয় বিকারগ্রস্ত। তারা ইতিবাচকভাবে কিছু ভাবতে পারে না বা বলতে পারে না। যে মুখে হারাম খাবার লেগে আছে, সেখান থেকে ভালো কিছু কীভাবে আশা করা যায়? তা ছাড়া অধিকাংশ হারাম উপার্জনকারীর সন্তানরাও মানুষের মতো মানুষ হয় না। কারণ, হারাম উপার্জনের জন্য কাউকে না কাউকে তার ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়, যা একটি সুস্পষ্ট জুলুম। আর মজলুমের কান্না অভিশাপ হয়ে হারাম ভক্ষণকারী এবং তার পরিবারের লোকদের প্রতি অবিরত বর্ষিত হতে থাকে।

হারামের মধ্যে সত্যিই কোনো আরাম নেই, নেই কোনো সুখ; আছে শুধু মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা। তাই সত্যিকারার্থেই সুখী হতে চাইলে আমাদের হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে। পরিমাণে অল্প হলেও হালালে তুষ্ট থাকতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। যা হালাল, তা-ই গ্রহণ করো এবং যা হারাম, তা বর্জন করো।' (ইবনে মাজাহ : ২১৪৪)

রিজিক কী

রিজিক আরবি শব্দ, এর অর্থ জীবনযাপনের উপায়-উপকরণ। রিজিক বলতে শুধু খাবারকেই বোঝায় না; বরং মানুষের যাবতীয় চাহিদাকে বোঝায়। মানুষ যা খায়, যা পরে, যা ভোগ-উপভোগ করে—সবই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। তাই হারাম উপার্জন দিয়ে যা কিছুই ভোগ করা হোক না কেন, সবই হারাম রিজিক বলে বিবেচিত হবে।

রিজিকের প্রধান অনুষঙ্গ হলো খাদ্য। এই খাদ্য প্রধানত দুভাবে হারাম হতে পারে—

১. আল্লাহর ঘোষণার মাধ্যমে। যেমন : মদ, শূকরের গোশত, রক্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জাবাইকৃত পশুর গোশত ইত্যাদি।

২. খাদ্য নিজে হালাল, কিন্তু হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয় করার মাধ্যমে। যেমন : রুটি একটি হালাল খ্যাদ্য, কিন্তু তা হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয় করলে রুটিও হারাম হয়ে যায়।

এ ছাড়াও কিছু মূলনীতি রয়েছে—যেগুলোর ভিত্তিতে খাদ্যের হালাল-হারাম চিহ্নিত করা যায়। একটু সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ!

হালাল খাদ্য সব সময়ই পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত, রুচিশীল। এটাতে কোনো ভেজাল থাকে না। হালাল অল্প খেলেও তৃপ্তি আসে। কারণ, এর মধ্যে থাকে বরকত।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ-

> 'হে মানুষ সকল! পৃথিবীতে যত হালাল ও পবিত্র খাবার রয়েছে, তা খাও; কিন্তু শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা বাকারা : ১৬৮)

এই আয়াতে হালাল রিজিকের সাথে শয়তানের প্রসঙ্গ আনার কারণ হলো—শয়তান মানুষের সামনে হারাম জিনিসকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে। বোঝাতে চায়—হারামেই আরাম। তাই মানুষ শয়তানের ফাঁদে পড়ে হারাম পথে পা বাড়ায় এবং ধীরে ধীরে পাপসাম্রাজ্যের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে।

অনেকেই হারাম উপার্জন দিয়ে হালাল খাবার খোঁজেন। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। এটা নিজের সাথে একধরনের প্রতারণাও বটে। হোটেলে মুরগি খান না মৃত মুরগি বিক্রির সম্ভাবনা আছে বলে। গরু খান না কুকুরের গোশত গরুর নামে চালিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা আছে বলে। অথচ অবলীলায় সুদ খাচ্ছেন, ঘুস খাচ্ছেন—সে ব্যাপারে কোনো খেয়ালই করেন না। যে কাপড় পরে আছেন, যে গাড়িতে চড়ে এসেছেন, এমনকী যে টাকা নিয়ে খেতে এসেছেন—সেটাও অন্যের হক মারার টাকা! এগুলো যে আরও ভয়ানক হারাম, তা যেন মনেই আসে না। অনেকে তো হারামের টাকা দিয়ে হজ-উমরাহ করে এসে বিশাল হাজি সাহেব বনে যান! অথচ তারা জানেন না, উপার্জন হালাল না হলে কোনো দুআ আর ইবাদতই কবুল হয় না।

বিশ্বনবি এক লোকের উদাহরণ দিয়ে বলেন—

> 'এক লোক সফরে বের হয়। দীর্ঘ পথ। একসময় তার শরীরে ক্লান্তি এসে ভর করে। চুল এলোমেলো হয়ে পড়ে। সারা শরীর ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। ধূলির আস্তরে ঢাকা পড়ে তার পোশাক।

একসময় সে আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ শুরু করে—"হে আমার রব! হে আমার রব!" অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, যে পোশাক পরে আছে সেটাও হারাম। হারাম দিয়েই সে লালিত-পালিত হয়েছে। এ অবস্থায় তার দুআ কবুল হবে কী করে?' (সহিহ মুসলিম : ১০১৫)

অনেকেই ভাবেন, হালাল রিজিক দিয়ে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন। কারণ, হালাল জিনিস খুবই অপ্রতুল। এই ধারণা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফল। প্রকৃত অর্থে আল্লাহর দুনিয়ায় অল্প কিছু ক্ষতিকারক জিনিস বাদ দিয়ে সবকিছুই হালাল। আমরা যদি এই স্বল্পসংখ্যক হারাম থেকে বেঁচে চলতে পারি, তাহলে অবলীলায় আমরা হালাল রিজিক দিয়ে জীবন সাজাতে পারব।

রাসূল ﷺ দুআ করতেন—

'হে আল্লাহ! হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করুন, হারাম থেকে দূরে রাখুন। আপনার অনুগ্রহে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' (জামে আত-তিরমিজি : ১৪৮৬)

হালাল-হারামের মূলনীতি

সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের নিশ্চয়তা, পার্থিব জীবনে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি বান্দার আনুগত্যের মান যাচাইয়ের সীমারেখাস্বরূপ হালাল-হারামের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। হালাল-হারামের কিছু মূলনীতি রয়েছে, যেগুলো জানলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারব—কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম। এই মূলনীতিগুলো আমি খুব সহজ করে উপস্থাপনের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

মৌলিকভাবে সবকিছুই হালাল

মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধতার সুতোয় বাঁধা। পৃথিবীতে সবকিছুই মৌলিকভাবে হালাল বা বৈধ। কোনো কিছুকে হালাল সাব্যস্ত করতে দলিল লাগে না, কিন্তু হারাম সাব্যস্ত করতে দলিল লাগে। আর সেটি হতে হয় অকাট্য দলিল। কিন্তু কোনো বিষয়ে যদি অকাট্য কোনো ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোনো দলিল থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে কোনো জিনিসের হারাম হওয়ার কথা সন্দেহাতীতভাবে জানা না যায়, তাহলে তার মৌল অবস্থা 'মুবাহ'

তথা বৈধ হিসেবে স্বীকৃত থাকবে; তাকে হারাম বলা যাবে না। সহজ কথায়—যার হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল নেই, তা-ই হালাল।

সুতরাং নির্দিষ্ট দলিল ব্যতীত কোনো জিনিসকে নিজ থেকে হারাম সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে কোনো জিনিসের হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে দলিল না পাওয়া গেলে তা আমাদের জন্য সুস্পষ্ট হালাল। আমরা কোনোভাবেই তাকে হারাম বলতে পারব না।

বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া অতি উৎসাহী হয়ে যারা কথায় কথায় শুধু হারাম হারাম বলে ফতোয়া দেয়, তাদের ভর্ৎসনা করে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'ধ্বংস তাদের, যারা আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছে, সেটাকে আগ বাড়িয়ে হারাম বলে অভিহিত করে।' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৬০৮)

মৌলিকভাবে আল্লাহ সৃষ্ট সব জিনিসই যে হালাল, তা কোনো মনগড়া কথা নয়। কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন—

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا-

'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে—সবকিছুই তোমাদের (ভোগ ও ব্যবহারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা বাকারা : ২৯)

হালাল অসীম আর হারাম সসীম

হালালের পরিধি ব্যাপক, হারামের পরিধি সীমিত (Halal is unlimited, but haram is limited)। হাতেগোনা অল্পকিছু জিনিস হারাম, বাকি সবকিছুই হালাল। হালালের গণ্ডিতে থেকেই জীবনের সব চাহিদা মেটানো সম্ভব। হারামের দিকে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ কুরআনের যত জায়গায় হালালের ঘোষণা দিয়েছেন, তত জায়গায় ব্যাপকার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا یُتْلٰی عَلَیْكُمْ-

'তোমাদের গৃহপালিত (সকল) পশু হালাল; কেবল সামনে যেগুলো জানানো হবে—সেগুলো ছাড়া।' (সূরা মায়েদা : ০১)

সাগরের ক্ষেত্রেও একই কথা—

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ-

'তোমাদের জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করবে, সেখানে তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়ে যেতেও পারো।'
(সূরা মায়েদা : ৯৬)

এই আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—হালাল ঘোষণার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যাপকার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখন তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন, তখন নাম ধরে ধরে নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ হালাল ঘোষণা করেছেন ব্যাপকভাবে আর হারাম ঘোষণা করেছেন নির্দিষ্ট করে। যেমন : তিনি বলেছেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ-

'মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম, রক্ত খাওয়া হারাম, শূকর খাওয়া হারাম, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে জবেহ দেওয়া হয়েছে—এমন প্রাণী খাওয়া হারাম, শিংয়ের গুঁতোয় মৃত্যুবরণ করা প্রাণী খাওয়া হারাম...।' (সূরা মায়েদা : ০৩)

এ রকম নাম ধরে ধরে অল্প কয়েকটা জিনিস হারাম করা হয়েছে, বাদবাকি সবকিছু হালাল।

এই হালাল-হারামের ব্যাপারটা যদি বিবাহের ক্ষেত্রে দেখি, তাহলে দেখা যাবে—একজন মুসলিমের জন্য যেকোনো দেশের যেকোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করা হালাল। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়—কাকে কাকে বিয়ে করা হারাম? সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা গুনে গুনে চৌদ্দজনের নাম বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধ-মা, দুধ-বোন, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগম হয়েছে তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে—যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে; তবে যদি তাদের সাথে সংগম না হয়ে থাকে,

তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা আগে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা নিসা : ২৩)

যেকোনো হারামের ঘোষণা যে নির্দিষ্ট করে (Specifically) দেওয়া হয়েছে, নিচের আয়াতটি তার বড়ো প্রমাণ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ—এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানি কার্যকালাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায়—তোমরা সফলতা লাভ করবে।' (সূরা মায়েদা : ৯০)

সাধারণত তিনটি কারণে ইসলাম কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করে

ক. অপবিত্রতা : যেমন : পেশাব-পায়খানা, গরুর গোবর-মূত্র—এগুলো অপবিত্র।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ-

'আর তিনি তাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল এবং নাপাক জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

খ. অশ্লীলতা : যেমন : অশ্লীল গান, নাটক, সিনেমা, পর্নোগ্রাফি দেখা হারাম। কারণ, এগুলো সামাজিক জীবনে মানুষকে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ-

'হে নবি! তাদের বলে দাও—আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন, সেগুলো হচ্ছে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।' (সূরা আ'রাফ : ৩৩)

গ. ক্ষতিকারক : যেমন : ইয়াবা সেবন, মদ খাওয়া, সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔

'নিজের হাতে নিজেকে ক্ষতির মুখে নিক্ষেপ করো না; অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো। কেননা, আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা বাকারা : ১৯৫)

রাসূল ﷺ বলেন—

'ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া—উভয়টিই পরিত্যাজ্য।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩৪১)

পৃথিবীতে যত জিনিস হারাম ঘোষিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে এই তিনটি কারণের অন্তত একটি কারণ রয়েছে।

হারামের পথে ধাবিত করে—এমন জিনিসও হারাম

হত্যা করা হারাম, আর পরামর্শ করা হালাল। কিন্তু যদি এই পরামর্শ করা হয় কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, তাহলে এই পরামর্শ করাও হারাম। কারণ, এই পরামর্শই ব্যক্তিকে হারামের পথে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। একইভাবে মুচকি হাসি দেওয়া সুন্নত; কিন্তু এই মুচকি হাসি যদি হয় কোনো বেগানা নারী বা পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্য, তাহলে মুচকি হাসি দেওয়াও হারাম। কারণ, এই মুচকি হাসিই তাকে আস্তে আস্তে হারামের দিকে ধাবিত করে।

কোনো রমণী যদি বেগানা পুরুষকে দেখে মুচকি হাসি বিনিময় করে, তাহলে পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়; শুরু হয় নতুন পাপের যাত্রা। তারপর ফেসবুক আইডি পরিদর্শন, একটু-আধটু 'হায়-হ্যালো' কুশল বিনিময়—'কেমন আছ, কী করছ?' খোঁজখবর গ্রহণ। এভাবেই আস্তে আস্তে সাবলীল হয় স্বাভাবিক কথাবার্তা। কয়েক দিনের মধ্যেই টেক্সট চ্যাটিং থেকে প্রমোশন হয় অডিও চ্যাটিং-এ, তারপর ভিডিও চ্যাটিং। এর পরের ধাপ সশরীরে সাক্ষাৎ; অতঃপর ব্যভিচার কিংবা ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ সংঘটন!

এভাবেই ধাপে ধাপে প্রস্তুত হয় একটি হারাম কাজের প্লট। মানুষ সরাসরি হারামে খুব একটা জড়ায় না। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত হারামের দিকে ধাবিত হয়। যিনার প্রথম ধাপ শুরু হয় চোখের যিনা দিয়ে, তারপর হাতের যিনা, মুখের যিনা, পায়ের যিনার পর্যায় পার হয়ে শেষ হয় চূড়ান্ত যিনা দিয়ে।

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'আদম সন্তানের জন্য তাকদিরে যিনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, ততটুকু অংশ সে অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের যিনা অশ্লীল আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যিনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশে) স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হলো (অবৈধভাবে বেগানা পুরুষ/নারীকে) চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর অবশেষে লজ্জাস্থান এসবকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।' (সহিহ বুখারি : ৬২৪৩)

ব্যভিচার ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধগুলো যেহেতু শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত বা লাগামহীন দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে, তাই এর উৎসকেই ইসলাম সমূলে কেটে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ-

> 'হে নবি! আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজের চক্ষুকে অবনত রাখে।' (সূরা নুর : ৩০)

পরের আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ-

> 'হে নবি! আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজের চক্ষুকে অবনত রাখে।' (সূরা নুর : ৩১)

কিন্তু, তারপরও যদি চোখ পড়ে যায়?

প্রিয়নবি আলি ﷺ-কে বলেন—

> 'প্রথমবার চোখ পড়লে চোখ সরিয়ে নিয়ো। আল্লাহ প্রথমবারের জন্য ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমা করবেন না।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৭০১)

এভাবে যে সমস্ত কাজ হারামের দিকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তা হারাম। যে সমস্ত খাবার বা পানীয় আস্তে আস্তে নেশা তৈরি করে এবং হারাম খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলে, তা খাওয়াও হারাম। যে সমস্ত সঙ্গ বা বন্ধুত্ব অপরাধজগৎকে পরিচয় করিয়ে দেয়, সে সমস্ত সঙ্গ বা বন্ধুত্বও হারাম।

হারাম খাওয়ার জন্য কৌশল করাও হারাম

হারামকে হালাল বানিয়ে খাওয়াও হারাম। ঘুসকে যদি 'বখশিস', 'চা-নাশতার খরচ' কিংবা 'উপহার' নাম দিয়ে খান, তবুও ঘুস হারামই থাকবে; হালাল হয়ে যাবে না। যিনাকে 'রুমডেট', চোখের যিনাকে 'ক্রাশ', মদকে 'ড্রিংকস' নাম দিলেও কোনোভাবেই তা হালাল হয়ে যাবে না।

সরকারি কর্মকর্তারা জনগণের টাকায় বেতন-ভাতা গ্রহণ করে, তাদের কাজের জন্য জনগণ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া অন্যায়। অনেকে এটাকে হাদিয়া, বখশিশ বা স্পিড-মানি নামকরণ করে থাকেন। প্রশাসনের লোকজন এ রকম হাদিয়া কবুল করলে তা ঘুস বলে গণ্য হবে। হাদিয়া ট্যাগ লাগালেই কোনো জিনিস হাদিয়া হয়ে যায় না। নিচের হাদিসটি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ—

> 'বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ জাকাতের সম্পদ উত্তোলনের কাজে নিয়োগ দেন। কাজ থেকে ফেরার পর সে বলল—"এ হচ্ছে জাকাতের সম্পদ, আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।" তখন নবিজি মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তণের পর বললেন, "আমার প্রেরিত কর্মচারীর কী হলো? সে বলে—এটা জাকাতের সম্পদ আর এটা সে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছে। সে জাকাত উত্তোলনের কাজে না গিয়ে তার বাপ-মা'র ঘরে বসে দেখতে পারে—তাঁকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের কেউ খেয়ানত করলে তা নিজের কাঁধে নিয়েই কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। উট, গরু, বা ছাগল যা-ই হোক, সেগুলো আওয়াজ করতে থাকবে।" এরপর প্রিয়নবি উভয় হাত উত্তোলন করে দুবার বললেন—"হে আল্লাহ! আমি পৌঁছে দিয়েছি।" হাত উত্তলনের কারণে রাসূল ﷺ-এর বগলের শুভ্রতা আমরা দেখতে পেলাম।' (সহিহ বুখারি : ৮৮৩)

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'আমার উম্মতের লোকজন মদ পান করবে, কিন্তু তারা একে ভিন্ন নামে ডাকবে।' (সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৮৮)

দাউদ ﷺ-এর সময়ে বনি ইসরাইলের একটি জনপদ সমুদ্র উপকূলে বসবাস করত। তাদের প্রধান পেশা ছিল সাগরে মাছ শিকার করা। পুরো সপ্তাহজুড়ে তারা মাছ শিকার করত। আর শনিবার ছিল তাদের ইবাদতের দিন। সেদিন দাউদ ﷺ তাঁর ওপর নাজিল হওয়া আসমানি কিতাব জাবুর তিলাওয়াত করতেন। অনেক পশু-পাখি তাঁর সুললিত কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে জাবুর পাঠ শুনতে আসত। তাই শনিবার দিন সমুদ্রতীরে অনেক বেশি মাছ জড়ো হতো। যেহেতু একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে এসব প্রাণী একত্রিত হতো, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে দাউদ ﷺ শনিবার দিন মাছ শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম প্রথম তারা আল্লাহর হুকুম এবং দাউদ ﷺ-এর ফরমান মান্য করে চলল।

কিন্তু কিছুদিন পর দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোক ফন্দি বের করল। তারা শনিবারে তীরবর্তী হওয়া মাছগুলোকে আটকে রাখত। আর রোববারে গিয়ে সেগুলো ধরে নিয়ে আসত। তারা এত বেশি মাছ বাড়িতে নিয়ে আসত যে, অন্যরা দেখে অবাক হয়ে যেত। লোকজন তাদের জিজ্ঞেস করলে বলত—'আমরা তো শনিবার নয়, রোববারে মাছ শিকার করেছি।' অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাদের এই কৌশল জানাজানি হয়ে গেল এবং আরও কিছু লোক এই কৌশলে মাছ ধরা শুরু করল। কেউ কেউ সাগরতীরে গর্ত খনন করে ঝোপঝাড় দিয়ে জাল পাততে লাগল। শনিবার মাছগুলো গর্তের ভেতর জমা হলে তারা সেটার মুখ বন্ধ করে দিত আর রোববার মাছগুলো ধরে নিয়ে আসত। আদেশ না মেনে কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তিস্বরূপ অভিশপ্ত বানরে রূপান্তর করে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ-

'নিজেদের জাতির সেই সব লোকের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে—যারা শনিবারের বিধান ভেঙেছিল। আমরা তাদের বলে দিলাম, বানর হয়ে যাও এবং এমনভাবে অবস্থান করো—যাতে তোমাদের সবদিক থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়। এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।' (সূরা বাকারা : ৬৫-৬৬)

জাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকেই স্ত্রীর ও ছেলেমেয়েদের নামে সম্পদ কিনে বলেন—'এগুলো তো আমার নামে না, তাহলে আমি কেন এর জাকাত দেবো?' এই কৌশল অবলম্বনের কারণে দেখা যায়, পরিবারের কারোরই নিসাব পূর্ণ হয়নি। তাই আর কাউকে জাকাত দেওয়া লাগে না। মনে রাখা দরকার, সকল কৌশলীর বড়ো কৌশলী হলেন আল্লাহ তায়ালা। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া কখনোই সম্ভব না। তাঁকে ধোঁকা দিতে চাওয়া মানে নিজেই ধোঁকায় পড়া।

শুধু হালাল ট্যাগ লাগালেই হারাম কখনো হালাল হয়ে যায় না। কোনো হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক রূপ বা আকৃতি পরিবর্তন করে দিলে এবং তার মূল অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটে থাকলে, সে জিনিসটি হালাল হয়ে যায় না; এটা হারামকে এড়ানোর জন্য একটি অপকৌশল মাত্র। হারামকে কৌশল করে হালাল বানানোর চেষ্টা করাও হারাম।

সংশয়পূর্ণ জিনিস পরিত্যাজ্য

কোনো বস্তুর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে সে বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, সন্দেহ মানুষকে হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহ থেকে বেশি পরিমাণে বেঁচে থাকতে পারবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, তার সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহসমূহ আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা। যে পশু সংরক্ষিত এলাকার চারপাশে চরতে থাকে, সেটি যেকোনো সময় ওই সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে।' (সহিহ বুখারি : ২০৫১)

হারাম কাজে সহায়তাকারীও সমানভাবে দোষী

অনেকেই নিজে সরাসরি হারাম কারবার করে না, কিন্তু অন্যের হারাম কারবারে সহযোগিতা করে। যেমন—নিজে সুদের কারবার করে না, কিন্তু সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। নিজে ঘুস খায় না, কিন্তু অন্যের ঘুসের লেনদেনে মধ্যস্থতা করে। নিজে হারাম রিলেশনে জড়ায় না, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীর হারাম রিলেশনে সহযোগিতা করে।

হারামের ব্যাপারে ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হলো—যে ব্যক্তি হারাম পন্থা অবলম্বন করে এবং যে এতে সহযোগিতা করে, উভয়ই সমানভাবে দোষী। যেমন : যে ঘুস খায় এবং যে প্রদান করে—উভয়ই সমান অপরাধী।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'ঘুস দাতা ও ঘুস গ্রহীতা উভয়কেই নবিজি অভিসম্পাত করেছেন।'
> (সুনানে আবু দাউদ : ৩৫৮০)

> 'ঘুস দাতা ও ঘুস গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামে যাবে।'
> (তাবারানি : ২/২৯৫)

একইভাবে যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদি কারবার লেখালিখি করে এবং যে সাক্ষী থাকে—সকলের ওপরই আল্লাহর রাসূল ﷺ লানত করেছেন।

জাবির ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ সুদ গ্রহীতা, দাতা ও সুদি কারবারের লেখক এবং সুদি লেনদেনের সাক্ষী—সবার ওপর লানত করেছেন।'
> (সহিহ মুসলিম : ৪১৩৮)

কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণার সাথে সাথেই তার বিকল্প দেওয়া হয়েছে

ইসলাম শুধু হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সাথে সাথে তার একটি উত্তম বিকল্পও দিয়েছে। যেমন—ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে সুদ খাওয়া হারাম; সাথে সাথেই এর বিপরীতে বলেছে, ব্যাবসা করা হালাল। আল্লাহ বলেন—

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا-

> 'আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'
> (সূরা বাকারা : ২৭৫)

পবিত্র কুরআনে বলা আছে—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا-

> 'তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও মন্দ পথ।'
> (সূরা ইসরা : ৩২)

তাহলে আমরা যৌন চাহিদা মেটাব কীভাবে? ইসলাম তখন যিনার বিকল্প হিসেবে বিবাহের মতো সুন্দর ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً-

'অতঃপর নারীদের মধ্য হতে যাদের তোমরা পছন্দ করো, তাদের মধ্যে থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো। কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।' (সূরা নিসা : ০৩)

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

'বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ মেনে চলল না, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৪৬)

আল্লাহ মদকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সাথে সাথে এর বিকল্পও দিয়েছেন। যারা মদ খায় মনের বিষণ্নতা দূর করার জন্য, তাদের বিকল্প হলো—আল্লাহর ইবাদত, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের নামাজ। হৃদয়ের বিষণ্নতা দূর করার জন্য এগুলোর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই। আর যারা মদ পান করেন শরীরকে উষ্ণ রাখার জন্য; বিশেষত শীতপ্রধান দেশের মানুষজন, তাদের জন্য মদের বিকল্প হিসেবে মহান আল্লাহ দিয়েছেন মধুর মতো পবিত্র ও সুস্বাদু পানীয়—যা শরীরকে উষ্ণ রাখে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শিফা হিসেবে কাজ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ-

'তাতে (মধু) রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য।' (সূরা নাহল : ৬৯)

আল্লাহ অশ্লীল গান-বাজনা হারাম করেছেন। তাহলে আমাদের বিনোদনের মাধ্যম কী হবে? সেক্ষেত্রেও আল্লাহ বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন; দফকে হালাল করেছেন। সাহাবিদের বিবাহের সময় ছোটো ছোটো মেয়েরা দফ বাজিয়ে বদরের শহিদদের স্মরণ করতেন। (সহিহ বুখারি : ৪০০১)

সুবহানাল্লাহ! ইসলাম কত সুন্দরভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। একটিকে হারাম করেছে তো আরেকটি বিকল্প হাতে ধরিয়ে দিয়েছে—এরই নাম ইসলাম।

হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল মনে না করা

হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট। হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। কোনো মানুষ হালাল-হারামের নির্ধারক নন। এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করা আল্লাহর বিধান অস্বীকারের নামান্তর। যুক্তি বা বিতর্কের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা যায় না। তাই আল্লাহ তায়ালা যেটাকে হালাল ঘোষণা করেছেন, সেটাকে হারাম মনে করা এবং যেটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সেটাকে হালাল মনে করা কঠিন অপরাধ। এমন স্পর্ধা দেখানো যাবে না।

স্ত্রীদের সাথে মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে বিশ্বনবি একবার ঘোষণা দিলেন—'আজ থেকে আমি আর মধু খাব না এবং মধু খাওয়াকে আমার জন্য হারাম ঘোষণা করলাম।' সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে এই মূলনীতিটি শিক্ষা দিলেন যে, হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করা যাবে না। আল্লাহ বলেন—

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۚ وَ

اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'হে নবি! আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করছ কেন? (তা কি এজন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।' (সূরা তাহরিম : ০১)

আবদুল্লাহ ইবনে আবাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'আল্লাহ যেটাকে হালাল ঘোষণা করেছেন, তা হালাল। আর আল্লাহ যেটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, তা হারাম। আর যেটার ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন—সেটা অনুমোদিত অর্থাৎ সেটার ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না; বরং সেটা সংগত হিসেবে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (আবু দাউদ : ৩৮০০)

হালাল-হারাম সকলের জন্য সমান

ইসলামে হালাল-হারামের বিধান সবার জন্য এক রকম। কোনো জিনিস এক দেশের লোকদের জন্য হারাম আর অপর দেশের লোকদের জন্য হালাল কিংবা অনারবদের জন্য নিষিদ্ধ আর আরবদের জন্য অনুমোদিত, শ্বেতাঙ্গদের জন্য বৈধ আর কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য অবৈধ—ইসলামে এমনটা কল্পনাই করা যায় না। কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর লোকদের জন্য কোনো কিছু হালাল হবে আর অন্যদের জন্য তা নিষিদ্ধ হবে এমনটা নয়; বরং যেটা হালাল, সকলের জন্য তা হালাল আর যেটা হারাম, সকলের জন্য তা হারাম। নিয়ম সবার জন্য সমান। যেমন : মিথ্যা বলা যেমন সাধারণ লোকদের জন্য হারাম, তেমনি কাবার ইমামের জন্যও হারাম। হালাল বিনোদন সাধারণ লোকদের জন্য যেমন হালাল, তেমনি কাবার ইমামের জন্যও হালাল। নীতি আর আইনের চোখে সবাই সমান।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময়ে মক্কা বিজয় অভিযানকালে যে মহিলা চুরি করেছিল, তার ব্যাপারে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা বলল—"তার ব্যাপারে নবিজির কাছে কে সুপারিশ করবে?" তারা বলল—"বিশ্বনবির প্রিয়ভাজন উসামা বিন জায়েদ ছাড়া আর কার সে সাহস আছে?" মহিলাকে যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে হাজির করা হলো, তখন উসামা বিন জায়েদ মহিলার ব্যাপারে দয়ার নবির কাছে সুপারিশ করলেন। তাঁর কথা শুনে নবিজির চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন—"তুমি কি আল্লাহর হদ্দ (দণ্ডবিধি)-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছ?" তখন উসামা বললেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

যখন সন্ধ্যা হলো, তখন রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। প্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন—"আম্মা বা'দ (পর সমাচার) : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে উচ্চ বংশের কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ!

যদি (আমার মেয়ে) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করত, আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম।" এরপর ওই মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কাটা হলো।' (সহিহ বুখারি : ৬৭৮৮)

জরুরি প্রয়োজনে হারাম কখনো কখনো হালাল হয়ে যায়

হালালের বিধান রক্ষা করতে গেলে যদি প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে অথবা নিরুপায় হয় অথবা এমন বিশেষ কোনো প্রয়োজন, যেটাকে ইসলামি শারিয়াহ 'জরুরত' বলে অভিহিত করে—এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে হারাম গ্রহণ করলে পাপ নেই। তবে সেক্ষেত্রে ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে, যতটুকু না হলেই নয়। যেমন : খাবারের অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোনো লোক যদি জীবন বাঁচাতে শূকরের গোশত খায়, তখন সেটা অনুমোদনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়া যাবে, উদরপূর্তি করে খাওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়েই সে অবস্থায় সে অবাধ্য নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই (জীবন রক্ষার্থে খেতে পারে) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'
(সূরা বাকারা : ১৭৩)

উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ মাথায় রাখলে হালাল-হারামের পার্থক্য এবং সেই অনুযায়ী রিজিক অন্বেষণ করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

অনেকে মনে করে থাকেন, শুধু খাবারের ক্ষেত্রেই হালাল-হারাম প্রযোজ্য। মূলত ব্যাপারটি এমন নয়। মুমিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অঙ্গন এবং প্রতিটি কার্যক্রমই হালাল দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে এবং হারাম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। খাবার-পানীয় থেকে শুরু করে আয়-রোজগার, পেশা নির্বাচন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সম্পর্ক, বিনোদন—সবকিছুই হতে হবে হালালের গণ্ডি ও সীমারেখার মধ্যে থেকে। যেহেতু হালাল আনলিমিটেড, তাই পছন্দ অনুযায়ী হালাল নিয়ামত আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করতে পারি। হালাল বস্তু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। আবার হালাল বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা অপচয় করাটাও উচিত নয়।

হারাম মানুষের অন্তর-আত্মাকে নষ্ট করে বীভৎস আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে পরিণত করে নীতিবিবর্জিত এক এলিট পশুতে। হারাম উপার্জন মানুষকে এতটাই লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক করে ফেলে, স্বার্থের জন্য তারা সবকিছুকেই তুচ্ছ মনে করে। তারা দেশ ও জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, মানুষের ওপর জুলুম করে, মানুষকে ঠকায়, গরিবের হক মেরে খায়! তাই হারাম ভক্ষণকারীর শেষ পরিণতি হয় ভয়াবহ। অন্যদিকে হালাল হলো ঐশী বরকতের চাবি। পবিত্রতার প্রতীক! হালাল অন্বেষণকারীরা হয় নীতিবান, সম্মানী। তারা বেঁচে থাকে মানুষের ভালোবাসায়। সমাদৃত হয় সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে। আর পরকালে তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে সুশোভিত জান্নাত।

আসুন, আজ থেকে হারামকে 'না' বলি এবং হালাল দিয়ে জীবনের প্রতিটি অঙ্গন সাজিয়ে তুলি। আরশের অধিপতির বরকতের চাদরে আচ্ছাদিত হই। উপভোগ করি মনোদৈহিক প্রশান্তি।

বিদায় বেলা

এই যে আমরা হাঁটছি, চলছি, কথা বলছি, এই প্রক্রিয়া কি অন্তহীন? এর কি কোনো ইতি নেই? এর উত্তর সবারই জানা। আমাদের পূর্বপুরুষ, দাদা-পরদাদারা একসময় পৃথিবীতে বাস করেছেন, আমাদের মতোই হেসে-খেলে বেড়িয়েছেন; কিন্তু আজ তারা নেই। অনেকের নামও আমরা ভুলে গেছি। তাদের অনেকের কবরের হদিসও আজ পাওয়া যায় না।

আমরা ছোটোবেলায় যাদের তাগড়া যুবক দেখতাম, আজ তারা বার্ধক্যের কোলে ঢলে পড়েছে। যাদের বৃদ্ধ দেখতাম, তাদের অনেকেই আজ পরপারের অধিবাসী। এসব দেখতে দেখতে আমাদের চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চেহারায় পড়েছে বয়সের ছাপ। বড়ো হয়েছে ছোট্ট দেহটা। চুল-দাড়িও শুভ্র হয়েছে অনেকের! আমরাও যে সেই একই পথের অভিযাত্রী! দেখতে দেখতেই আমরা পার করে এসেছি জীবনযাত্রার অনেকখানি পথ। কেউ এখন যাত্রার মাঝপথে, কেউ-বা শেষ প্রান্তে। সবাই এগিয়ে চলছি সেই অনিবার্য গন্তব্যপানে!

মৃত্যু! একটি অনিবার্য বাস্তবতা। হঠাৎ এসে চমকে দিয়ে সব স্থবির করে দেয়। এ পৃথিবীর কাউকে আল্লাহ তায়ালা অমরত্ব দান করেননি। তাই প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। নশ্বর এ মহাবিশ্বে তিনি একাই কেবল অবিনশ্বর।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَّاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ-

'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।' (সূরা আম্বিয়া : ৩৫)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-

'মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে, সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার প্রতিপালকের সুমহান সত্তা; যিনি মহামহিম, মহানুভব। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?' (সূরা আর-রাহমান : ২৬-২৮)

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে—মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও কখন, কোথায় এবং কীভাবে আমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে, তা কিন্তু আমরা কেউই জানি না। এটা আমাদের কাছে একেবারেই অজানা, অনিশ্চিত ও রহস্যময়।

> The most certain matter in our life is death, but the most uncertain matter in our life is the time and the place of our death. Death is the biggest surprise.

আমাদের পার্থিব জীবন অনেকটা পরীক্ষা কেন্দ্রের মতো। নির্ধারিত সময় ধরে কেন্দ্রে অবস্থান করতে হয়। পুরো সময়জুড়ে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে হয়। এরপর সময় ফুরোলেই বেরিয়ে যেতে হয়। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। এটাই জীবনের অবধারিত পরিণতি!

কিন্তু এই জীবনই কি আমাদের শেষ জীবন?

অবশ্যই না। এই জীবনই আমাদের শেষ জীবন নয়। এর পরেই রয়েছে অনন্তকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগির ব্যাকুল হাতছানি। সেই জীবনের তুলনায় আমাদের পার্থিব জীবন অতি ক্ষুদ্র। মৃত্যু একটি বাহনস্বরূপ; যার মাধ্যমে

আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে অনন্তকালের জীবনে প্রবেশ করি। সেই জীবনে কোনো পরীক্ষা নেই; সেটা কেবলই ফলাফল ভোগ করার ক্ষেত্র। যদি দুনিয়ার জীবন সৎকর্মের মাধ্যমে কাটাতে পারি, তবে সেখানে ভোগ করব সীমাহীন আনন্দ। আর যদি দুনিয়ার জীবন কুকর্ম দিয়ে কলুষিত করে ফেলি, তবে পরকালে ভোগ করতে হবে নিদারুণ কঠিন শাস্তি।

তাই মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবনে সুখী হওয়ার জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, সৎকর্ম করতে হয়। ভুল হয়ে গেলে তওবা করে ফিরে আসতে হয়, তবেই সার্থক হয় আমাদের জীবন-পরীক্ষা।

মৃত্যু একবার দরজায় কড়া নাড়লে জীবনঘণ্টা বেজে যাবে। শেষ হয়ে যাবে আমাদের পরীক্ষার নির্ধারিত সময়। তখন আর থাকবে না কোনো সৎকর্ম করার সময়, থাকবে না ভুল শোধরানোর কোনো সুযোগ। তাই মৃত্যু আসার আগেই আমাদের পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

আল্লাহ বলেন—

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ-

> 'তোমরা কি ভেবেছ, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?'
> (সূরা মুমিনুন : ১১৫)

আল্লাহ তায়ালা এখানে 'আবাছা' শব্দ ব্যবহার করেছেন—যার অর্থ খেলাচ্ছলে বা খেলার জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন নিছক আমোদ-আহ্লাদের জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং তাঁর ইবাদত বা গোলামির জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এই গোলামির বদৌলতে আমরা নির্ধারিত পরিমাণ নম্বর পাব, যার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে আমাদের পরকালীন জীবনের ভাগ্য। যদি আমাদের 'খুলুসিয়াত' ও চেষ্টা হয় নিখাদ, তাহলে পরীক্ষায় কিছুটা কম নম্বর পেলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিচার দিনে নিজ গুণে তা বর্ধিত করে জান্নাতে পার করে দেবেন। আর যদি নিয়্যাত হয় ভেজালযুক্ত, তাহলে কর্মফল হবে ফাঁপা বেলুনের মতো অন্তসারশূন্য, মূল্যহীন!

যা কিছু করার দুনিয়ার জীবনেই করতে হবে। কারণ, পরকালীন জীবনের পুরো ভাগ্যই নির্ভর করে আমাদের দুনিয়াবি জীবনের ওপর। মৃত্যু যেহেতু অবধারিত এবং এর সময় অনিশ্চিত, তাই সর্বদাই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে!

একান্তে নীরবে বসে একটু ভাবুন তো! আজ থেকে ১০০ বছর পর ক্যালেন্ডারের পাতায় যখন ২১২১ সাল। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের দেহই মাটির নিচে। অস্তিত্ব তখন রুহের জগতে। নিজের ওই মুহূর্তটা একটু কল্পনা করুন তো। ইতোমধ্যে ফেলে যাওয়া আমাদের সুন্দর বাড়িটা হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করছে। পছন্দের কাপড়-চোপড়গুলো ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে, শখের গাড়িটি হয়তো অন্য কেউ চালাচ্ছে। আর আমায়? খুব কম মানুষই স্মরণে রেখেছে। কেউ হয়তো আমাকে নিয়ে আর ভাবেও না। ভাবার সময়ই বা কোথায়? সবাই যে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত! যাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে করতেই নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিলাম, তারা আজ আমাকে স্মরণ করারও সময়টুকু বের করতে পারছে না! এটাই পৃথিবী, এটাই এখানকার নিয়ম। বাস্তবতা হলো—এই জীবনটা আমাদের কল্পনার চেয়েও ছোটো।

কিন্তু বড়োই আফসোসের বিষয়, এই বাস্তবতার কথা জেনেও মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা যারপরনাই উদাসীন! যে দুনিয়ার ভিসার মেয়াদ অনিশ্চিত, সেই দুনিয়াকেই আপন করতে আমরা ব্যস্ত! সারাক্ষণ শুধু 'আমার আমার'-এ মত্ত! আমার টাকা, আমার সম্পদ, আমার বাড়ি-গাড়ি, আমার পছন্দ-অপছন্দ আরও কত কিছু। আমাদের চাহিদার অন্ত নেই। যার আছে যত বেশি, তার চাহিদাও তত বেশি। গাড়ি আছে বাড়ি চাই, বাড়ি আছে নারী চাই; এটা চাই, ওটা চাই; শুধু চাই আর চাই! যার সাইকেল আছে, সে মোটরসাইকেল চায়। যার মোটরসাইকেল আছে, সে প্রাইভেটকার চায়। যার প্রাইভেটকার আছে, সে আরও উন্নত ব্রান্ডের গাড়ি চায়। যার উন্নত ব্রান্ডের গাড়ি আছে, সে এই মানের একাধিক গাড়ি চায়! এভাবে চলতেই থাকে, কিন্তু চাহিদা মেটে না।

যদি একদম নিচ থেকে বলি, যার পা নেই এমন পঙ্গু লোক দুটো পা চায়। পা-হীন মানুষ হেঁটে যাওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে—'ইস! আমার যদি পা থাকত!' যারা হেঁটে চলে, তারা আফসোস করে বলে—'ইস! আমার যদি একটা সাইকেল থাকত!' সাইকেলওয়ালাদেরও আফসোসের শেষ নেই। তারা মোটরসাইকেলওয়ালাদের দেখে বলে—'ইস! আমার যদি মোটরসাইকেল থাকত!' মোটরসাইকেলের মালিক আফসোস করে প্রাইভেটকারের মালিককে দেখে বলে—'ইস! আমার যদি একটি প্রাইভেটকার থাকত!' ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চলতেই থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যু যখন এসে যায়, তখনই কেবল হুঁশ ফেরে, কিন্তু সময়ের দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের মধ্যে শুধুই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা; যার কোনো অন্ত নেই, নেই কোনো পূর্ণতার প্রশান্তি। মোটকথা, এই পার্থিব দুনিয়ার মোহ মানুষকে এতটাই ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, পরকালের কথা তারা মুহূর্তকালের জন্যও স্মরণ করে না। দুনিয়ার এই মোহ যে কতটা আত্মবিনাশী, তা বনি ইসরাইলের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়—

একবার তিন যুবক পথ চলতে চলতে দেখল, চারটা বড়ো বড়ো স্বর্ণের টুকরো পড়ে আছে। এগুলো দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ল সবাই! সিদ্ধান্ত হলো—প্রত্যেকেই সমানভাবে ভাগ করে নেবে; কিন্তু এতে মন ভরল না কারও। তাই প্রত্যেকেই ভাবনা শুরু করে দিলো—কী করে সবগুলো স্বর্ণ হাতিয়ে নেওয়া যায়।

কিছুক্ষণ পর একজনকে বলা হলো—'তুমি বাজার থেকে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসো।' তাদের কথামতো সে বাজারে গেল খাবার আনতে। এদিকে বাকি দুজন মিলে ফন্দি আঁটল—বদমাইশটা খাবার নিয়ে এলে তাকে মেরে ফেলতে হবে। তাহলে দুজনে দুটো করে স্বর্ণের টুকরো পাব। অন্যদিকে যে খাবার আনতে গেল, সে-ও ভাবল—খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিলে খেয়ে দুজন মারা যাবে, তাহলে আমি একাই চার-চারটা স্বর্ণের টুকরো পেয়ে যাব! এভাবেই লোভে অন্ধ হয়ে তারা নিজ নিজ সাথিকে হত্যার ফাঁদ পাতল।

বাজারে যাওয়া লোকটি যখন খাবার নিয়ে এলো, তখন বাকি দুজন মিলে অকস্মাৎ হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলল। পথের কাঁটা শেষ! এবার খানাপিনা সেরে বিশ্রাম নেওয়ার পালা! তারপর শান্ত মনে ভাগ-বাটোয়ারার কাজটা সেরে ফেলা যাবে। এই ভেবে তারা বাজার থেকে আনা খাবারগুলো গোগ্রাসে ভক্ষণ করতে থাকল। কিছুক্ষণ পর বিষ যখন তার আপন ধর্ম পালন শুরু করল, তখনই তারা বুঝল—খাবারে বিষ মেশানো ছিল। কিন্তু ততক্ষণে তাদের জীবনঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে! তারাও প্রথম বন্ধুর ভাগ্য বরণ করল।

বিজন ভূমির ওপর পড়ে থাকল তিনটি তাগড়া যুবকের লাশ, আর পাশে মালিকানাবিহীন চার টুকরো মহামূল্যবান স্বর্ণ। এই তো দুনিয়া! এই তো দুনিয়ার লোভের পরিণতি! এটাই প্রতিহিংসা আর চাহিদার প্রতি অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফল।

দুনিয়ার পরিবেশকে আল্লাহ এমনভাবে সাজিয়েছেন—যেখানে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কখনোই তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এখানে যার যত থাকবে,

সে ততই চাইবে। এজন্য বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যদি আদম সন্তানকে একটি স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তারপরও সে আরও একটি স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হতে চাইবে। কবরের মাটি ছাড়া তার অতৃপ্ত জিহ্বার চাহিদা কেউ পূরণ করতে পারবে না।' (সহিহ বুখারি : ৬৪৩৯)

আচ্ছা, আমাকে যদি একটি স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানানো হয়, তাহলে কি আমার চৌদ্দপুরুষ এটা ভোগ করে শেষ করতে পারবে? না, পারবে না। তাহলে কেন আমরা আরও চাইব? কারণ, দুনিয়ার জীবেনে সর্বদাই আমরা হারানোর ভয়ে অস্থির থাকি! যেখানে হারানোর ভয় থাকে, সেখানে তৃপ্তি কখনো সম্ভব নয়। আর দুনিয়ার অনিশ্চিত জীবনে কখনো হারানোর ভয়কে জয় করাও সম্ভব নয়। এই ভয়কে কেবল তখনই জয় করা সম্ভব হবে, যখন জীবন হবে চিরস্থায়ী এবং সম্পদ থাকবে অফুরন্ত। আর এটা জান্নাতের জীবন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। তাই আমাদের দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জান্নাতের মোহেই মত্ত হওয়া প্রয়োজন।

দুনিয়ায় সফলতার জন্য আমরা সর্বদাই পেরেশান থাকি। সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা করি, নানা কৌশল অবলম্বন করি। কামিয়াবি হাসিলের জন্য নিজের দক্ষতা-দুর্বলতা, সুযোগ-সুবিধা বিশ্লেষণ করি। স্বীয় প্রচেষ্টার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে নিজের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করি। কিন্তু সেই তুলনায় পরকালের সাফল্য অর্জনের জন্য ন্যূনতম তৎপরতা, কৌশল কি আমাদের আছে?

উত্তরটা হয়তো 'না' আসবে!

তাহলে কীভাবে আমরা সাফল্যমণ্ডিত হব, আর কী করেই-বা পার্থিব জীবনের মোহ কাটাব?

আমরা জানি, মৃত্যুর স্বাদ জীবনের সকল স্বাধ কেড়ে নেয়। নিয়মিত মৃত্যুর স্মরণ জীবনের মোহ দূর করে দেয়। তাই আমাদের অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত। নবিজি বলেছেন—

> 'তোমরা অত্যধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ-হন্তারক মৃত্যুকে স্মরণ করো।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৩০৭)

যার জন্ম হয়েছে, তার মৃত্যু হবে—এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। মৃত্যুর স্বাদ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাই মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত গ্রহণ করা উচিত! এ পৃথিবীতে আগমনের একটা সিরিয়াল থাকে, কিন্তু বিদায়ের কোনো সিরিয়াল থাকে না। দাদা-বাবা-ছেলে-নাতি—এটা হলো আসার সিরিয়াল। কিন্তু যাওয়ার বেলা কখনো কখনো দাদার আগে নাতি চলে যায়, বাবার আগে ছেলে চলে যায়, মায়ের আগে মেয়ে চলে যায়। বয়স্কদের আগে তরুণরা বিদায় নেয়। বিদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। যার যখন ডাক পড়ে, চলে যেতে হয় তাকে। কোনো এক্সকিউজ চলে না।

মানবজীবন কতগুলো অধ্যায়ের সংযোজন। মৃত্যুই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি নয়; বরং জীবনচক্রের এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে পদার্পণ মাত্র। দুনিয়ার জীবন চুকিয়ে আমরা যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব, তখন কবর হবে আমাদের প্রথম স্টেশন—যাকে বলা হয় 'বারজাখ'। কবরের এই 'স্টেশনে' পার পাওয়া গেলে পরবর্তী স্টেশন হাশরের ময়দানের হিসাবও সহজ হয়ে যাবে। আর কবরের স্টেশনে গন্ডগোল লেগে গেলে পরবর্তী ধাপগুলোর বিভীষিকা অনুমান করা সত্যিই কঠিন।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'কবর হলো জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।' (জামে আত-তিরমিজি : ২৪৬০)

এজন্য বিশ্বনবি সব সময় কবরের আজাব থেকে রেহাই পাওয়ার দুআ করতেন—

> اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-
>
> 'হে আল্লাহ! আমাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচাও।'
> (সহিহ মুসলিম : ১২১১)

আমরা বলেছিলাম, দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের মতো, কিন্তু এটি চূড়ান্ত পরীক্ষা নয়; বরং ক্লাসটেস্ট মাত্র, মূল পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। সেই অর্থে পুরো জীবন একটি পরীক্ষার প্রস্তুতিকাল। মূল পরীক্ষা শুরু হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কবর হলো সেই পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়। এখানেই শুরু হবে প্রাথমিক সওয়াল-জওয়াব। কাফিরদের করা হবে তিনটি প্রশ্ন আর মুমিনদের চারটি। রহমানুর রহিম আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছেন।

এতদ্সত্ত্বেও যদি আমরা ফেল করি, তাহলে এর দায় পুরোটাই আমাদের। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۭ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

'বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক সন্ধান করব; অথচ তিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে, তার লাভ-ক্ষতি অন্য কারও ওপর নয়; স্বয়ং তার ওপরই বর্তায় এবং কোনো ভার-বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না। পরিশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করতে, তিনি সে সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন।' (সূরা আনআম : ১৬৪)

বিশ্বাসীদের বিদায়

বারা ইবনে আজিব ﷺ-এর বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের রুহ কবজসংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিবরণ মুসনাদ আহমাদে উল্লেখিত হয়েছে। তার সারসংক্ষেপ—

কোনো মুমিন বান্দার যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতে পাড়ি জমানোর (মৃত্যুর) সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে সাদা চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা নিচে নেমে আসেন। তাঁদের চেহারা সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল। তাঁদের সঙ্গে থাকে বেহেশতের কাফন ও আতর। তাঁরা তার (মৃতব্যক্তির) চোখের সীমানায় এবং মৃত্যুর ফেরেশতা (মৃতব্যক্তির) মাথার কাছে বসেন।

তিনি (মৃত্যুর ফেরেশতা) যখন বলেন—'হে পবিত্র ও নেক আত্মা! তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আসো', তখন আত্মা বেরিয়ে আসে—যেভাবে কলসি থেকে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে।

তখন ফেরেশতারা আত্মাকে ধরবেন এবং তাকে বেহেশতের আতরযুক্ত কাফনে রাখবেন। সেই কাফন থেকে পৃথিবীর সর্বোত্তম মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে। তারপর তাঁরা তা (আত্মা) নিয়ে ওপরে যাবেন।

(আসমানে) তারা যখন কোনো ফেরেশতাদের দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন ফেরেশতারা বলবে—'এটি একটি উত্তম আত্মা।'

বহনকারী ফেরেশতারা বলবেন—'এটি অমুকের আত্মা।' অর্থাৎ তাঁরা তার নাম পরিচয় দেবেন। তাঁরা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত দরজা খুলে দিতে বলবেন। দরজা খুলে দেওয়া হবে। তারপর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাবেন। সপ্তম আসমান পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদেশ দেবেন—'আমার বান্দার দফতর ইল্লিয়্যিনে লিখে রাখো।' আর ইল্লিয়্যিন হচ্ছে সপ্তম আসমানে মুমিনের আত্মা সংরক্ষণের স্থান।

অবিশ্বাসীদের বিদায়

রাসূল ﷺ বলেন—যখন একজন কাফিরের দুনিয়া থেকে বিদায়ের এবং পরকালের পথে যাত্রার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আসমান থেকে কুৎসিত কিছু ফেরেশতা নেমে আসেন। তাঁরা তার সামনে বসেন। তারপর মালাকুল মওত এসে তার মাথার কাছে বসেন। বলেন—

> 'হে অপবিত্র আত্মা! আল্লাহর রাগ ও অসন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো।'

তারপর তিনি তার দেহে আঁচড়াতে শুরু করেন—যেভাবে ছুরিকে ভেজা পশমে আঁচড়ানো হয় এবং দেহ থেকে আত্মাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনবেন।

আজরাইল ﷺ তা হাতে নেওয়া মাত্র অন্য ফেরেশতারা সেই আত্মাকে দুর্গন্ধযুক্ত কফিনে ভরে ফেলেন। সেখান থেকে মৃত-পচা লাশের দুর্গন্ধ বের হয়, যা (কখনো কখনো) দুনিয়ার মানুষও অনুভব করে। তাঁরা একে নিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করেন। তাঁরা যখনই ফেরেশতাদের কোনো দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন—'এই নাপাক আত্মা কার?' তখন তাঁরা দুনিয়ায় পরিচয় উল্লেখ করে বলেন—'অমুকের ছেলে অমুক।'

এভাবে তাঁরা প্রথম আসমানে পৌঁছেন। তার জন্য আসমানের দরজা খোলার আহ্বান করা হয়, কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। তারপর রাসূল ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ—

> 'তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করবে।'

আল্লাহ তখন বলেন—'তার আমলনামা জমিনের সর্বনিম্নে সিজ্জিনে রেখে দাও।' তারপর তার রুহ ছুড়ে ফেলা হয়। এরপর রাসূল ﷺ কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, যার অর্থ হলো—

> 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।' (মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৫৭)

বারজাখের প্রথম স্টেশন

কবর হলো 'আলামুল বারজাখ' তথা মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রথম স্টেশন। মৃত্যুই জীবনের সমাপ্তি নয়; বরং নতুন জীবনের সূচনা মাত্র; কবর হলো তার প্রথম ধাপ। কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। কবরের সময়কালটা মানুষের এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের অভিজ্ঞতা। ঘুম থেকে উঠার পর স্বপ্নের জগৎটা যেমন ঝাপসা মনে হয়, বাস্তবকে মনে হয় আসল সত্য। ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর দুনিয়ার জীবনকে মনে হবে একটা স্বপ্ন—যা আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। ফেরেশতাদের সাথে অলৌকিক সব অভিজ্ঞতার পর এখন আপনি ফিরে এসেছেন আপনার কবরে। আপনাকে মাটি দেওয়া হয়ে গেছে। ফিরে চলে গেছে সব কাছের লোকজন। এখন একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতাই আপনার একমাত্র সঙ্গী। ঈমান আর সৎকর্মের পুঁজি সাথে না থাকলে কবরের প্রথম রাতের রিমান্ডেই জীবনে অর্জিত সকল সম্পদ, ক্ষমতা, সার্টিফিকেট তথা ডক্টরেট ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রি সব উধাও হয়ে যাবে। শুধু কাজে লাগবে মক্তবে শেখা সেই তিনটি লাইন—

'তোমার রব কে?'

'তোমার দ্বীন কি?'

'তোমার নবি কে?'

এত সম্পদ, সম্মান আর যশ-খ্যাতি আপনার কী কাজে লাগবে; যদি না এই প্রশ্ন তিনটির যথাযথ উত্তর করতে পারেন?

পরকালের প্রথম ইন্টারভিউ

মুমিন বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে—'তোমার রব কে?'

সে উত্তর দেবে—'আল্লাহ আমার রব।'

তাকে প্রশ্ন করা হবে—'তোমার দ্বীন কী?'

সে উত্তর দেবে—'আমার দ্বীন ইসলাম।'

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে—'দেখ তো, এই লোকটাকে চেনো কি না?'

সে উত্তর দেবে—'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ।'

এবার মুমিনকে অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে—'তুমি এগুলো জানলে কীভাবে?'

মুমিন বান্দা তখন উত্তর দেবে—'রাসূল ﷺ আমাদের কাছে মহান রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি।' (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৫৩)

ফেরেশতারা তখন খুশি হয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবে। তার কবরকে ৭০ হাত পর্যন্ত প্রশস্ত করা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সবুজে ভরিয়ে দেওয়া হবে। (সহিহ মুসলিম : ২৮৭০)

তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে, কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে তার কাঙ্ক্ষিত জান্নাতের আবাসস্থল। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৫৩)

অন্যদিকে বেইমান মুনাফিকদের যখন প্রশ্ন করা হবে—'দুনিয়াতে তুমি কীসের গোলামি করতে?'

তখন সে বলবে—'আমি জানি না।'

জিজ্ঞেস করা হবে—'তোমার ধর্ম কী?'

সে বলবে—'আমি জানি না।'

সর্বশেষ নবিজি ﷺ-এর অবয়ব দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে—'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?'

সে বলবে—'লোকজন যা বলত, আমিও তা-ই বলতাম।'

এখানেও চালাকি! সরাসরি বলবে না—'আমি জানি না'; বরং সুবিধাজনক উত্তর দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই পরীক্ষায় গোঁজামিলপূর্ণ উত্তর দেওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। উত্তর দিতে হবে সরাসরি। কিন্তু সে সরাসরি উত্তর দেবে কীভাবে? সে তো সমগ্র জীবনটাই কাটিয়েছে ইসলামের বিরোধিতা করে, নবিজি ﷺ-এর আনীত বিধানের বিরুদ্ধে লেখালিখি করে। সে কীভাবে জানবে—কে এই মহান ব্যক্তি?

ফেরেশতাদের হাতে তখন থাকবে লোহার একটি হাতুড়ি। তাঁরা সেই হাতুড়ি দিয়ে ওই পাপাচারীর দুই কানের মাঝখানে সজোরে আঘাত করবেন। সেই আঘাতের তীব্রতায় সে এমন গগণবিদারী চিৎকার দেবে, যার আওয়াজ জিন ও মানুষ ছাড়া সবাই শুনতে পাবে। (সহিহ বুখারি : ১৩৩৮ : ১৩৩৮)

এজন্য দেখবেন, কবরস্থানে গরু বাঁধা থাকলে মাঝেমধ্যে রশি ছিঁড়ে দৌড় দেয়। কারণ, পশুরা সেই ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পায়। কবরের আজাব এতটাই ভয়ংকর, তা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। বিশ্বনবি প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে আল্লাহর কাছে চারটা বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতেন—

- কবরের আজাব।
- জাহান্নামের আজাব।
- দ্বীন-দুনিয়ার ফিতনা।
- দাজ্জালের ফিতনা। (সহিহ মুসলিম : ১২১১)

আমাদেরও নিয়মিত এই আমলটি করা উচিত।

তা ছাড়া মৃত্যুর কথা স্মরণে আনার জন্য আমাদের ঘন ঘন কবরস্থানে যাওয়া প্রয়োজন। কবর জিয়ারত করা সুন্নাহ। কবরস্থানে গেলে মনে মৃত্যুর অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনে হয়—আমাকেও একদিন পরপারে পাড়ি জমাতে হবে, একাকী পড়ে থাকতে হবে এই অন্ধকার ঘরে; যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো সুযোগই নেই। এভাবে পরকালীন ভাবনা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে উৎসাহিত করে, আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে সাহায্য করে।

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'আমি আগে তোমাদের কবরে যেতে নিষেধ করতাম। (এখন সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলাম) এখন থেকে তোমরা কবরে (জিয়ারতে) যাবে।' (সহিহ মুসলিম : ৯৭৭)

তাই বলে কবরে গিয়ে কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কারণ, সাঁতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যেমন অসহায় হয়ে যায়, তার চেয়েও অধিক অসহায়, নিঃস্ব হয়ে যায় কবরে শায়িত ব্যক্তি। সে আপনাকে কী দেবে? বরং কিছু দেওয়ার থাকলে আপনিই তাকে দিতে পারেন। কিছু দুআ-দরুদ পাঠ করে আল্লাহর কাছে তার নাজাতের জন্য ফরিয়াদ করে আসবেন; এগুলো তার উপকারে আসবে। কবরবাসীরা আমাদের জন্য কিছুই করতে পারে না। করতে পারেন কেবল একজন, তিনি হলেন আমাদের রব—মহান আল্লাহ তায়ালা।

অনেক মানুষকে দেখা যায় কবরে মোমবাতি, আগরবাতি, লাল সালু, ফুল ইত্যাদি দিতে। আচ্ছা বলুন তো, মৃত ব্যক্তি কি এগুলোর ঘ্রাণ-স্বাদ পায়? যদি না পায়, তাহলে এগুলো দিয়ে কী লাভ? এগুলো স্পষ্টতই গর্হিত কাজ—যা কখনোই শরিয়াহ সমর্থন করে না। এই ধরনের কুসংস্কার কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

অনেকেই কবরে মশারি দেয়! কেন? কবরে শুয়ে থাকা লোকটাকে কি মশা কামড়ায়? খুঁজে দেখুন, যে ব্যক্তি পীরবাবার কবরস্থানে মশারি দেয়, তার নিজের বাবাকে মশায় খায়, কিন্তু কোনো খবর রাখে না। এ রকম অদ্ভুত কর্ম দিয়ে মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় না। তাই কবরস্থান বা মাজারকেন্দ্রিক শিরক-বিদআত থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

শেষ বিদায়

মুমিন মাত্রই আমরা সবাই 'হুসনুল খাতিমা' তথা সুন্দর বিদায় বা ঈমানি মৃত্যু কামনা করি। প্রত্যেকেই চাই—চির বিদায়ের মুহূর্তটি এমন হোক, যেন আমার রব আমার ওপর সন্তুষ্ট, আমিও আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। অনুভূতিটা যেন এমন হয়, আমি আমার সবচেয়ে কাছের অভিবভাবকের কাছেই ছুটে যাচ্ছি। এভাবে বিদায় নিতে পারাটা পরম সৌভাগ্যের এবং পরম সফলতার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ-

'নিশ্চই যারা ঘোষণা করে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং এরপর সত্যপথে অবিচল থাকে, (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে) তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে বলে—"তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না; বরং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সে সুসংবাদে আনন্দিত হও।"' (সূরা ফুসসিলাত : ৩০)

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

'যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের কল্যাণ করতে চান, তখন তাকে সুযোগ করে দেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কীভাবে সুযোগ করে দেন? নবি বললেন—মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎ কাজ করার সামর্থ্য দান করেন।'
(জামে আত-তিরমিজি : ২১৪২)

তাই মহীয়ান-গরীয়ান রাব্বে কারিমের দরবারে এটাই ফরিয়াদ, আমাদের শেষটা যেন ভালো হয়। সেই অন্তিম মুহূর্তে আমাদের যেন তিনি এভাবে সম্বোধন করেন—

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي- وَادْخُلِي جَنَّتِي-

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এসো। আজ আমিও তোমার ওপর সন্তুষ্ট। আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। আর, প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।'
(সূরা ফজর : ২৭-৩০)

কীভাবে বুঝব যে কারও মৃত্যুটি ভালো ছিল নাকি খারাপ?

ভালো মৃত্যুর কিছু আলামত রয়েছে। আলিম-উলামাগণ কুরআন-হাদিস গবেষণা করে এই আলামতগুলো বের করার চেষ্টা করেছেন। এই আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠ করতে পারা। বিশ্বনবি বলেন—'যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'
(সুনানে আবু দাউদ : ৩১১৬)

- মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বের হওয়া। বুরাইদা বিন হাসিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—"মুমিন কপালের ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।"' (মুসনাদে আহমাদ : ২২৫১৩)

- জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা। বিশ্বনবি ﷺ-এর বাণী—'যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাকে কবরের আজাব থেকে নাজাত দেন।' (জামে আত-তিরমিজি : ১০৭৪)

- শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহ তায়ালার বাণী—'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।'
(সূরা আলে ইমরান : ১৬৯)

- প্লেগ রোগে মারা যাওয়া। বিশ্বনবির বাণী—'প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য শাহাদাত।' (সহিহ বুখারি : ২৮৩০)

- নিজের ধর্ম, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা। বিশ্বনবি বলেন—'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা গিয়ে মারা যায়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি তার ধর্ম (ইসলাম) রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহিদ।'
(জামে আত-তিরমিজি : ১৪২১)

- আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়, সে-ও শহিদ। সালমান ফারসি ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশ্বনবি ﷺ বলেছেন—'একদিন-একরাত পাহারা দেওয়া এক মাস দিনে রোজা রাখা এবং রাতে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি পাহারারত অবস্থায় সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার জীবদ্দশায় সে যে আমলগুলো করত, সেগুলোর সওয়াব তার জন্য চলমান থাকবে, তার রিজিকও চলমান থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকে সে মুক্ত থাকব।'
(সহিহ মুসলিম : ১৯১৩)

- ভালো মৃত্যুর আরও একটি আলামত হলো—নেক আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। যেমন : নামাজ আদায় করা অবস্থায়, রোজা অবস্থায়, তিলাওয়াত করা অবস্থায় ইত্যাদি।

ভালো মৃত্যুর যেমন কিছু আলামত রয়েছে, অনুরূপভাবে খারাপ মৃত্যু বা মন্দ বিদায়েরও কিছু আলামত রয়েছে—

১. আত্মহত্যা করে মৃত্যু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।' (সহিহ বুখারি : ৫৭০০)

২. কবিরা গুনাহ সম্পাদন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ। যেমন—মদ্যপ অবস্থায়, ব্যভিচার করা অবস্থায়, কারও প্রতি জুলম করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

৩. স্ত্রীর অন্যায়ের কারণে কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর নারাজ থাকে অথবা স্ত্রীর আচরণে কষ্ট পেয়ে থাকে—এ পরিস্থিতিতে স্ত্রীর মৃত্যু হলে এটিও একটি খারাপ মৃত্যুর লক্ষণ।

৪. এমন ব্যক্তি—যার মৃত্যুর পরে এলাকার মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। এ ধরনের মৃত্যুও মন্দ মৃত্যু হিসেবে ধর্তব্য।

একটি গল্প দিয়ে শেষ করি

এক ব্যক্তি জঙ্গলে হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন এক সিংহ তার পিছু নিয়েছে। তিনি প্রাণভয়ে দৌড়াতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটি পানিহীন কুয়া দেখতে পেলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে দিলেন ঝাঁপ। পড়তে পড়তে একটি ঝুলন্ত দড়ি দেখে তা খপ করে ধরে ফেললেন এবং ওই অবস্থায় ঝুলে রইলেন। ওপরে চেয়ে দেখলেন, কুয়ার মুখে সিংহটি তাকে খাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নিচে চেয়ে দেখলেন, বিশাল এক সাপ তার নিচে নামার অপেক্ষায় চেয়ে আছে। বিপদের ওপর আরও বিপদ হিসেবে দেখতে পেলেন—একটি সাদা আর একটি কালো ইঁদুর তার দড়িটি একটু একটু করে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। এমন হিমশিম অবস্থায় কী করবেন—কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তখন হঠাৎ তার সামনে কুয়ার সাথে লাগোয়া গাছে একটা মৌচাক দেখতে পেলেন। তিনি কী মনে করে সেই মৌচাকের মধুতে আঙুল ডুবিয়ে তা চেটে দেখলেন। সেই মধুর মিষ্টতা এতটাই মোহনীয় ছিল যে তিনি কিছু মুহূর্তের জন্য ওপরের গর্জনরত সিংহ, নিচের হা করে থাকা সাপ, আর দড়িকাঁটা ইঁদুরদের কথা ভুলে গেলেন। ফলে তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল।

পারস্যের বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজালি এই কাহিনিটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> 'এই সিংহটি হচ্ছে আমাদের মৃত্যু, যে সর্বক্ষণ আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সেই সাপটি হচ্ছে রূপকভাবে কবর, যা আমাদের অপেক্ষায় আছে। দড়িটি হচ্ছে আমাদের জীবন, যাকে আশ্রয় করেই আমাদের বেঁচে থাকা। সাদা ইঁদুর হলো দিন, আর কালো ইঁদুর হলো রাত—যারা প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের আয়ু কমিয়ে দিয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই মৌচাক হলো দুনিয়া, যার স্বাদ আর মিষ্টতার মোহে পড়ে এই চতুর্মুখী ভয়ানক বিপদের কথা এবং আমাদের জীবন-মৃত্যুর আসল উদ্দেশ্যই আমরা ভুলে যাচ্ছি।
>
> মৌচাকের প্রতিটি সুস্বাদু মধুর ফোঁটা হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত বিলাস-বৈভব। আমরা দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর স্বাদ উপভোগ করতে ব্যস্ত। এসব বিলাসিতার মধ্যে আমরা ভুলে যাই—আমাদের সময়, আমাদের জীবন, মৃত্যু, কবরসহ চিরন্তন সব বাস্তবতাকে। পুরো দুনিয়ার কর্মকাণ্ড মূলত একটা ধোঁকা, মায়াজাল আর মরীচিকা। এই মায়াজালে আমরা আটকে আছি সবাই। ডুবে আছি গাফেলতির সাগরে। বেমালুম ভুলে আছি চিরস্থায়ী আখিরাতের কথা।'

মানবজীবনের ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেই রুহের জগৎ থেকে। হাজার হাজার বছর সেখানে অবস্থানের পর আমরা দুনিয়ায় এসেছি। এরপর আবার এমন এক জগতে প্রবেশ করব, যার কোনো অন্ত নেই। জীবনের এই মহা ভ্রমণের পথে দুনিয়ার সময়টা খুবই সংক্ষিপ্ত; অন্য জগতের তুলনায় যাকে মুহূর্তও বলা চলে না। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়কালটাই ঠিক করে দেবে আমাদের সামনের অনন্ত জীবন কীভাবে অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ আমাদের অনন্ত জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে দুনিয়ার এই ক্ষণিক জীবনের ওপর। তাই দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। বিদায় বেলার জন্য সদা প্রস্তুত মুমিন জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে অবসর গ্রহণের সময় কোথায়?

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

মিজানুর রহমান আজহারি।

তরুণ চিন্তক এবং জনপ্রিয় ইসলামি আলোচক। বিশ্ববিখ্যাত আল আজহার ইউনিভার্সিটির তাফসির অ্যান্ড কুরআনিক সাইন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'র ডিপার্টমেন্ট অব কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ স্টাডিজ থেকে স্নাতকোত্তর শেষে সেখানেই পিএইচডি গবেষণা করছেন। স্বপ্ন দেখেন–ইনসাফ, আদল ও ইহসানের ভিত্তিতে এক উন্নত সমাজকাঠামোর। তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন বিশ্বাসের পরশে। বোধ ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথামালা তুলে ধরার প্রয়াস নেন জনপদ থেকে জনপদে, কি-বোর্ডে কিংবা ক্যামেরার সামনে।

পৃথিবী এক মুসাফিরখানা; আসা-যাওয়াই এর চরম বাস্তবতা। এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে অনাবিল সুখ কখনোই সম্ভব নয়। এখানে রয়েছে প্রচুর নিয়ামত, তবে তা নিয়ম মেনে মানুষের কাছে পৌঁছে। আছে স্বাধীনতা, কিন্তু তা লাগামছাড়া নয়। রবের এ দুনিয়ায় একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, নিজেকে ভাঙা-গড়ার মধ্যে রাখতে হয়, অসীম দুনিয়ার জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। নিয়মের হেরফের হলেই শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে; পৃথিবী বসবাস-অযোগ্য হয়ে ওঠে।

একটি বাসযোগ্য বসুধা নির্মাণে ইসলাম সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত শাশ্বত প্রেসক্রিপশন; একই সাথে পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী সুখের একমাত্র গ্যারান্টি। সেই প্রেসক্রিপশন তুলে ধরার প্রয়াসের নাম–'ম্যাসেজ'।

Rokomari.com
ম্যাসেজ
মিজানুর রহমান ...
210407#
213376#531735-
1721

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789849 512691